বাংলার যাত্রা
ও
ব্রজেন্দ্র কুমার দে

ড. রতন কুমার মণ্ডল

অনুভবপত্র প্রকাশনী
১৭, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো
কলকাতা-৭০০০০৯

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ ঃ
দুর্গাপূজা, মহাঅষ্টমী
অক্টোবর, ১৯৯৯

প্রকাশক ঃ
অরুণ কুমার দাস
১৭, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বর্ণ সংযোজনা ঃ
শ্রী অমিতাভ ঘোষ
২০৬, পশ্চিম ঘোষপাড়া রোড
শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

পরমারাধ্যা ৺মাতৃদেবী
এবং
আবহমানকালের যাত্রাপ্রণেতা,
যাত্রাশিল্পী ও যাত্রাপ্রেমী মানুষদের
উদ্দেশ্যে ——

পরিচায়িকা

ডক্টর শ্রীমান্ রতন কুমার মণ্ডল তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'বাংলার যাত্রা ও ব্রজেন্দ্র কুমার দে' প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন এজন্য প্রথমেই তাঁকে সাধুবাদ জানাই। বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়লেও যাত্রাপালা সম্পূর্ণ দেশজ এক শিল্প আঙ্গিক। 'যাত্রা' শব্দটির ব্যুৎপত্তি থেকে তা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। আমাদের নাট্য সাহিত্য যেমন নাটক খ্যাতিমান নাট্যকারের কারণে সমৃদ্ধ, পাশাপাশি আমাদের যাত্রাপালাগুলিরও নানা পালাকারদের সৃজনী ক্ষমতার কারণে ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষ ঘটে চলেছে। মূলতঃ ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র জীবন ও রচনারাজির ওপরে গবেষক সন্ধানী দৃষ্টি ফেলেছেন যে ব্রজেন্দ্র কুমার প্রায় দেড় শতাধিক যাত্রাপালা রচনা করে তাঁর অসাধারণ সৃজনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। শুধু সংখ্যাধিক্যের কারণেই নয়, উৎকর্ষের বিচারেও ব্রজেন্দ্রকুমার রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সোনাই দীঘি, নটী বিনোদিনী আজও অভিনীত হলে দর্শকদের বিপুলভাবে আকর্ষণ করে। পরাজিত মেঘনাদ কিংবা বাঙালী, ধর্মের বলি, পালাকারের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জাগ্রত মানসিকতার পরিচয় দেয়।

ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র পালাকার হিসাবে জনপ্রিয়তা ছিল গগনচুম্বী। ব্রজেন্দ্রকুমারের জনপ্রিয়তার নানা কারণ। তিনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত,তাঁর ছিল বিরল সৃজনী ক্ষমতা, যাত্রাপালার আঙ্গিকে তিনি সময়োচিত পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর যাত্রাপালার বিষয় নির্বাচনে ছিল বৈচিত্র্য, ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা, বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের আদর্শ—এইসব মিলিয়ে তিনি যাত্রাপালাকারদের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন। ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালগুলি বিষয়ের নিরিখে বহুধা বিস্তৃত যেমন—পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক, জীবনীমূলক, দেশাত্মবোধক, গীতিকা আশ্রিত পালা, কথাসাহিত্য আশ্রিত পালা ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর যাত্রাপালায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর পালায় সংলাপ কখনই দীর্ঘায়িত হয় নি, সংলাপগুলি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত। বলাবাহুল্য, এর ফলে একদিকে যেমন দর্শকদের একঘেয়েমি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তেমনি পালার গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

আগে মানুষের ছিল অফুরন্ত সময়, সন্ধ্যাবেলা কোঁচড়ে মুড়ি চিঁড়ে নিয়ে দর্শক আসরে আসন গ্রহণ করত। ঘরে ফিরত সকালবেলা। রাতেই পালা ভাঙ্গলে অন্ধকারে ঘরে ফেরা বিপজ্জনক হতে পারত। দ্বিতীয়ত, কালে ভদ্রে একবার যাত্রাপালার আয়োজন হলে উদ্যোক্তায় এবং উপভোক্তায় সহজে তাকে শেষ করতে দিত না। মূলতঃ এই দ্বিবিধ কারণেই যাত্রাপালা ছিল

সময় সাপেক্ষ এক অনুষ্ঠান। ব্রজেন্দ্রকুমার বুঝলেন আধুনিক যুগ হল গতির যুগ, সময়াভাবের যুগ। অতএব বিনোদনের জন্য আট দশ ঘন্টা ব্যয় করা বহু মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাছাড়া এত দীর্ঘ সময়ের পালায় কখনই নাট্য সংহতি রক্ষিত হতে পারে না। তাই বাস্তববাদী ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রাপালার অভিনয় সীমা নির্দিষ্ট করলেন চলচ্চিত্রের প্রদর্শন কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আড়াই তিন ঘন্টা। এতে দর্শকদের সময় বাঁচল, পালাতেও দেখা দিল সংহতি।

সঙ্গীতের ব্যবহারেও ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথমতঃ সঙ্গীতকে তিনি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীত প্রয়োগে ছেদ ঘটালেন সংলাপের সংযোজনে। অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রকুমারের সঙ্গীত হল সংলাপযুক্ত। ফলে সঙ্গীতের নাটকীয়তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘকালের রেওয়াজ ভেঙে তিনি সঙ্গীতকে নিছক বৈচিত্র্য সম্পাদন কিংবা কালহরণের মাধ্যম রূপে দেখেন নি, তাছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত গীতিকারদের গানও তাঁর পালায় ব্যবহার করেছেন।

অষ্টম অধ্যায়ে সমাপ্ত গ্রন্থটিতে লেখক একদিকে যেমন যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, আলোচনা করেছেন পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র ব্যক্তি পরিচয়, তেমনি অন্যদিকে আবার ব্রজেন্দ্রকুমারের রচনাগুলির পরিচয় দিয়েছেন, মূল্যায়ন করেছেন তাঁর পালগুলির। তাঁর কোন পালা কোন যাত্রাদলে রূপায়িত হয়েছে, তাঁর পালাগুলিতে সঙ্গীত ব্যবহারের স্বরূপ, সর্বোপরি তাঁর রচিত সমস্ত যাত্রাপালার তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে যাত্রারসিক এবং যাত্রামোদী মানুষ মাত্রের কাছেই গ্রন্থটি সমাদৃত হবে, এই আশা পোষণ করি।

বরুণকুমার চক্রবর্তী
লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

বাংলা লোকাভিনয়ের ইতিহাসে যাত্রা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। লোকাভিনয় ও লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যাত্রার ভূমিকা সর্বজনবিদিত। কালের বিবর্তনে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন নানারূপ পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি সেই পরিবর্তনের বিশিষ্ট প্রভাব পড়েছে বাংলার যাত্রার ইতিহাসে। পাশ্চাত্য-প্রভাবিত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ফলে যেমন যাত্রার ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটেছে, তেমনি আধুনিক চলচ্চিত্র, বেতার ও দূরদর্শনের প্রভাবে বাংলার বিভিন্ন লোকনাট্য, বিশেষভাবে যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছে নানারূপ পরিবর্তন। যাত্রার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমায় দেখা যায়, এই পরিবর্তন বিশেষতঃ স্বাধীনতা উত্তর তথা দেশ বিভাগ পরবর্তীকালে দ্রুত সংঘটিত হয়। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র ন্যায় আধুনিক চেতনাসম্পন্ন পালাকারদের লেখনী আশ্রয় করেই বাংলার যাত্রা তার মূল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে জনোপযোগীরূপে বিবর্তনের পথে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য যাত্রা সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে নানারূপ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাংলা যাত্রাশিল্পের ইতিহাসে ব্রজেন্দ্র কুমার দে মহাশয়ের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অদ্যাপি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয় নি। আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা যাত্রাশিল্পের ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিকায় পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র রচিত যাত্রাপালাসমূহ এবং যাত্রা সংক্রান্ত আলোচনা-সমালোচনামূলক প্রবন্ধাদি, তাঁর পালায় সঙ্গীতের ব্যবহার ও তাঁর রচিত পালাসমূহের অভিনয় সম্পর্কে বিশদভাবে এই গবেষণামূলক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে ব্রজেন্দ্রকুমারের বৈচিত্র্যময় জীবন পরিচয়, প্রণয়ন করা হয়েছে তাঁর যাত্রাপালাসমূহের তালিকা।

এই পুস্তক রচনায় আমি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান আমার শিক্ষাগুরু পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রেরণায়। তাঁর অকৃপণ সহায়তা এবং অমূল্য উপদেশাদি প্রদানের প্রসঙ্গ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে অতি মূল্যবান পরিচায়িকা লিখে দিয়ে তিনি এই গ্রন্থের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর ছাত্র হিসাবে নিজেকে ধন্য এবং গৌরবান্বিত বোধ করি। শিক্ষাগুরুর ঋণ অপরিমেয় এবং অপরিশোধ্য। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে আত্মতৃপ্তি লাভ করি। এই গ্রন্থ প্রকাশে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা আমাকে প্রেরণা দান করেছেন তাঁরা হলেন আচার্য অজিত কুমার ঘোষ, অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ, অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত, ড. ক্ষেত্র

গুপ্ত, অধ্যাপক ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ড. সনৎ কুমার মিত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। এঁদের সকলকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

এই গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রকুমার দে এবং তাঁর রচনাদি সম্পর্কে বহুবিধ তথ্যাদি এবং নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের পুত্র মান্যবর শ্রী তরুণ কুমার দে, কন্যা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অঞ্জলি দে। তাঁরা এই গ্রন্থ রচনায় সর্বপ্রকার সাহায্য উজাড় করে দিয়েছেন। এই পুস্তক পাঠকালে তাদের সহৃদয় সহযোগিতার প্রসঙ্গ পাঠকমাত্রেরই নজরে আসবে। ব্রজেন্দ্র- তনয়া শ্রীমতী অঞ্জলি দে, অবসরপ্রাপ্তা শিক্ষিকা, ব্রজেন্দ্রকুমারের সংগ্রহশালা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এতদ্ব্যতীত, ব্রজেন্দ্রকুমারের জীবন পরিচয় ও তাঁর রচনাদি সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন যাত্রাভিনেতা অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রকুমারের অভিন্নহৃদয় বন্ধু পালাকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, নাট্যলোক পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রকাশক শ্রী নির্মল চন্দ্র শীল। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালা এবং সামগ্রিকভাবে যাত্রা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি ও অভিমত প্রদান করেছেন প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা, প্রযোজক নটসম্রাট স্বপনকুমার,স্বনামধন্য যাত্রাভিনেত্রী যাত্রালক্ষ্মী শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্ত, যাত্রাসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত, নাট্যকার শ্রী সত্যেন ভদ্র প্রমুখ। এঁদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে সদা-সর্বদা খোঁজখবর রেখেছেন এবং বিভিন্নভাবে সহায়তা ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন প্রধান শিক্ষক মান্যবরেষু আবদুল গাফ্‌ফর মণ্ডল মহাশয়, বন্ধুবর ড. এস. এম. হাসমী, শ্রী সন্দীপ মিত্র ও আমার সকল সহকর্মীবৃন্দ। এঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের সহায়তা গ্রহণ করেছি। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক বিনোদ বিহারী দাশ মহাশয়ের আন্তরিকতার কথা। তাঁর ছাত্রবাৎসল্য আমার ছাত্রজীবনের পরম প্রাপ্তি। জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা মেট্রোপলিটন লাইব্রেরী, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার প্রভৃতি গ্রন্থাগার বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সকল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতায় আমি ভাগ্যবান। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন এবং অন্যান্য বহুবিধ সহায়তা প্রদান করেছেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য সহকর্মী মান্যবর ওসমান আলি সেখ মহাশয়। নানান ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর এইপ্রকার সহযোগিতা তাঁর মহত্ত্ব ও আমার প্রতি তাঁর স্নেহময়তার প্রকাশ। এই গ্রন্থ রচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শ্রীমতী কাকলি মণ্ডল ও বিদিশা মণ্ডলের নাম ও বিভিন্নভাবে তাদের সহায়তার প্রসঙ্গ। লেখকের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বা সৌজন্য প্রদর্শনের অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি বন্ধুবর শ্রী অরুণ কুমার দাসের সহযোগিতার প্রসঙ্গ। তিনি এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি, আমার ব্যক্তিগত অক্ষমতার দরুণ প্রথম প্রচেষ্টাজাত এই গ্রন্থে মুদ্রণ প্রমাদসহ নানাপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি ও বিষয়গত সীমাবদ্ধতা আছে, সেজন্য আমি সকলের কাছে বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রন্থখানির ভবিষ্যৎ সার্থকতার লক্ষ্যে সুধীবৃন্দের নিকট আমি সবিনয়ে উপদেশ ও নির্দেশাদি প্রার্থনা করি। লোকনাট্য যাত্রাগানের ছাত্রছাত্রী, যাত্রাসমালোচক যাত্রাপ্রেমী মানুষ এবং বিদগ্ধজনের কাছে গ্রন্থখানি সমাদৃত হলে নিজেকে গৌরবান্বিত এবং উৎসাহিত বোধ করব।

বিনীত নিবেদক

২৭৫, পশ্চিমপাড়া, রহড়া, খড়দহ
উঃ২৪ পরগণা

রতন কুমার মণ্ডল

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস

যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে জানতে অগ্রসর হয়ে প্রথমে অভিনিবেশী হতে হয় 'যাত্রা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সন্ধানে। যাত্রা বিশেষজ্ঞ ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য 'যাত্রা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে বলেছেন —

"সংস্কৃত 'যা' ধাতু - 'গমন করা' -থেকে যাত্রা শব্দের উৎপত্তি (যা+ত্র+ভাবে আপ) । সুতরাং যাত্রা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রস্থান বা গমন।" ১

'যাত্রা' শব্দটি যে গমনার্থক সে সম্বন্ধে প্রাবন্ধিক সনাতন গোস্বামীও মত প্রকাশ করে বলেছেন—

"সংস্কৃত গমনার্থক 'যা' ধাতু থেকে পদটি এভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে – যা+ত্র+আ (স্ত্রী-অর্থে)।" ২

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে নৃত্যগীতাদিসহ শোভাযাত্রার প্রচলন ছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, দেবতার শোভাযাত্রা থেকেই আধুনিক যাত্রা কথাটি এসেছে ঃ

"সেকালের উৎসব উপলক্ষ্যে দুই ধরণের সাহিত্য সঙ্গীতের আসর বসিত। একটি স্থাবর অপরটি জঙ্গম। স্থাবর আসর দেবমন্দিরের সামনে বসিত। ..... জঙ্গম উৎসবকে বলিত 'যাত্রা'। বাৎসরিক পূজা অথবা সাময়িক উৎসব উপলক্ষ্যে দেবতাকে রথে, শকটে অথবা শিবিকায় চড়াইয়া ভক্তেরা শোভাযাত্রা করিয়া নাটগীত করিতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইত। এমনিভাবে পুণ্য দিনে নদীস্নানেও লোকে যাইত। দেবতার শোভাযাত্রা হইতে আধুনিক 'যাত্রা' কথাটি আসিয়াছে।" ৩

নাট্যাচার্য ডঃ অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ও অনুরূপ অভিমত প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন—

"যাত্রা কথাটি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতীতে কোনো দেবতার লীলা উপলক্ষ্যে লোকেরা এক জায়গা হইতে অন্য আর এক জায়গায় গমন করিয়া নাচ গানের সঙ্গে সেই দেবতারর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিত। ইহাই যাত্রা নামে অভিহিত ছিল। সুতরাং যাত্রা বলিতে উৎসব উপলক্ষ্যে গমন এই ব্যাপারটি অপরিহার্য ছিল।" ৪

নাট্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ অজিত কুমার ঘোষ তাঁর 'নাটকের কথা' গ্রন্থে আরো বলেছেন —

" যাত্রার প্রাথমিক অর্থ নিহিত রয়েছে চলমানতার মধ্যে। কিন্তু পরে যাত্রা বলতে শোতৃমন্ডলী পরিবেষ্টিত নির্দিষ্ট আসরে অভিনয় অনুষ্ঠান বোঝানো হয়ে থাকে।" ৫

'যাত্রা'- শব্দের অর্থ সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বিশেষভাবে বলেছেন —

" 'যাত্রা' .... শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও উৎসব। আধুনিক কালে 'নদীর যাত, মানাদের যাত' এইসব স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজায় আছে। তাহার পর অর্থ হইল দেবতার উৎসব উপলক্ষে নাট্যগীতি, তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীময় নাট্যগীতি।" ৬

যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষে 'যাত্রা' সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

> "শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে গমনরূপ ব্যাপার রাসযাত্রা নামে প্রসিদ্ধ। দোলযাত্রা, রথযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা প্রভৃতি দেবলীলার ঘটনাগুলি স্মৃতিপথে সমারূঢ় রাখিবার জন্য কতকগুলি লোকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এক এক স্থানে সমাগমপূর্বক ব্যক্তি সাধারণের নিকট তদ্ব্যাপার প্রদর্শনার্থ একটি ধারাবাহিক চরিত্র চিত্র সমুপস্থিত করে। এই ব্যাপারই ক্রমে উৎসব বা যাত্রা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যে দেব চরিত্রাংশ অতি গভীর পূজা আড়ম্বর ও ভক্তিসহ আনন্দ তরঙ্গে নাচগান বিমিশ্রিত হইয়া লোকসমাজে প্রকটিত হয়, তাহাই যাত্রা।" ৭

বিশ্বকোষ পরিষদ থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষে যাত্রা শব্দের নামকরণ এবং এর অর্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

> "যাত্রা শব্দার্থ নির্বিঘ্নে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা, অবশ্য একটি বিশেষ যোগারূঢ় অর্থ আছে – উৎসব পরিবেশে কোনও গ্রথিত কাহিনীর গীত-নৃত্য-সংলাপ সহযোগে অভিনয়। হাজার বৎসর আগেও এ-দেশে ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্যগীতসহ শোভাযাত্রা হত। যেমন ছিল জেলেপাড়ার সঙ। এ থেকে যাত্রা নাম সম্ভবত এসেছে।" ৮

গ্রহাদির মধ্যে প্রধান হোল সূর্য। সূর্য মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত। তাই সূর্যোপাসনার ব্যাপকতা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত। মন্মথমোহন বসু এ বিষয়ে বলেছেন —

> "বাস্তবিক প্রায় সকল প্রাচীন উৎসবেরই আদি ভিত্তি সৌরোৎসব। সূর্যের যাত্রা উপলক্ষ করিয়া এই সকল উৎসব হইত এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম যাত্রা হইয়াছে।" ৯

আমরা জানি, সূর্যের প্রধান দুটি গতির পরিবর্তন হল উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ। সূর্যের দক্ষিণায়ণ যাত্রা উপলক্ষে কৃষিজীবি মানুষেরা প্রাচীনকালে নৃত্যগীতাদি সহকারে সূর্যোৎসব পালন করে থাকে। এই সূর্য যাত্রা উৎসব থেকেই যাত্রা কথাটি প্রবর্তিত হয়েছে বলে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অভিমত ব্যক্ত করেছেন —

> "যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।" ১০

দেবোৎসব উপলক্ষে প্রাচীনকালে যে নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ মেলে কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকে জগন্নাথদেবের 'গুণ্ডিকাযাত্রা' উপলক্ষে মহাপ্রভুর নাটকাভিনয়ের উল্লেখ থেকে। এছাড়া ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত'-এ ও কালপ্রিয়নাথের যাত্রায় নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। ধীরে ধীরে যাত্রা শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তা দেবলীলাত্মক অভিনয়ে পৌছায়। ক্রমে শুধু উৎসব উপলক্ষে নয়, উৎসব ছাড়াও এই ধরনের অভিনয়কে যাত্রাভিনয় বলা হোত।

বাংলাদেশে যাত্রাগানের পরিক্রমা বহু প্রাচীনকাল ধরে চলে আসছে। ঋগ্বেদের দশম

মণ্ডলের সম্বাদসূক্তকে (Dialogue Hymns) কোন কোন পণ্ডিত যাত্রাগানের আদি বলে মনে করেন। তবে এই সম্বাদসূক্তের সঙ্গে বাংলার যাত্রাগানের সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন। চর্যাগীতিতে কাহ্নুপাদের ১০ম সংখ্যক পদ "তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া" এবং বীণাপাদের ১৭ সংখ্যক পদ "নাচন্তি কহিল গাঅন্তী দেবী। / বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।।" থেকে আমরা অনুমান করতে পারি তখন যেটা ছিল নাট্যরীতি এখন তাই পরিবর্তিত যাত্রাভিনয়। কারণ হিসাবে বলা যায়, প্রোসেনিয়াম মঞ্চের নাট্যমঞ্চ তখন সম্ভব ছিল না।

দ্বাদশ শতকে রচিত কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কৃষ্ণযাত্রার আদিরূপ বলে পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেছন। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য বলেছেন —

> "জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম' (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) এ বাংলার যাত্রাগানের আদিম রূপটি বিধৃত আছে বলে মনে হয়।" ১১

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেন —

> "মনে হয় জয়দেবের দলে কবিই অধিকারী ছিলেন, সম্ভবতঃ মূল গায়েনও। পরাশর প্রভৃতি আত্মীয় ছিলেন দোহার ও বায়ন। নাচ করিতেন পদ্মাবতী। একটি পদের ভনিতায় জয়দেব নিজেকে 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্তী' বলিয়াছেন। একথার একমাত্র সঙ্গত অর্থ - "যিনি পদ্মাবতীর চরণ চালকদের 'অধ্যক্ষ'। 'প্রেরণ' নৃত্যকারীর চরণচালক মানে গায়ন ও বায়ন। আর তাহাদের চক্রবর্তী বলিতে দলের অধিকারী।" ১২

উইলিয়াম জোনস্ গীতগোবিন্দকে বলেছেন, Pastoral drama বা রাখালী নাট অর্থাৎ গ্রামীন নাটক বা লোকনাট্য — অনেকটা যাত্রার পূর্বরূপ।

শ্রোয়ডের মতে, "গীতগোবিন্দ' মার্জিত ধরণের যাত্রা (Refined Yatra)।"

আবার অনেকে গীতগোবিন্দের ভেতরে পুতুল নাচের উপকরণ লক্ষ্য করেছেন। অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গীতগোবিন্দকে পাঁচালী কাব্য বলতে চেয়েছেন। তিনি এর সঙ্গে মধ্যযুগের পাঁচালীর সাদৃশ্যের কথা বলেছেন —

> "গীতগোবিন্দ মূলতঃ কাব্য, তবে এর আকার প্রকার নাট্টগীত বা যাত্রা গানের চেয়ে আবৃত্তি-গীতাত্মক পাঁচালীর অধিকতর নিকটবর্তী।" ১৩

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ গীতগোবিন্দের মধ্যে বাংলার প্রাচীন যাত্রাভিনয়ের নিদর্শন লক্ষ্য করে বলেছেন —

> "বাংলার প্রাচীন যাত্রাভিনয়কে গীতিনাট বা নাটগীতি বলা হোত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে রচিত হলেও এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত গীতিনাটের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বয়ং কবি এখানে অধিকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।" ১৪

যাত্রাগানের বিকাশের ক্ষেত্রে জয়দেবের গীতগোবিন্দের যে বিশেষ প্রভাব রয়েছে পণ্ডিতবর্গের বক্তব্য থেকে তা স্পষ্টতঃ বোঝা যায়।

খ্রীষ্টীয় চতুদর্শ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যকে

যাত্রাগানের প্রাথমিক পর্যায় বলে মনে করা যেতে পারে। এই আখ্যান কাব্যে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপধর্মী গানের আশ্রয় নেওয়ায় নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা সংলাপের আশ্রয়ে নাটক গড়ে ওঠে। গীতগোবিন্দের মতো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও তিনটি চরিত্র — কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়ায়ি (দূতী। দুটি কাব্যেই দূতীর প্রাধান্য বর্তমান। তিনটি চরিত্রই সংগীতাশ্রয়ী সংলাপ বলেছে। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বৈষ্ণবীয় নিবন্ধে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে' গীতিনাট্যকাব্য, 'গীতিসর্বস্ব নাট্যকাব্য' 'নাট্যগীতি' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নাটক বলতে নারাজ। তিনি এ কাব্যের মধ্যে ঝুমুরের আভাস লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন —

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-কৃষ্ণের চটকদার বোলচালে খানিকটা ঝুমুরের আভাস পাওয়া যাবে। এ কাব্যের সঙ্গে তিন চরিত্রের দ্বারা অভিনীত 'বীথী' নাটকের সাদৃশ্য থাকলেও একে নাটক বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।" ১৫

ডঃ বৈদ্যনাথ শীল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আঙ্গিক প্রসঙ্গে বলেছেন —

"বাংলা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং সংস্কৃত জগন্নাথবল্লভ নাটকের মিশ্র শৈলী হইতে বাংলা যাত্রাশৈলীর উদ্ভব।" ১৬

রায় রামানন্দ বিরচিত "জগন্নাথবল্লভ' সংস্কৃত নাটকখানি সঙ্গীত প্রধান, তবে গীতিনাট্য বা যাত্রাগান যে নয় তা স্থির করে বলা যেতে পারে। কেননা, যাত্রাগানে এ নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল এমন উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ মেলে না।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

"অনেককাল পূর্ব থেকে পাঁচালী ও ঝুমুর ধরণের লোকাভিনয়ের যে ধারা চলে আসছিল, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রভাবের যুগে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যানে সেই মিশ্র রীতিই যাত্রাগানকে প্রভাবিত করেছে।" ১৭

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ গীতগোবিন্দে গীতিনাটের যে নিদর্শন দেখেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও সেই গীতিনাটেরই পরিপূর্ণ রূপ লক্ষ্য করেছেন —

"গীতনাটেরই পূর্ণতর নাট্যরূপ দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও সুসংবদ্ধ কাহিনী রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি চরিত্র কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই নাটকের মতো উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ উচ্চারণ করেছে। নাট্যোৎকণ্ঠা, পরিস্থিতির বৈপরীত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নাট্যাবেগের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে সূত্রাধারের ভূমিকা কবির।" ১৮

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংলাপধর্মী গীতিময়তা, নাট্যোৎকণ্ঠা এবং সুসংবদ্ধ জমাট কাহিনী আধুনিক যাত্রাগানের উপর যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল তা বলা যায়।

চৈতন্যদেবের কিছু আগে থেকেই গৌড়ে বৈষ্ণবাশ্রয়ী ভক্তিধর্মের সূচনা দেখা যায়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচিত হয়েছিল চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই। তারও প্রায় ৫০ বছর আগে মাধবেন্দ্রপুরী ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণলীলা প্রচার করেন। সুতরাং এটা অনুমেয় যে, পঞ্চদশ শতক থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে কৃষ্ণলীলাশ্রয়ী নৃত্যগীতানুষ্ঠান জনগণকে প্রভাবিত করেছিল। আমাদের দেশে কৃষ্ণযাত্রার অনেক আগে শক্তি বিষয়ক যাত্রা প্রচলিত ছিল বলে

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন। চৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পরেই কৃষ্ণযাত্রা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন —

> "ইউরোপে যে অবস্থায় মিষ্টারিজ (Mysteries) আরম্ভ হইয়াছিল বাঙ্গালায় সেই অবস্থায় যাত্রা আরম্ভ হয়।. সে কত দিনের কথা, তাহা আমরা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিতে প্রস্তুত নই। শুনিতে পাওয়া যায়, চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যাত্রা ছিল, সে যাত্রা কেবল শক্তি বিষয়ক, কৃষ্ণযাত্রা তখন একেবারে হইত না। চৈতন্যদেবের পর যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাঁকিয়া উঠিল, তখন কৃষ্ণলীলার যাত্রা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা অনেকের হয়।" ১৯

চৈতন্যদেবের আর্বিভাবকালে কৃষ্ণযাত্রা প্রচলিত থাকলেও মহাপ্রভুর হাতে কৃষ্ণযাত্রা একটি অন্যতর মাত্রা পায়। মহাপ্রভুর পূর্বে বাংলাদেশে যাত্রার প্রচলন ছিল ঠিকই কিন্তু চরিত্রানুযায়ী সাজসজ্জা সহকারে আসরে অভিনয়ের প্রবর্তন চৈতন্যদেবের হাতেই হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে (আনুঃ ১৫০৭ - ৮ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীচৈতন্যদেব সপারিষদ সারারাত্রি ধরে কৃষ্ণলীলাভিনয় করেছিলেন। সে বর্ণনা আমরা পাই কবি কর্ণপুরের "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকে। বৃন্দাবনদাসও 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'এ (মধ্য খন্ড ১৮ শ অধ্যায়) সে বর্ণনা দিয়েছেন। একদিন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর ভক্তজনের কাছে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করেন —

একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থলে।
আজি নৃত্য করিবাঙ্ অঙ্কের বিধানে।।
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জা কর গিয়া।।
শঙ্খ কাঁচুলি পাট শাড়ি অলঙ্কার ।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জা কর সভাকর।।

গৌরাঙ্গ অভিনয়ে সকলের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করে দিলেন—

গদাধর কাচিবেন রুক্মিনীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ী সখী সুপ্রভাত।।
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার।।
শ্রীবাস নারদ - কাচ স্নাতক শ্রীরাম।
দিয়ড়িয়া হাড়ি - মুঞ্জি গেলয়ে শ্রীমান।।

"কে করিবে পাত্রকাচ? 'পাত্রকাচ' অর্থাৎ নায়কের ভূমিকা কে গ্রহণ করবে?" অদ্বৈতের এই প্রশ্নের উত্তরে গৌরাঙ্গ বললেন — "পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ।" অর্থাৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গোপীনাথের বিগ্রহকেই নায়ক বলে গ্রহণ করা হোল। গৌরাঙ্গদেবই সকল অভিনেতার ভূমিকা

সুনির্দিষ্ট করে দিলেন। যাত্রাদলের অধিকারীর মতো তাঁর নির্দেশে অভিনেতারা চরিত্রানুযায়ী সাজসজ্জা করলেন। কেবলমাত্র অদ্বৈতকে আদেশ করেছিলেন তিনি যে কোনো কাচ কাচতে পারেন। অদ্বৈত বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করবেন স্থির করলেন। প্রথম দিনের বিষয় ছিল 'রুক্মিনী স্বয়ংবর'। এটি ভাগবতের দশম স্কন্দের (৫৩ - ৫৪ অধ্যায়) বিখ্যাত আখ্যান। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় আমরা অভিনয়ের চরিত্রলিপি দেখতে পাই এইরূপ — অদ্বৈত আচার্য— বিদূষক, গৌরাঙ্গদেব— রুক্মিনী ও আদ্যাশক্তি, হরিদাস — কোটাল, শ্রীবাস —নারদ, রামাইপণ্ডিত—নারদশিষ্য, গদাধর — রাধা, ব্রহ্মানন্দ— রাধার বড়াই , মুরারিগুপ্ত— কোটালের সঙ্গী। আসরে অভিনয়ের সুবিধার্থে গৌরাঙ্গদেবের সুনির্দিষ্ট চরিত্রের জন্য নির্দিষ্ট অভিনেতা নিয়োগের পরিকল্পনা আমাদের ইদানীং কালের যাত্রাভিনয়ের রূপরীতিকে মনে করিয়ে দেয়। এই রূপ চরিত্র সজ্জা এবং অভিনেতাদের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান লক্ষ্য করে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন —

> "এটি আসরী অভিনয় অর্থাৎ যাত্রাভিনয়। কারণ রঙ্গমঞ্চের বা দৃশ্যসজ্জার কোনও উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় না।" ২০

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, —

> "এমনি প্রত্যুৎপন্ন নাট্যাভিনয় বরাবর চলিয়া আসিয়াছিল। ইহা এখনও রাঢ় অঞ্চলের সীমান্তে অনবলুপ্ত। ইহার নাম 'নেটো'। শব্দটি আসিয়াছে 'নাটক' (অভিনয়) ও 'নাটুক' (অভিনয়কারী) হইতে। নেটোই এদেশের নিজস্ব এবং বিশুদ্ধ নাট্যপদ্ধতি।" ২১

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন —

> "চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরের গৃহে সপারিষদ যে অভিনয় করেছিলেন তা ছিল নৃত্যনাট্য। নৃত্যই সেখানে প্রধান ছিল। তবে তাতে হাস্যরসাত্মক চরিত্রের কৌতুকাভিনয় এবং পর পর চরিত্রের চমকপ্রদ আগমনের মধ্য দিয়ে নাট্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের টুকরো টুকরো কথোকপথনের যে বর্ণনা বৃন্দাবনদাস দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় নৃত্যনাট্য হলেও উক্তি - প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। খোলা আসরে অভিনয় রাধাকৃষ্ণ অথবা চৈতন্যদেবের লীলা অবলম্বনে পালা রচনা, নৃত্যগীত এবং মাঝে মাঝে কিছু সংলাপের প্রয়োগ, মুখ্যরস ভক্তিরস হলেও জনমনোরঞ্জনের জন্য কৌতুকরস সঞ্চার করা — এগুলি ছিল পরবর্তী যাত্রাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি চৈতন্য অভিনয়ের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিল।" ২২

মহাপ্রভুর অভিনয়লীলা আধুনিক যাত্রাগানের প্রাথমিক পর্যায় বলে মনে করেন যাত্রা বিশেষজ্ঞ ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন —

> "আধুনিক যাত্রাগানের সঙ্গে মহাপ্রভুর এই অভিনয়লীলার সম্পর্ক কতখানি তা বলা সহজ নয়। তবে মহাপ্রভুর এই অভিনয় লীলা যে যাত্রাগানেরই প্রাথমিক পর্যায় তাতে সন্দেহ নেই। ষোড়শ শতকের পরে যাত্রাগান সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। আধুনিক যাত্রাগানের আবির্ভাব কাল খৃষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।" ২৩

গৃহাশ্রমবাসী গৌরাঙ্গ তাঁর মেসো—চন্দ্রশেখরের গৃহে রীতিমতো আয়োজন করে যে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেছিলেন তাঁর ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলার কারণে যদিও সে অভিনয় সম্পূর্ণ হয় নি, তথাপি মহাপ্রভুর দিব্যাভিনয়ের আবেশে শ্রোতৃবৃন্দ যে আধ্যাত্মিক আবেশে সেই দিব্য নাট্যরস উপভোগ করেছিলেন তা বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এবং বলা যায়, তা আধুনিক যাত্রানাটকের প্রাচীনরূপ।

বাংলাদেশে যাত্রাগানের যা-কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তা চৈতন্যদেবের তিরোধানের পূর্বেই। চৈতন্যদেবের পর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা নাটযাত্রার বিশেষ কোনো নমুনা পাওয়া যায় না। বাংলা নাটগীত ও যাত্রাগানের প্রচার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এ সময় কবিগান, পাঁচালী ও কীর্তনের প্রচলন ছিল। তবে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' পালাই এই শতাব্দীর শেষার্ধে সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। যদিও এই পালায় অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগরুচির প্রভাব পড়েছিল। এ পালায় ভাঁড়ামি জাতীয় হাস্যরস ও কৌতুকরসের প্রাধান্য পেল। স্থূল রুচিসম্পন্ন দর্শকেরা সাদরে গ্রহণ করল বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালা। শুধু তাই নয়, নাট্যমন্দির চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি সর্বত্র এই যাত্রা ছড়িয়ে পড়ল।

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিভিন্ন রুচির যাত্রাগানের প্রাদুর্ভাব ঘটল — শক্তিযাত্রা, নাথযাত্র, পালযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা প্রভৃতি। আনন্দের বিষয়, এগুলির মধ্যে অবশ্য রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী জনমানসে বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। কৃষ্ণযাত্রাই অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করল। চৈতন্য প্রভাবই তার মূল কারণ। কৃষ্ণ যাত্রায় 'কালীয়দমনের' কাহিনী বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় কৃষ্ণযাত্রা 'কালীয়দমন' যাত্রা হিসাবে খ্যাত হোল। তবে কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রার দলে মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, নৌকাবিলাস, কংসবধ, প্রভাস, এমনকি নিমাই সন্ন্যাস পালাও সাড়ম্বরে অভিনীত হোত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা শেষদিকে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত ছিল সত্য কিন্তু তার গৌরবহানি ঘটেছিল। মুসলমান আমলের অন্তিম লগ্নের কবি ভারতচন্দ্রের সময় (১৭৬০ খ্রীঃ ভারতচন্দ্রের তিরোধান) সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম ধর্মীয় ব্যাপারে শিথিলতা দেখা যায়। ভগবৎ শক্তির উপরে মানবতার বিকাশের মধ্য দিয়েই তাঁর সাহিত্যের যুগাভিসার শুরু। সাহিত্যের এই প্রভাব পড়েছিল জনচিত্তে। এছাড়া , মুসলমান আধিপত্যের অবসান এবং ইংরাজ আমলের শুরু — এই যুগসন্ধিক্ষণে সমগ্র দেশে জঘন্য রুচি বিকৃতি ঘটেছিল। ফলে পুরানো ধর্মাশ্রিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। নবাব আলিবর্দীর পরে সিরাজদ্দৌলার আমলে নবাব দরবার প্রায় নরকে পরিণত হয়। মানুষের হীন প্রবৃত্তি, কামকেলি , লাম্পট্য এবং মদ্যপের নারকীয় উল্লাসে সমাজ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। সেই অধঃপতিত সমাজের মানুষদের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রাগানের গৌরবহানি ঘটে। অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট যাত্রাপালার মানোন্নয়ন ও গৌরব সম্পাদনের চেষ্টা করেছিলেন শিশুরাম অধিকারী। এ সম্পর্কে ১৮৫৯ সালে রাজেন্দ্র লাল মিত্র তাঁর বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখেছেন —

"গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস পাইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামে এক ব্যক্তি কেঁদুলী গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদান করে। তৎপূর্ব হইতে বহু কালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ

একপ্রকার যাত্রা এতদেশে বিদিত আছে। সংকীর্তন ও পরে 'কবির' প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়শঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাস, সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্তনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছেন।" ২৪

শিশুরাম অধিকারী অধঃপতিত যাত্রাগানকে পুনরায় নবরূপে সঞ্জীবিত করলেও যাত্রা সংস্কারের ব্যাপারে অগ্রদূত ছিলেন শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী। পরমানন্দ নিজে দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। যতদূর জানা যায়, তিনিই প্রথমে যাত্রায় গানের সঙ্গে গদ্য সংলাপ সংযোজন করেন। তাঁর যাত্রার বৈশিষ্ট্য হোল সংলাপের আধিক্য। যাত্রায় বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য তিনি 'তুক্কো' প্রথা প্রবর্তন করেন। পরমানন্দের সমসাময়িক একজন যাত্রাওয়ালা হলেন প্রেমচাঁদ অধিকারী। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কৃষ্ণযাত্রায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রেমচাঁদের শিষ্য ছিলেন বদন অধিকারী। তাঁর নিজের যাত্রা দল ছিল। সেই দলকে বলা হোত 'বদন যাত্রা'-র দল। সুকণ্ঠী বদনের গলায় তাঁর রচিত অতি সাধারণ গানগুলিও একদা শ্রোতাদের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। দান, মান, মাথুর প্রভৃতি পালা অবলম্বনে তিনি যাত্রাপালা রচনা করেন। বদন অধিকারীর মৃত্যুর সঙ্গে 'কালীয়দমন' যাত্রার পুরাতন রীতি বা ফর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কালীয়দমন যাত্রা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তার পাশাপাশি 'রামযাত্রা', 'চণ্ডীযাত্রা', 'মনসার ভাসান' প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'নতুনযাত্রা' বা 'সখের যাত্রা' নামে এক বিচিত্র ধরণের যাত্রা তৈরী হল। বিদ্যাসুন্দর এবং নল-দময়ন্তীর কাহিনী নিয়ে এই নূতন যাত্রা রচিত হয়। কিন্তু এই যাত্রার রুচি উন্নত পর্যায়ের ছিল না। এই যাত্রায় যেমন বিচিত্র ধরণের সঙের আমদানি ছিল, তেমন ছিল অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামি। এস্থলে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মর্তব্য —

> "তখন যাত্রা বলতে শ্রোতা ও অধিকারীরা বুঝতেন সহজ রংদার গান বাজনা ও নাচ আর তার সঙ্গে হালকা চালের সংলাপ।" ২৫

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে গড়ে উঠা সখের যাত্রাওয়ালাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিছক বাস্তবমুখী সস্তা আনন্দ বিতরণ। বরানগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদল গঠন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দলের ঢুলী রামধন মিস্ত্রী নতুন দল গঠন করেন। রামধনের পর প্যারীমোহনের বেলতলার দল বিশেষ খ্যাতিঅর্জন করে। এই দলে নল - দময়ন্তী ও বিদ্যাসুন্দর দুটি পালাই অভিনীত হোত। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ও কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীত এদের যাত্রাগানের বৈশিষ্ট্য ছিল।

গোপাল উড়ে -র বিদ্যাসুন্দর যাত্রাও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। তাঁর বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় মালিনীর নৃত্য একটি বিশেষ অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। গোপালের অভিনয়ের কৃতিত্বে মালিনীর নৃত্য একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করে। নৃত্য বিষয়ে তার সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল। তাঁর সুললিত কণ্ঠসঙ্গীতে, নৃত্যভঙ্গিমায় বিদ্যাসুন্দর যাত্রা নবরূপে দেখা দিয়েছিল। সেযুগে নল-দময়ন্তী যাত্রা প্রচলিত

থাকলেও গোপালের জন্যই যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রচার, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল তা সর্বজনবিদিত। গোপাল নিজে অনেক সময়ে মালিনীর ভূমিকায় রূপদান করতেন। মালিনীর ভূমিকায় নৃত্যরত গোপালকে দেখলে কখনও তাঁকে পুরুষ বলে মনে হোত না। যদিও তাঁর দলে খেমটা নাচ হোত এবং নাচের সঙ্গে যে গান গাওয়া হোত তা ভদ্ররুচিসম্মত ছিল না। গোপালের দলের বিদ্যাসুন্দর পালার হালকা গান গুলি 'গোপাল উড়ের টপ্পা' নামে খ্যাত। গোপালের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালার জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি হলো আদিরসের হালকা গান এবং কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গীসহ খেমটা নাচ, যা তৎকালে রোমাঙ্গপ্রিয় ছেলেবুড়ো সকলকে মাতিয়ে তুলত। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গোপাল উড়ের যাত্রা গান সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন —

> " গোপাল উড়ে হালকা সুরে ও লঘুনাচের ঢঙে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা গেয়ে কলকাতা ও চারপাশের নাগরিক সমাজকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।" ২৬

এই রুচি বিকৃতি শুধুমাত্র নূতন যাত্রা বা সখের যাত্রায় প্রচলিত ছিল তাই নয়, তৎকালে এই যাত্রার পাশাপাশি যে কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা অভিনীত হোত তার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। কিন্তু নব্যশিক্ষিত মার্জিত রুচিবান দর্শক সমাজ এই যাত্রার প্রতি অতিশয় বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। স্বভাবতঃই যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দেখা গেল। যাত্রাকার গোবিন্দ অধিকারী (১২০৫-১২৭৭ বঙ্গাব্দ) সেই পরিবর্তনের সূচনা করলেন। Indian Stage গ্রন্থে সে কথাই বলা হয়েছে —

> "It is to keep peace with these Govinda had to introduce new style." ২৭

ভারতকোষে গোবিন্দ অধিকারীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে —

> "বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণ বংশে প্রখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী নদীয়া জেলার অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়া গ্রামে আনুমানিক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
>
> বাল্যকালে গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি আমতা জেলার অন্তর্গত ধুরখালি গ্রামের গোলক দাস অধিকারীর নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন। জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রাদলের 'ছোকরা' বলিয়া গোবিন্দ অধিকারী খ্যাত ছিলেন। উত্তরকালে তিনি নিজে একটি দল গঠন করিয়া কীর্তন গান করিয়া বেড়াইতেন।" ২৮

গোবিন্দ অধিকারী একাধারে অধিকারী অর্থাৎ যাত্রার স্বত্বাধিকারী, পালাগান লেখক, পরিচালক, প্রধান অভিনেতা, সঙ্গীত রচনাকার এবং সুরকার ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা গুলি হোল 'শুক সারির পালা', 'চড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব' প্রভৃতি। ১৮৭২ সালে এই স্বভাবকবির মৃত্যু হয়।

গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাপালার বৈশিষ্ট্য হল, তিনি ব্যাখ্যামূলক ঘটকালি প্রথা পরিত্যাগ করে যাত্রাগানকে কিছুটা অভিনয়কলায় পরিণত করেন। ফলে যাত্রাগান দর্শনের ব্যাপার বলে গৃহীত হয়। তিনি নিজে যাত্রাগানে দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করে সে যুগের শহরে ও গ্রামে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে দর্শকের হৃদয় জয় করেছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "গোবিন্দ অধিকারী তাঁর যাত্রায় প্রচুর সংলাপ ব্যবহার করে যাত্রাগানে নাটকীয়তা আনবার চেষ্টা করেন, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।" ২৯

শুধু সংলাপেই নয়, সংলাপের ভাষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন পরিচিত চলতি জন জীবন থেকে। যাত্রায় জনপ্রিয় কীর্তনাঙ্গ সংগীত সংযোজনা করে তিনি কৃষ্ণ যাত্রাকে আপাম র জনগণের কাছে অতিশয় জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর গানে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া না গেলেও যেভাবে তিনি হৃদয়াবেগকে সহজ করে দর্শক চিত্তে সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন তা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিদ্যাসুন্দর সখের যাত্রার অশ্লীলতা ও রুচিহীনতার কবল থেকে জনচিত্তকে উদ্ধার করে সৎ ও বিশুদ্ধ ভক্তিরসের যাত্রাগানে অবগাহনে ধন্য করতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১২১৭-১২৯৪ বঙ্গাব্দ) যাত্রা জগতে অবতীর্ণ হন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষ্ণকমল গোস্বামী একাধিক যাত্রাপালা রচনা করে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন। কৃষ্ণযাত্রাকার, পদাবলীকার, কীর্তনগায়ক হিসাবে তাঁর খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করে। 'স্বপ্নবিলাস' তাঁর প্রথম পালা। ১৮৩৫ সালে পালাখানি মুদ্রিত হলে মুদ্রিত পুস্তকের ২০,০০০ কপি অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায়। এ থেকে তাঁর রচিত পালার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমরা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী রচিত অন্যান্য পালাগুলি হলো 'দিব্যোন্মাদ' বা 'রাই উন্মাদিনী' (১৮৪২), 'বিচিত্র বিলাস' (১৮৫৬), 'কালীয় দমন', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'ভরতমিলন' এবং রূপ গোস্বামী বিরচিত নাটক অবলম্বনে 'গর্ন্ধব মিলন'। তাঁর জন্মস্থান ভাজনঘাটে 'নন্দবিদায়' নামে যে যাত্রাপালায় তিনি অভিনয় করেছিলেন সেটি তাঁর নিজস্ব রচনা না হলেও তার সঙ্গীত তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর রচিত যাত্রাপালাগুলি দুই বঙ্গেই অভিনীত হয়েছিল। কৃষ্ণকমলের কৃষ্ণযাত্রার বিশিষ্টতা ও সার্থকতা সম্পর্কে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন—

> " কৃষ্ণকমল গোস্বামীর চক্ষে চৈতন্যের জীবনী সর্বদা উজ্জ্বল ছিল। রাধাকৃষ্ণের রূপকছলে তিনি আরাধ্যের জীবনকাহিনী শুনাইয়াছেন। .... বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস যে কথা দার্শনিকের ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা কবির হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছে। চৈতন্যের কৃষ্ণ বিরহের করুণ উচ্ছ্বাসে মাথুরের সৃষ্টি, তাহার উন্মত্ত প্রলাপে রাই উন্মাদিনী জীবন পাইয়াছে ও স্বপ্নবিলাস সার্থক হইয়াছে।" ৩০

কৃষ্ণকমল শুধু যাত্রাপালাকারই ছিলেন না, তিনি একাধারে ছিলেন পদকর্তা ও পদাবলী গায়ক। স্বভাবতঃই যাত্রাপালাতেও তিনি তাঁর সংগীত প্রতিভাকে ন্যস্ত করেছেন। তিনি যাত্রায় অনুপ্রাস-যমক অলঙ্কার প্রয়োগ করে গানগুলিকে শ্রুতিমধুর মনোহারী করে তুলেছেন। নিম্নে কৃষ্ণকমলের অনুপ্রাস আশ্রিত গীতিময় সংলাপের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো : —

রাগ বসন্ত — তিল তাল
"ভাইরে সুবল! ভাইরে সুবল! উপায় কি করি বল
কেবল রিপুবল হইল প্রবল,
কানাই বিনে বৃন্দাবনে দুর্বলের আর কি আছে বল
পুন কি কালীদহে, বিষজল প্রাণদহে
কিবা দাবানল দহে, দহে বৃন্দাবন সকল।"

গানটিতে সহজ সরল ভাষায় অকৃত্রিম আন্তরিক ভক্তিরসের সঞ্চার ঘটেছে।

'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' ভক্তিমূলক যাত্রাগানের আদর্শকে যে একেবারে বিনষ্ট করে দিচ্ছিল এবং কুমারী বিদ্যার 'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ ঐ বিদেশী' প্রভৃতি খেমটা নাচের রংদার গান আপামর জনগণের রসরুচিকে যে বিকৃত করে তুলেছিল তার কবল থেকে রক্ষা করে শ্রোতাদের মানসিক রসবোধের শুচিতা অনেকখানিই ফিরিয়ে এনেছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁর ভক্তিভাবের কৃষ্ণ যাত্রার মাধ্যমে। কৃষ্ণকমল কৃষ্ণযাত্রায় পুনরায় পুরাতন গীতিময়তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং কৃষ্ণযাত্রাকে একটি সুরুচি সম্পন্ন ভাবগম্ভীর আদর্শের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তাঁর তিরোধান হয়।

কালীয়দমন যাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রার শেষ পর্বের যাত্রাকার হলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। কালীয়দমন যাত্রাকে কুরুচির কবল থেকে মুক্ত করে রুচিশীল লোকনাট্যে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নীলকণ্ঠ অধিকারী। উনিশ শতকের শেষভাগে নীলকণ্ঠ অধিকারী এই মহৎ কর্মে অনেকখানিই সফল হয়েছিলেন। তিনি কালীয়দমন যাত্রাকে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলে ধরে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

নীলকণ্ঠের নিজস্ব যাত্রাপালাগানের সংখ্যা সাত — (১) 'চণ্ডালিনী উদ্ধার', (২) 'প্রভাস যজ্ঞ', (৩) 'কংসবধ', (৪) 'যযাতির যজ্ঞ', (৫) 'মান', (৬) 'মাথুর', ও (৭) 'কলঙ্ক ভঞ্জন'। শেষ জীবনে 'ব্রজলীলা' নামে একটি পালারচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন নীলকণ্ঠ। তাঁর গানে ঠাকুর তৃপ্তি লাভ করতেন। তাঁর গান শুনে ঠাকুরের অনেক দিন ভাবসমাধি হয়েছে। সে দৃশ্য দেখে সকলে ধন্য হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং নীলকণ্ঠকে বলেছিলেন —

> "তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য। অষ্ট পাশ। তা সব যায় না। দু'-একটা পাশ দিয়ে রেখেছেন — লোকশিক্ষার জন্য। তুমি যাত্রাটাত্রা করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে। .... তোমার যেকালে তাঁর নাম করতে চক্ষু জলে ভেসে যায়, সেকালে আর তোমার ভাবনা কি? তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে।" ৩১

জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে নীলকণ্ঠ মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় ছুটে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন — 'নীলকণ্ঠ, যাত্রা ছেড়োনি'। ঠাকুরের আশীর্বাদ ধন্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১৮, ২০শে শ্রাবণ) তাঁর সাধনোচিত ধাম শ্রীরামকৃষ্ণলোকে পাড়ি দেন।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রাগানের বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর পালায় সংলাপ ও গানের সমঞ্জস ব্যবহার। কথকতার রীতিতে তিনি দূতীর ভূমিকায় ঘটনা ব্যাখ্যা করতেন। পাত্র-পাত্রীরা দৃশ্যপটসহ আসরে সশরীরে উপস্থিত হয়ে আপন আপন ভূমিকায় অভিনয় করতেন। 'কণ্ঠ' ভণিতা যুক্ত তাঁর প্রেমভক্তিমূলক গানগুলি একদা শ্রোতাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরত। তাঁর গানে

লিরিক কবিতার মাধুর্যের কারণে একালের পাঠকও তাঁকে শ্রদ্ধা করবেন।

ইংরাজরা কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে বসার পর নিজেদের আনন্দের উৎসস্থল হিসাবে রঙ্গ মঞ্চ স্থাপন করে। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা প্রতিষ্ঠা করে 'প্লে হাউস' রঙ্গালয়। ১৭৯৫ সালে লেবেদেফ 'বেঙ্গলী থিয়েটার' স্থাপন করে 'ডিস গাইস' ও 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' অভিনয় করেন। ১৮৭২ সালে কলকাতায় সর্বপ্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। ইংরাজদের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় প্রভাবিত ও উৎসাহিত হয়ে শিক্ষিত ও রুচিসম্মত বাঙালীরাও মঞ্চ স্থাপন ও নাট্যাভিনয় শুরু করেন। ফলে দেশীয় লোকনাট্য যাত্রার প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমতে থাকে। কিন্তু বাঙালীর একান্ত নিজস্ব লোকনাট্য যাত্রাগানের প্রবাহ স্তব্ধ হয় না। নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তার রূপ (Form) ও রীতি (Content) -র পরিবর্তন সাধন করে একপ্রকার নাটক তৈরী হলো। এই শ্রেণীর নাটকের নাম গীতাভিনয় বা অপেরা। গীতাভিনয়ে গানের সংখ্যা হ্রাস করে মঞ্চ নাটকের ন্যায় অঙ্ক - দৃশ্য অবিচ্ছিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীমূলক নাটকে রূপ দেওয়া হল। গীতাভিনয়ের জন্ম এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন—

> "উনিশ শতকের কৃষ্ণ যাত্রায় নানা বিকৃতি ঘটেছিল এবং ইংরাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচিবিরুদ্ধ নানা ধরণের অশালীন নাচগানের জন্য এই যাত্রা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। সেজন্য যাত্রার স্থানে গীতাভিনয় নামক যাত্রা ও নাটকের এক মধ্যবর্তী রূপ উদ্ভাবিত হল। এতে যাত্রার সঙ্গীত প্রাধান্য ও নাটকের ক্রিয়া প্রাধান্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করা হয়েছিল।" ৩২

বাংলা নাটকের প্রভাবে ক্রমে গীতাভিনয় নাট্যধর্মী হয়ে পড়ে এবং মঞ্চ নাটকের অভিনয় রীতি এতে অনুসৃত হতে দেখা যায়। তৎকালে মনোমোহন বসু ছিলেন প্রখ্যাত গীতাভিনয় প্রণেতা। তাঁর পালা বৌ-মাষ্টারের দল আসরস্থ করত। নতুন যুগের সঙ্গে তাল রেখে জনরুচির চাহিদা বুঝে যাত্রাপালার রূপ-রীতি-প্রকৃতি ও শিল্পরূপের মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়াসী হন মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম জুড়ি গানের অবতারণা করেন। যাত্রায় গানের সংখ্যা কমিয়ে তিনি সংলাপের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অভিনয় কালে দর্শকদের কাছ থেকে পেলা নেওয়ার রেওয়াজ তিনি একেবারে বন্ধ করে দেন। তিনি যাত্রার আঙ্গিক, কলাকৌশল এবং সাজসজ্জার উন্নতি সাধন করে যাত্রার বিশেষ সংস্কার সাধন ও বিকাশ ঘটান।

মতিলাল রায়কে আধুনিক যাত্রার জনক বলা হয়। তাঁর পালাগুলি সবই ছিল ভক্তি রসাশ্রিত। তিনি যাত্রাগানকে লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পালাগানের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা তুলে ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকার ঘুচিয়ে গণচেতনা ও লোকশিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভক্তিময় যাত্রাগানে মুগ্ধ হয়ে পরম পুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ধন্য করেছিলেন।

মতিলাল রায়ের যুগকে যাত্রার ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলা চলে। তাঁর যাত্রার জনপ্রিয়তার ফলে সমগ্র দেশে আরও অনেক যাত্রাদল গড়ে ওঠে। শশী অধিকারীর দল, অহিভূষণ ভট্টাচার্যের দল, বৌ-মাষ্টারের দল, বৌ-কুণ্ডুর দল, প্রসন্ন নিয়োগীর দল ও সত্যম্বরের দল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মতিলালের সময় থেকেই থিয়েটারের অনুসরণে যাত্রায় নাটকীয়তা আনয়নের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। থিয়েটারের প্রভাব অতিক্রম করা মতিলালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশ্য সমকালীন মঞ্চনাট্যেও তাঁর যাত্রার ভক্তিরসধারা প্রবাহিত হয়। নাট্যাচার্য স্বয়ং গিরিশ চন্দ্র ঘোষও তাঁর বন্ধু মতিলাল রায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যাত্রাপালাগুলির উপর থিয়েটারের প্রভাব পড়ে পালাগুলি থিয়েট্রিক্যাল অপেরাধর্মী হয়ে উঠলেও যাত্রাগান কিন্তু থিয়েটারের মধ্যে হারিয়ে গেল না। বাংলা যাত্রাগানের ইতিহাস পরিবর্তনের ইতিহাস। সেই পরিবর্তনের ধারায় যাত্রাগানের মঞ্চধর্মী হয়ে কলেবর পরিবর্তিত হলেও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলায় নি। মতিলালের যাত্রাগানের অভিনয় শৈলী অপরিবর্তিত রয়েই গিয়েছিল।

যুগচেতনা ও জনচাহিদা উপলব্ধি করে যাত্রাকে যিনি থিয়েটারের অঙ্গীভূত করে দেন তিনি মথুরনাথ সাহা। তিনি তাঁর যাত্রাপার্টির নাম দেন থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি। তাঁর দলের পালা রচয়িতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায় থিয়েটারী নাটকের অনুসরণে যাত্রাপালা সাজাতে গিয়ে যাত্রাগানের মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যই নষ্ট করে ফেলেন। আজকে যাত্রায় যে বিকৃতি দেখা যাচ্ছে, মথুরনাথ সাহা তার বীজ উপ্ত করে গিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্বাদেশিক চেতনার জোয়ারে জাতীয় জীবন উদ্বেল হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনকৃত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেই প্রভাব বাংলার লোকনাট্য যাত্রাগানের উপর ও এসে পড়ে। এই সময়ে চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁর স্বদেশী যাত্রার মাধ্যমে বাঙালী জাতিকে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনার যুগের অবসান হয়ে ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক নাটক রচনার সূত্রপাত হয় এই যুগেই। তিনি তাঁর স্বদেশী যাত্রার মাধ্যমে শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলের জনগণকেই স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেননি, শহরের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মানুষজনদেরও তিনি স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। যাত্রাগানের মাধ্যমে দেশাত্মবোধের বাণী কত সহজে আপামর জনগণের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া যায় সে প্রমাণ মুকুন্দদাস দেখিয়েছিলেন তাঁর স্বদেশী যাত্রাগুলির মধ্য দিয়ে। তিনি একাধারে সুগায়ক, দক্ষ অভিনেতা ও যাত্রা পরিচালক ছিলেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামই যে তাঁর যাত্রাপালার বিষয় ছিল তাই নয়, সমাজ সংস্কারের প্রতি ও তাঁর সুগভীর দৃষ্টি ছিল। যাত্রায় সামাজিক পালারচনা তিনিই প্রথম শুরু করেন। ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন —

> "যাত্রায় সামাজিক পালারচনার পথপ্রদর্শক বাংলার চারণকবি মুকুন্দদাস। তিনি সামাজিক যাত্রা গাহিয়া চারণ কবির দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুকুন্দদাস সমগ্র বাংলাদেশকে স্বদেশী যাত্রায় মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। গানও বক্তৃতা অবলম্বনে সামাজিক স্বদেশী যাত্রা পরিবেশনে তাঁহার বিশেষ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ছিল।" ৩৩

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণাতে বাংলা ১৩১৩ সনে মুকুন্দদাস তাঁর প্রথম নাটক 'মাতৃ পূজা' রচনা করলেন। ১৩১৪ সনের ২রা বৈশাখ রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে মুকুন্দদাস 'মাতৃপূজা'

গাইলেন। স্বকীয় রচনায়, তেজোদীপ্ত কণ্ঠমাধুর্যে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে তিনি 'মাতৃপূজা' করে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। প্রমাদ গুণে ইংরাজ সরকার 'মাতৃপূজা' বাজেয়াপ্ত করেছিল। মুকুন্দদাস গেরুয়ার আলখাল্লা পরতেন। মাথায় বাঁধতেন গেরুয়া পাগড়ী। বুকে ঝুলতো পদকের মালা। গৈরিক বসনের সঙ্গে পরিহিত আলখাল্লা হাঁটুর অনেক নিচে পর্যন্ত থাকত। পায়ে পরতেন বিদ্যাসাগরীয় চটি। মহাত্মা গান্ধীয় বক্তৃতা শুনে যেমন মেয়েরা দেশের কাজে হাতের চুড়ি খুলে দিয়েছেন, তেমন মুকুন্দদাসের গান শুনে মেয়েরা হাতে পরিহিত বিদেশী কাঁচের চুড়ি ভেঙে ফেলেছেন। অঙ্গ থেকে সোনার আভরণ খুলে দেশসেবার কাজে দান করেছেন।

মুকুন্দদাস তাঁর দলবল নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি স্থানে পালাগান গেয়ে ঘুমন্ত জাতির মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন। কলকাতা এবং তার আশে পাশে বিভিন্ন মেলা ও বারোয়ারীতে তিনি গান গাইতেন। মুকুন্দদাসের পালাগান কেবলমাত্র খোলা আসরেই আসরস্থ হয় নি, বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হয়েছে। কাহিনীর প্রয়োজনে তিনি স্বরচিত সঙ্গীত ছাড়াও, অশ্বিনী কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের গান তাঁর পালায় ব্যবহার করেছেন। আমাদের দেশে মুকুন্দদাসই প্রথম ব্যক্তি যিনি যাত্রাগানের মাধ্যমে রাজদ্রোহ প্রচার করে কারাবরণ করেছেন। উদাত্ত ও বজ্রকণ্ঠের অধিকারী মুকুন্দদাস উদ্দীপক সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলার জনগণকে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

পালাকার হিসাবে যাত্রাজগতে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর আর্বিভাব যাত্রাজগতে মতিলাল রায়ের অভ্যুদয়ের মতো এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভোলানাথ রায় তাঁর 'কুবলাশ্ব' পালারচনার মধ্য দিয়ে যাত্রাজগতে আর্বিভূত হন। যাত্রাগানের মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মতত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন করে তিনি সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ ভাষা, সুমধুর সংলাপ, তেজোদীপ্ত সংগীত ও মার্জিত হাস্যরসের ব্যবহার তাঁকে সফল পালাকারের মর্যাদা এনে দেয়। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ভোলানাথের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর আশীর্বাদধন্য ব্রজেন্দ্রকুমার নিজেকে 'ভোলানাথের উত্তরসূরীমাত্র' ভাবতে পেরে শ্লাঘা অনুভব করতেন। তিনি অমর পালাকার ভোলানাথ রায় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন —

> "ঐতিহাসিক পালার রুদ্ধ প্রবাহ খুলে দিয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে ভোলানাথ বাবু। .... আমার গুণগ্রাহীরা আমাকে যে বিশেষণেই ভূষিত করুন আমি নিজে জানি, আমি ভোলানাথের উত্তরসাধক মাত্র।" ৩৪

যাত্রাজগতে ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণীবাবু) সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। যাত্রায় মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেন তিনি। যাত্রার শিক্ষকরূপে যাত্রাজগতে "মাষ্টারমশাই" নামে তিনি প্রসিদ্ধ। শিব ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত তাঁর "আধুনিক অভিনয় শিক্ষা" গ্রন্থটি অভিনয় শিল্পের অভিধানের সম্মান লাভ করেছে। দক্ষ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহু বিখ্যাত যাত্রাপালা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত পালাগুলি হোল – পাষাণী, বাসুদেব (১৯২৬), রামানুজ (১৯২৮), মায়াচক্র, চণ্ডীদাস (১৯৩৩), মেদিনী, সাধু তুকারাম, ভাগ্যদেবী (১৯২৪), তর্পণ (১৯২৫), সৈরিন্ধ্রী (১৯২৮), চন্দ্রধর (১৯২৯), কুশধ্বজ (১৯৩০), রূপসাধনা, রামকৃষ্ণ

(১৯৩৬), হাম্বির, মায়ের দেশ, পূর্ণিমা মিলন (১৯৩৮), কবি কালিদাস, চন্দ্রহাস (১৯৪০), মুচির ছেলে (১৯৪২) প্রভৃতি।

ফণিভূষণ তাঁর পালানাটকে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপ করে যুগধর্মী হয়ে উঠেছিলেন। চরিত্রের নামকরণেও তাঁর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। পালায় গানের আধিক্য তিনি কমিয়ে আনেন। যাত্রাগানে চিরকালই একটি প্রস্তাবনা বা বন্দনার মধ্য দিয়ে পালার বিষয়বস্তুর উপরে আলোকপাত করার প্রথা ছিল। ফণিভূষণ সেই প্রথা তুলে দেন। অভিনয় দক্ষতা এবং পালারচনার খ্যাতির জন্য প্রখ্যাত পালাকার শ্রীকানাই লাল শীল তাঁকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৭ সালে জাতীয় সঙ্গীত নাটক একাডেমী তাঁকে পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে এবং বাংলার যাত্রাজগতকে গৌরবান্বিত করে।

একালের বাংলা লোকনাট্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে যাত্রার রূপান্তরের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম ব্রজেন্দ্রকুমার দে। যাত্রায় ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র আবির্ভাব। লৌকিক ও আধুনিকতার এক সংঘাতময় যুগপারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে "যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যবর্তী ব্যবধান" যেমন কমে যায়, তেমন বহুলাংশে "যাত্রার পালা নাটক হয়ে ওঠে"। শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায় ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের উপর্যুক্ত বক্তব্যের অনুসরণে বাংলা যাত্রার যে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়, সেক্ষেত্রে বাংলা যাত্রার ইতিহাসের এক "নবযুগের প্রবর্তক হিসাবে" চিহ্নিত করা যায় পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে। 'লোকনাট্য যাত্রাগান' আলোচনায় মন্মথ রায় স্পষ্টতঃই বলেছেন —

> "আধুনিক যুগের আদ্যভাগে যাঁর শক্তিশালী লেখনী যাত্রাকে যুগোপযোগী সাজসজ্জায় সুসজ্জিত করে জয়যাত্রায় অগ্রসর হল, তিনি শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে।" ৩৫

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১। ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য — যাত্রাগানের গোড়ার কথা, নাট্যলোক ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৫
২। সনাতন গোস্বামী — যাত্রার পালাবদল, বিষয়ঃ প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা-৬৮১
৩। ডঃ সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১৫
৪। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ — বাংলা নাটকের ইতিহাস, পরিবর্ধিত সপ্তম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৫
৫। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ — নাটকের কথা, পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২১৯
৬। ডঃ সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১৬
৭। নগেন্দ্রনাথ বসু — বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড
৮। বিশ্বকোষ পরিষদ — বিশ্বকোষ, ২০-শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮

৯। মন্মথ মোহন বসু — বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃষ্ঠা-৪১
১০। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৬৯
১১। ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য — যাত্রাগানে মতিলাল ও তার সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা-৪
১২। ডঃ সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা-৪৩
১৩। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৯
১৪। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ — যাত্রা; সেকাল ও একাল, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৪০১ পৃষ্ঠা - ১৬৫
১৫। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৯
১৬। ডঃ বৈদ্যনাথ শীল — বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, পৃষ্ঠা-৫২
১৭। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৪
১৮। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ — যাত্রা ; সেকাল ও একাল, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৪০১, পৃষ্ঠা-১৬৫
১৯। সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — যাত্রার ইতিবৃত্ত, বঙ্গদর্শন-১৮৮৩, বাংলা ১২৮৯, পৃষ্ঠা- ৫০৫-৫০৬
২০। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৮
২১। ডঃ সুকুমার সেন — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৯-৪১০
২২। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ — যাত্রা ; সেকাল ও একাল, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৪০১, পৃষ্ঠা - ১৬৫
২৩। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য — যাত্রাগানের গোড়ার কথা, নাট্যলোক, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৭৩
২৪। রাজেন্দ্রলাল মিত্র — বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ ১২৬৫ বঙ্গাব্দ ইং ১৮৫৯
২৫। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা-৫৩৯
২৬। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৩৫
২৭। Hemendra Nath Dasgupta - Indian Stage, Calcutta (1938) Page-122.
২৮। ভারতকোষ — ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯১
২৯। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৪
৩০। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন — ভূমিকা, কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য
৩১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ — কথামৃত, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২১১
৩২। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ — অন্যতর সাহিত্যের যাত্রায় রূপান্তর, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৫৬-২৫৭
৩৩। ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য — বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃষ্ঠা-৭৩
৩৪। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — দাও ফিরে সে অরণ্য, চতুরঙ্গ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
৩৫। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রজেন্দ্র কুমার দে — জীবন পরিচয়

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার গয়ঘর গঙ্গানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চারভাই ও চার বোনের মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার পিতা মাতার ষষ্ঠ সন্তান। পিতা হরকিশোর। মাতা ক্ষীরোদাসুন্দরী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ব্রজেন্দ্রকুমারের প্রাথমিক পড়াশুনা গ্রামের পাঠশালাতেই সম্পন্ন হয়েছিল। পণ্ডিতমশাই যাঁকে 'বিদ্যাসাগর' নামে ডাকতেন সেই ব্রজেন্দ্রকুমার ছেলেবেলাতেই যাত্রাগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। মাত্র ১২ বছর বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পালারূপ দেন তিনি। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী তাঁকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন এবং যাত্রাপালা রচনায় উৎসাহিত করেন।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজেন্দ্রকুমার মেজদা দেবেন্দ্রনাথ ও সেজদা মহেন্দ্রচন্দ্রসহ পিতার সঙ্গে কলকাতার বেলেঘাটায় চলে আসেন এবং ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমিতে ভর্তি হন। ১৯২৩ সালের মার্চে এখান থেকেই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত যাত্রাপালা 'স্বর্ণলঙ্কা' রচনা করেন এবং সাফল্যের সঙ্গে আই. এস. সি. পাশ করেন। এইভাবে তাঁর লেখাপড়া এবং যাত্রাপালা রচনা সমগতিতে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্ক সহ তিনি বি. এ. পাশ করেন। ১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ইকনমিক্সে এম. এ. পাশ করলেন ব্রজেন্দ্রকুমার (সৌজন্য - শ্রীমতী অঞ্জলি দে ও তরুণ কুমার দে)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করলেও প্রবল আত্মসম্মানজ্ঞানী ব্রজেন্দ্রকুমার একাধিক লোভনীয় চাকুরী উপেক্ষা করেন। বিদেশী ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক নির্দেশের প্রতিবাদ করে ব্যাঙ্কের চাকুরী ত্যাগ করেন তুচ্ছ জ্ঞান করে। বি. সি. এস. পরীক্ষায় দু'বার সাফল্য লাভ করলেও পুলিশী রিপোর্টে তিনি বাদ যান। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকুরী ব্রজেন্দ্রকুমারের কাছে সম্মানজনক মনে হওয়ায় মাত্র ৩০ টাকা সাম্মানিক বেতনেই ২.১.১৯৩০ তারিখে তিনি ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমিতে সহশিক্ষক পদে যোগ দেন।

ব্রজেন্দ্রকুমার একাদিক্রমে ৩৯ বছর শিক্ষকতা করেন। তারমধ্যে দীর্ঘ ৩২ বছর প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এই ৩৯ বছরের শিক্ষক জীবনে তিনি একাধিক বিদ্যালয়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমিতে ৩১.১২.১৯৩০ পর্যন্ত চাকুরী করেন। অতঃপর ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩১ সালে তিনি হাওড়া জেলার বাইনান বামনদাস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন।

উক্ত বিদ্যালয়ে তিনি ১৫.৭.১৯৩৭ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ব্রজেন্দ্রপুত্র শ্রীযুক্ত তরুণকুমার দে-র সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানতে পারা যায়, এই সময়েই ব্রজেন্দ্রকুমারের কথাশিল্পী শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কথাশিল্পীর প্রভাব ব্রজেন্দ্রকুমার সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

১৯৩৩ সাল ব্রজেন্দ্রকুমারের জীবনের স্মরণীয় বছর। এই বছরেই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী নীহারকণা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্ত্রীর সাহচর্য এবং উৎসাহে তিনি চলার পথে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন। ১৯৩৭ সালে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে সফলতার সঙ্গে বি. টি. পাশ করলেন ব্রজেন্দ্রকুমার।

ছাত্র বৎসল বজেন্দ্রকুমার ছাত্রদের অনেক দাবি মানলেও কখনোই তাদের অনৈতিক এবং অযৌক্তিক অনুরোধ মানতেন না। একবার পরীক্ষায় অকতৃকার্য কয়েকজন ছাত্র তাঁকে সেজন্য হত্যার পরিকল্পনা করে। তাঁকে গৃহে পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হয়। ভাগ্যক্রমে প্রাণে বাঁচলেও দুর্বৃত্ত ছাত্রদের এই ভয়ঙ্কর আচরণে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। ১৫.৭.৩৭ তারিখে বাইনান বামনদাস বিদ্যালয়ের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে মাটির টানে ফিরে যান জন্মভূমি অধুনা বাংলাদেশে একেবারে বাড়ির কাছে কার্তিকপুরে। সেখানে কার্তিকপুর হায়ার ইংরাজী স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন ২০.৭.৩৭ তারিখে। ১৯৩৯ সালে পিতা হরকিশোর মারা গেলেন। পিতার মৃত্যুতে ব্রজেন্দ্রকুমার অত্যন্ত শোকাহত হলেন। তথাপি চলল তার সাহিত্যসাধনা, চলল তাঁর শিক্ষকতা। তবে বেশিদিন পূর্ববঙ্গে শিক্ষকতা করতে পারলেন না তিনি। আপন ধর্ম এবং ছাত্রস্বার্থ রক্ষার্থে বিধর্মী মুসলমান জমিদারের শত্রুতে পরিণত হলেন। ৩১.১২.৪৪ তারিখে কার্তিকপুর হায়ার স্কুলে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করলেন চিরকালের মতো। এদেশে ফিরে ইছাপুর নর্থল্যাণ্ড হাই স্কুলে টিচার-ইন-চার্জ হিসাবে যোগদান করলেন ব্রজেন্দ্রকুমার। অতঃপর ঐ বিদ্যালয়েই অ্যাডিসানাল হেডমাস্টার হিসাবে কাজ করেন ১.১.৪৫ থেকে ৯.৬.৫২ পর্যন্ত। উক্ত বিদ্যালয়েই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার তাঁর স্কন্ধে তুলে দেওয়া হয় ১০.৬.৫২ তারিখে। এখান থেকে ৩১.১. ৬৯ তারিখে তিনি শিক্ষকতা থেকে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেন।

ব্রজেন্দ্রকুমারের ছয় সন্তান — (১) পুত্র- শ্রী অরুণ কুমার দে, (২) কন্যা - অঞ্জলি দে, (৩) পুত্র, চন্দন কুমার দে,(৪) কন্যা,আরতি দে,(৫) কন্যা,অপর্ণা দে, (৬) পুত্র,তরুণ কুমার দে।

শিক্ষকতা বৃত্তি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও যাত্রাপালা রচনা থেকে তিনি অবসর নেন নি। আমৃত্যু চলে তাঁর সে সাধনা। ১৯৭৬ সালে রচনা করেন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পালানাটক 'পরাজিত মেঘনাদ'। এই বছরেই অভিনয় পত্রিকা তাঁকে 'লোকনাট্যগুরু' উপাধিতে ভূষিত করে।

বার্ধক্যে তিনি কিডনির অসুখে আক্রান্ত হন। কিন্তু অসুখকে তিনি একেবারেই আমল দিতেন না। যাত্রাপালা রচনা, পরিমার্জনা এবং সংস্কার সাধনের কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন তিনি। ব্রজেন্দ্র-তনয়া শ্রীমতী অঞ্জলি দে মহাশয়ার নিকট ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানা যায়, ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে ব্রজেন্দ্রকুমারের বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। ই.সি.জি. ইত্যাদি করা হয়। বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রষ্টেড গ্লান্ডের অসুখ ধরা পড়ে। অপারেশনের জন্য তাঁকে পপুলার নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অপারেশনের পর তাঁর আর জ্ঞান ফেরেনি। ১৯৭৬ সালের ১২ই মার্চ শুক্রবার সকাল ৮.৪০ ঘটিকায় পালাসম্রাট ইহলোক ত্যাগ করে যাত্রা

করেন অমৃতলোকে। তাঁর পার্থিব জীবনের অবসান হলেও তিনি চিরজীবী হয়ে আছেন যাত্রানুরাগী অগণিত দর্শকের হৃদয়ে।

ব্রজেন্দ্রকুমারের তিরোধানের পর তাঁর ইছাপুরস্থ বাসভবনে প্রতিবছরই যাত্রাপরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং জ্ঞানীগুণীজন সমবেত হয়ে ব্রজেন্দ্র-স্মৃতি চারণা করতেন, যাত্রাপালা অভিনীত হোত। ব্রজেন্দ্রকুমার স্মৃতিরক্ষা কমিটি সেখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন।

তাঁর প্রয়াণ - উত্তর নাট্যলোক পত্রিকা ব্রজেন্দ্রকুমার স্মৃতিসংখ্যা প্রকাশ করে। উক্ত পত্রিকায় স্মৃতিচারণা করে প্রখ্যাত নাট্যকার তথা যাত্রাপালাকার বিধায়ক ভট্টাচার্য ব্রজেন্দ্রকুমারের নাটক সম্বন্ধে বলেছেন — "যাত্রানাটকে এই জাতীয় বিন্যাস, এই রকম মধুর সংলাপ - আগে ছিল বলে আমার জানা নেই।" ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ বলতেন -- "যাত্রায় ব্রজেন্দ্রবাবু একটি যুগ।" প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা দিলীপ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন -- "এত লোক যে তাঁর 'সোনাই দীঘি' পালাভিনয় দেখতে আসছেন এখানেই তাঁর অমরত্ব। তিনি যাত্রাপ্রেমী মানুষের মনে চিরজীবি হয়ে থাকবেন।" অভিনেতা স্বপনকুমার যুগস্রষ্টা পালাসম্রাট -র প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছেন — "যাত্রাজগতে ব্রজেন্দ্রকুমারের অবদান অপরিসীম। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত - অশিক্ষিত সকল যাত্রাপ্রেমী মানুষ তাঁর রচিত যাত্রাপালার সংলাপ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতেন।"

ব্রজেন্দ্রকুমারের জীবন ও সাধনা ছিল যাত্রা লক্ষ্মীর সেবা। তিনি কেবলমাত্র পালাসম্রাট বা লোকনাট্যগুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলার যাত্রাপালা ও লোকাভিনয়ের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্তক, যাত্রাশিল্পের অগ্রগতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ পালাসম্রাট।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালা বিষয়ক রচনাবলী

ব্রজেন্দ্রকুমার দে বাংলার যাত্রাপালার ইতিহাসে কেবলমাত্র যাত্রাপালা রচয়িতা 'পালাসম্রাট' মাত্র নন, তিনি বাংলার যাত্রা বিষয়ক আলোচকদের মধ্যে এক অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। যাত্রাপালার সৃজনশীল ধারায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে যেমন পালা রচয়িতা হিসাবে অনন্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেছেন, তেমন বাংলার যাত্রাপালা বিষয়ক আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রেও স্থাপন করেছেন বিশিষ্ট নিদর্শন।

বাংলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় যাত্রার ইতিহাসের এক অবক্ষয়ের যুগে আবির্ভূত হয়ে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে অসংখ্য যাত্রাপালা রচনা করে কেবলমাত্র যাত্রাপালার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেন নি, সেই সঙ্গে যাত্রা বিষয়ক নানা প্রকার রচনাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন তৎকালীন যাত্রা আন্দোলনের ইতিহাসকে। ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রা - বিষয়ক আলোচনা প্রধানত চারটি ধারাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে — (১) সাক্ষাৎকার (২) ভাষণ (৩) চিঠিপত্র ও (৪) প্রবন্ধ।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে -র আলোচনা উপরিউক্ত চারটি ধারাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্নকালে ও বিভিন্নভাবে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র আলোচনা সমূহকে বিষয় বস্তুর দিক থেকে প্রধানত দ্বাদশটি ধারায় বিভক্ত করা যায় — (১) গান, (২) নাচ, (৩) নারী, (৪) আলোকসম্পাত, মাইক, টেপরেকর্ডার, লাউড স্পীকার, (৫) সময়, (৬) সংলাপ, (৭) অভিনেতা – যাত্রা + থিয়েটার + সিনেমা, (৮) যাত্রায় অশ্লীলতা, (৯) প্রধান বা সর্দার শিল্পীর একচ্ছত্র আধিপত্য, (১০) যাত্রা শিল্পীর বৃত্তিগত সমস্যা + সমাধানের পথনির্দেশ, (১১) পালাকারের ক্ষোভ, এবং (১২) যাত্রার ভবিষ্যৎ ভাবনা - উন্নয়নের ভাবনা।

(১) গান

আগে যাত্রাপালাকে বলা হোত যাত্রাগান। গান পালার সিংহভাগ জুড়ে থাকত। কিন্তু কালপ্রবাহে আজ যাত্রাপালা অনেকটাই নাটকের কাছাকাছি চলে এসেছে। তবে সে তার গীতিময়তা একেবারে হারায় নি। যাত্রাপালার এই দুরবস্থায় ব্রজেন্দ্রকুমার অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন। যাত্রাপালা আলোচনা -সমালোচনার সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর সেই আক্ষেপ প্রতিফলিত হয়েছে। যাত্রায় গান বিদায়ের সূত্র অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে তিনি চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য জগতের শিল্পীদের যাত্রায় অনুপ্রবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। যাত্রায় বিবেকের গান একটি বড় সম্পদ। কিন্তু বিবেকের গান গাইবার গাইয়ে আজ আর বিশেষ নেই। জুড়ির গান, সখীর গান, গণের গান, একানে ছেলের গান, দ্বৈত সঙ্গীত সবই আজ যাত্রাপালা থেকে বিদায় নিয়েছে অথবা বিদায় নিতে চলেছে। পালাসম্রাটের আক্ষেপ মুকুন্দদাসের কণ্ঠে 'হাসিতে খেলিতে আসি নি জগতে, করিতে হবে মোদের মায়ের সাধনা'র মতো গান আজ আর শোনা যায় না।

(২) নাচ

যাত্রায় নৃত্যের ব্যাপারটি বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে। সে নৃত্য ছিল মার্জিত, রুচিশীল।

এখন প্রদর্শিত হচ্ছে নগ্ননৃত্য। স্বল্পবাসী নর্তকী-কে আসরে আনা হচ্ছে যার সঙ্গে যাত্রানাটকের কোনো সম্পর্কই নেই। যাত্রাপালার এই অবক্ষয়, নৈতিক সামাজিক মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবলমাত্র ব্যবসার মলিন পথে যাত্রাকে নামিয়ে আনার বিরুদ্ধে পালাকারের কলম কোনোদিনই থেমে থাকে নি। তিনি যাত্রা ব্যবসায়ীদের এইরূপ নির্লজ্জ মনোভাবে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন —

> "পালা যখন কাৎ হয়ে পড়ে তখন ক্যাবারে ডান্স আর নগ্ন নারীদেহ দেখিয়ে ক্ষতিপূরণ করার রেওয়াজ চালু হয়ে গেল। যাত্রাদলের কিছু লোভী মালিকের সঙ্গে যে কিছু লেখকও এ ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছেন এ বিস্ময়কর।" ১

অন্যমাধ্যম থেকে ব্যবসা করতেই যারা যাত্রায় এসেছেন তাদের যাত্রার ভবিষ্যৎ নিয়ে বা যাত্রাশিল্পের সর্বনাশের ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই। তারা ব্যবসা বোঝেন, ব্যবসা করে বেরিয়ে যান, কিন্তু ক্ষতি হয় বুনিয়াদী পালাকারদের, ক্ষতি হয় যাত্রাশিল্পের। যাত্রার এই নগ্নতার বিরুদ্ধে তিনি শুধু প্রতিবাদ করেন নি, সমাজের স্বার্থে, যাত্রার স্বার্থে এই নগ্নতা, ক্লেদ দূর করতে সমাজের সর্বস্তরের যাত্রারসিকদের এবং পালাকারদের এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

(৩) নারী

যাত্রায় নারী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতারা অভিনেত্রী সেজে নারীচরিত্রে অভিনয় করতেন। ষাটের দশকের শেষে রীতিটা পাল্টে গেল। শুরু হোল মহিলাদের স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয়। যাত্রায় নারী-শিল্পীদের আগমনকে ব্রজেন্দ্রকুমার অশুভ সূচনা বলে মনে করতেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে, পত্র-পত্রিকায় তিনি যাত্রায় নারীর আগমনের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছেন। "যাত্রায় নারী"(১৯৬৭) নামে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন। স্বাভাবিকতার সূত্রে যাত্রায় নারীর আগমনকে অনেকেই অবশ্যম্ভাবী বলেছেন। কিন্তু পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র মতে, কথাটি সত্য নয়। আগে পুরুষরানীদের অভিনয়ও আসর মাৎ করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন —

> "আগে স্ত্রী - ভূমিকায় পুরুষরাই অভিনয় করত —আমরা কেউ তাদের দেখে হাসি নি, অবজ্ঞায় মুখ ফেরাই নি। "উপেন রানী, কমল রানী, বিভূতি রানী, নিতাই রানী, সুবল রানী, যতীন রানী, ছবি রানী, হরিগোপাল রানী শতদল রানী — এরা বহুদিন ধরে কোটি কোটি শ্রোতাকে কাঁদিয়েছে, মাতিয়েছে।"২

নারী শিল্পীরা যে যাত্রায় অভিনয় জমাতে পারবে না, তা নয়। যাত্রায় নারী শিল্পীদের আগমনে ব্রজেন্দ্রকুমারের শঙ্কা এই কারণে যে তাদের নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা তাঁকে দেখতে হবে। সর্দার অভিনেতা, ম্যানেজার এবং মালিকেরা তাদের জঘন্যভাবে, কুৎসিত ভাবে ব্যবহার করবে। তাদের নির্যাতন থেকে, তাদের থাবা থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা অভাবী অবলা নারী শিল্পীদের নেই। এদের বাঁচাবারও কেউ নেই। তাই যাত্রায় নারীর আগমনকে ব্রজেন্দ্রকুমার স্বাগত জানাননি। নারী মর্যাদার পক্ষপাতী ছিলেন বলেই নারীত্বের চরম অবমাননা এবং লাঞ্ছনাকে লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্রকুমার মেনে নিতে পারেন নি। প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন নারী মর্যাদা দানকারী পালাকার, তাই তিনি লোকনাট্যগুরু, পালাসম্রাট।

(৪) লাউড স্পীকার, মাইক, লাইট, টেপরেকডার

ষাটের দশকের অন্তিম লগ্নে কিছু কিছু যাত্রা পালাভিনয়ে মঞ্চানুগ আলোক সম্পাত, লাউড স্পীকার, মাইকের ব্যবহার শুরু হয়। সত্তরের দশকের প্রারম্ভে আসরে জীপ গাড়ি উপস্থিত হয়। জন্তু-জানোয়ারের সহায়তা গ্রহণও শুরু হয় যাত্রা শিল্পে। ব্রজেন্দ্র কুমার এসবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কেননা যাত্রায় লাউড স্পীকার, মাইকের ব্যবহারের ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উদাত্ত কণ্ঠ হারিয়ে গেল। ক্ষীণকণ্ঠী নারীর আগমনের পথ প্রশস্থ হল। আর যাত্রায় পরিবেশিত হতে লাগলো আদিরস, অশ্লীলতা, কদর্যতা। তাতে সহায়তা করলো আলোক সম্পাত। ব্রজেন্দ্রকুমার এগুলিকে ' অবাঞ্ছিত ভূত' বলে ধিক্কার জানিয়েছেন। যাত্রাপালার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করেছে উক্ত উৎপাত। যাত্রায় অভিনয় ধারার বিবর্তন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে ব্রজেন্দ্রকুমার দে বলেছেন–

> " ১৯৬৭ সালের পর থেকে এলেন মঞ্চ এবং পর্দার রথী-মহারথীরা। তাঁরা এসে বাচনিক যাত্রাকে আলোর ঝল্কানিতে সজ্জিত করলেন, অভিনেতার মুখের সামনে ধরলেন যন্ত্র, আর শ্রোতাদের কানে টেপ রেকর্ডার, লাউড স্পীকার ইত্যাদি। মাইক কি করেছে ? গলার জোর কমিয়েছে, কাজ কমিয়েছে। .. এতে যাত্রা মাটির মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। " ৩

যাত্রা বাচনিক অভিনয়ের মধ্যেই থাকুক — এটাই চেয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে। কিন্তু যাত্রা আজ আর বাচনিক অভিনয়ে নেই, এর অর্ধেক স্থান জুড়ে রয়েছে মাইক, টেপ রেকর্ডার ও আলো। জীবনের শেষ পর্বে মাইকের ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় হলেও আলোক সম্পাতের ব্যাপারে তিনি কঠোর ছিলেন।

(৫) সময়

ব্রজেন্দ্রকুমারের আগমনকালে যাত্রাভিনয় চলত প্রায় আট ঘন্টা ধরে। গানের সংখ্যা থাকতো প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। গানগুলি দৈর্ঘ্যেও বড়ো ছিল। থাকত জুড়ির গান, বেহালাদার ও বাঁশীওয়ালাদের কেরামতি। ফলে পালাভিনয় সমাপ্ত হতে সকাল হয়ে যেত।

আজকের গতিময়তার যুগে, বিজ্ঞানের প্রভাবে সবকিছুতেই পরিবর্তন দেখা গেল। বাংলার লোকসাহিত্য যাত্রা শিল্পের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হল। যান্ত্রিক যুগের কর্মব্যস্ত মানুষের আট-দশ ঘন্টা বসে যাত্রা শোনার সময় নেই। যাত্রাভিনয়ের সময় কাল কমতে কমতে স্বভাবতই আড়াই-তিন ঘন্টায় নেমে এলো।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে যাত্রায় কিছু পরিবর্তনের বিরোধিতা করলেও যাত্রার পরিসর সংক্ষেপ করার কাজে নিজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং সংক্ষিপ্ত পালা রচনা করে সংক্ষেপকরণকে তরান্বিত করেছেন। যাত্রা তার পরিবর্তিত রূপ নিয়ে পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আজও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের শহরে গ্রামে দুরন্ত গতিতে অভিনয় ধারা অব্যাহত রেখেছে।

(৬) সংলাপ

দীর্ঘ সংলাপ প্রচলনের যুগে ব্রজেন্দ্রকুমার দে -র যাত্রায় আবির্ভাব। সে যুগে অভিনেতা-অভিনেত্রী একবার কথা বলা শুরু করলে আর থামতে চাইতো না। পালাভিনয়ও চলতো দীর্ঘ সময় ধরে। ব্যস্তময়তার যুগে মানুষের কাছে সময়ের মূল্য মহার্ঘ হওয়ায় পালা সংক্ষিপ্ত হল, ছোট হল যাত্রার সংলাপ। সংলাপ সংক্ষিপ্তকরণের বৈপ্লবিক কাজ করেন পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর 'চাঁদের মেয়ে' (১৯৩৬) যাত্রাপালা রচনার মধ্য দিয়ে সংলাপ সংক্ষিপ্ত করার কাজ শুরু করেন। যাত্রা যেহেতু Performing Art, সেহেতু আসরস্থ না হলে তা সফলতা পায়না। দীর্ঘ সংলাপের যুগে সংক্ষিপ্ত সংলাপের পালা 'চাঁদের মেয়ে' কোন দলই অভিনয় করতে চায় না। অবশেষে নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টির গৌরব সূর্য দত্ত এই পালাভিনয় করেন এবং তার নির্দেশনায় এই পালা সুপার হিট্ হয়। এই সফলতায় সংক্ষিপ্ত সংলাপযুক্ত যাত্রাপালাভিনয় শুরু হয়ে যায়। ব্রজেন্দ্রকুমার দে যাত্রাপালার সংলাপ ছোট করার পাশাপাশি যাত্রাপালার কাহিনী সংস্থাপনে প্রথম থেকেই নাটকীয় সংঘাত (Dramatic Conflict) তৈরী করতেন। ফলে পরবর্তী ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য শ্রোতারা উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন। ড্রামাটিক সাসপেন্স তৈরীতে তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁর মতে, Short Dialogue -এ সফলতার জন্য প্রয়োজন গল্পের মনোজ্ঞ বাঁধুনী, শিল্পীর সতর্কতা আর শ্রোতার মনোযোগ।

(৭) অভিনেতা—মঞ্চ, সিনেমা

পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে যাত্রালক্ষ্মীর সেবা করে গেছেন। যাত্রাকে পরিমার্জিত পরিশীলিত করে ভদ্রলোকের উপযোগী করেছেন যাত্রাকে যাত্রা রেখেই। যাত্রার পায়ে থিয়েটার সিনেমার বেড়ী পরাতে যে সমস্ত অনাদৃত শিল্পী যাত্রাশিল্পে ভিড় জমালেন তাদের প্রতি ব্রজেন্দ্রকুমারের ছিল অসীম ক্ষোভ। মথুরনাথ সাহাই প্রথম যাত্রা জগতে থিয়েটার পাড়ার লোকজনদের আমন্ত্রণ জানিয়ে যাত্রাকে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত করে তৈরী করেছিলেন থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি। মঞ্চ থেকে আগত শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায় বা বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং উৎপল দত্ত মহাশয়দের ব্রজেন্দ্রকুমার বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা যাত্রাপালা রচনা করেছেন যাত্রার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই। এঁদের রচনায় যাত্রাসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁরা যাত্রায় এসেছিলেন যাত্রাকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা করে। ব্রজেন্দ্রকুমারের মতে, মঞ্চ ও পর্দার কোণঠাসা শিল্পীরা, যারা জীবিকার তাগিদে, অর্থের লোভে যাত্রায় ভিড় করেছেন, শিল্পের মর্যাদার প্রতি যাদের কোন দৃষ্টি ছিল না, তারাই যাত্রার জাত নষ্ট করেছে, যাত্রাকে অযাত্রিক পথে প্রবাহিত করতে চেয়েছে। ব্রজেন্দ্রকুমারের বিশ্বাস যাত্রাপ্রেমী দর্শকেরা কোনদিন তাঁদের ক্ষমা করবে না।

(৮) যাত্রায় অশ্লীলতা

যাত্রায় নারীর আগমনকে ব্রজেন্দ্রকুমার দে কখনোই স্বাগত জানান নি। প্রায় চল্লিশ

বছর পেশাদার যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত পালাকার বুঝেছিলেন নারীর অনুগমন করেই যাত্রায় এসে যাবে অশ্লীলতা। তিনি বুঝেছিলেন কিছু ব্যবসায়ী, দলমালিক, সর্দার অভিনেতা, ম্যানেজার নারীর দারিদ্র্যের, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের অশ্লীলতার পাঁকে ঠেলে দেবে। তাদের অসৎ কাজে ব্যবহার করবে। চলচ্চিত্রের ক্লেদাক্ত দৃশ্যগুলো এইসব মহিলা অভিনেত্রীদের সাহায্যে যাত্রার আসরে পরিবেশন করা হবে। অধিকারীদের নির্লজ্জ অপপ্রয়াসকে ব্রজেন্দ্রকুমার তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন —

> " আগেকার দিনে সংলাপে অশ্লীলতা ছিল, কিন্তু আসরের উপর আদিরসের নগ্ন প্রকাশ ছিল না। আজ এই নির্লজ্জ অশ্লীলতার আমদানি হয়েছে শুধু অধিকারীদের প্রয়োজনে। পালা যখন শুয়ে পড়েছে, তখনই প্রায় নগ্ন নারীদের দেখিয়ে দর্শক আকর্ষণ করার এই অপপ্রয়াসের নিন্দা করার ভাষা আমার নেই। যাত্রা শিল্পে মহিলা শিল্পী সমাগমের ফলে এ কাজটা আরো বেশী করে সম্ভব হয়েছে। " ৪

আজীবন যাত্রা সাধক ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রার এই কদর্য রূপ কখনোই আশা করতে পারেন নি। যাত্রার এই অধঃপতন তাঁকে মর্মাহত করেছিল। বাংলার লোকনাট্য যাত্রাশিল্প যে ধ্বংসের দিকেই ধাবিত হচ্ছে ব্রজেন্দ্রকুমার তা লক্ষ্য করেছিলেন।

(৯) যাত্রা শিল্পীদের বৃত্তিগত সমস্যা ও সমাধানের পথনির্দেশ

লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্রকুমার দে যাত্রাপালা রচনা করে যাত্রার সংস্কারসাধন ও যাত্রালোচনা সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, যাত্রা দলের অভিনেতা অভিনেত্রী এবং কর্মীদের পেশাগত সমস্যার কথা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকায় তুলে ধরেছেন। যাত্রা দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত সকলের পরিপূর্ণ সহযোগিতার ফলেই যাত্রাপালা আসরে সফলতা পায়। কিন্তু একটি যাত্রা দলে সকল শিল্পী, কর্মীদের মর্যাদা সমান নেই, তাদের ব্যক্তিগত সমস্যারও অবধি নেই। দলের যারা শক্তি, যারা দলের স্তম্ভস্বরূপ, সেই নীচুতলার কর্মী ও শিল্পীদের পেশাগত উন্নতি সাধনের চেষ্টায় পালাসম্রাট সারাজীবন আন্দোলন করে গেছেন, তাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

যাত্রা শিল্পীদের চাকুরীর স্থায়িত্ব নেই, তাদের বেতন বৃদ্ধি হয় না। অবসরকালীন কোন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় না। যাত্রা শিল্পীদের বৃত্তিগত সমস্যার কারণে অধিকাংশ শিল্পীই শেষ বয়সে খুবই কষ্ট পান। শিল্পীর কর্ম চলে গেলে কেউ তাদের ডাকে না। ফলে সে সময়ে তাদের দুরবস্থার সীমা থাকে না। শিল্পীদরদী পালাকার যাত্রার স্বার্থে, শিল্পের স্বার্থে দলমালিক অধিকারীদের শিল্পীদের প্রতি একটু মানবিক ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছেন।

আনন্দের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাত্রা শিল্পীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন— তাঁদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিল্পীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কিছু শিল্পীর পেনশনের ব্যবস্থা করেছেন রাজ্য সরকার।

(১০) প্রধান বা সর্দার অভিনেতাদের একচ্ছত্র আধিপত্য

ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রাদলে ব্যক্তিতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যাত্রাদলে Team Work একান্ত আবশ্যক। একটি যাত্রাপার্টিতে সকল স্তরের শিল্পী, কলাকুশলী, বায়েন এবং কর্মীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় যাত্রাপালার সকল রূপায়ণ সম্ভব হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রতিটি দলেই সর্দার শিল্পীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। তারা তাদের নীচুতলার কর্মীদের উপর দৌরাত্ম্য চালাত। তার ভয়ে দলের সকলেই ভীত , সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। ব্রজেন্দ্রকুমার দে যাত্রাদলে এইরূপ স্টার সিস্টেম বা প্রধান অভিনেতাদের একচ্ছত্র আধিপত্যকে যাত্রাজগতের এক নিদারুণ বিপর্যয় বলে মনে করতেন।

(১১) পালাকারের ক্ষোভ

যাত্রায় অতীত কীর্তির মূল্যায়নের কোন ব্যবস্থা নেই. যাত্রালক্ষ্মীর সেবায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের স্মৃতি পূজার কোন আয়োজন করা হয় না। যাত্রাজগতে গর্ব করার মতো অসংখ্য সুদক্ষ অভিনেতা -অভিনেত্রী, গায়ক, বাদক, নৃত্যশিল্পী হারিয়ে যেতে বসেছেন। অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পীদের শিল্পকর্মকে বাঁচিয়ে রাখার কোন ব্যবস্থাই আমাদের মত দুর্ভাগা দেশ করতে পারে নি বলে ব্রজেন্দ্রকুমারের একান্ত ক্ষোভ। উত্তরকালের যাত্রাপ্রেমী প্রজন্ম এই সকল অমিত শক্তিধর শিল্পীদের মন-পাগল করা অভিনয় সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারবে না। ১৯৭৪ সালে ব্রজেন্দ্রকুমারের জীবনের শেষের দিকে এইচ. এম. ভি. গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁর 'নটী বিনোদিনী' যাত্রাপালার লং প্লে রেকর্ড বার করে। এই মহৎ কর্ম অভিনন্দনযোগ্য। তবে এটি শুধুই শ্রাব্য। একই সঙ্গে দৃশ্য এবং শ্রাব্য হলে আরও ভালো হতো। পরবর্তী প্রজন্মের যাত্রাপ্রেমিক মানুষেরা যশস্বী শিল্পীদের মনমাতানো অভিনয় দর্শন করে ধন্য হতে পারতেন। সরকারের বিরুদ্ধেও তাঁর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল গণশিক্ষার অপরিহার্য মাধ্যম যাত্রাশিল্পের উপর সরকারের প্রমোদকর আরোপের জন্য। শিল্পীর সম্মান, পালাকারের মর্যাদাদান এই শিল্পে গৌণ। – এটা সমাজের লজ্জা।

(১২) যাত্রার উন্নয়নের ভাবনা

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বাংলার নিজস্ব সম্পদ বাংলার ঐতিহ্য লোকনাট্য যাত্রাগানের উন্নয়ন এবং এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। তিনি দেখেছেন কিছু অধিকারী, মালিক ও প্রধান অভিনেতাদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির জন্য যাত্রা অধঃপতনের দিকে যাত্রা করেছে। যাত্রাকে বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষার্থে তিনি একশ্রেণীর লোকের বিরাগভাজন হবেন জেনেও তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন । এ বিষয়ে তিনি কতকগুলি প্রস্তাব রেখেছেন –

> " অকারণ Rate -এর আকাশছোঁয়া গতি বন্ধ করুন, অন্ততঃ দু'পালার কম কোথাও বায়না নেবেন না, সর্দার অভিনেতার উপর নির্দেশনার ভার দেবেন না, বছরে একখানা নাটক ভালো করে খুলবেন, আর গদিতে বসে নায়েকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবেন। " ৫

ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালা বিষয়ক রচনাবলী

বাংলার লোকঐতিহ্য 'যাত্রার গঙ্গাযাত্রা' অর্থাৎ অধঃপতনের দিকে যাত্রা ব্রজেন্দ্রকুমারকে অতিশয় পীড়িত করেছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধে, চিঠি পত্রে, সাক্ষাৎকারে, বক্তৃতায়, ভাষণে যাত্রাশিল্পকে বাঁচাতে, যাত্রার উন্নয়নের জন্য অধিকারী, যাত্রাপ্রেমী অগণিত মানুষ, সুধীজন এবং সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সব্যসাচীর ন্যায় একদিকে সৃজনশীল ধারায় যাত্রাপালা রচনা করে এবং অন্যদিকে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণমুখী আলোচনা প্রবন্ধাদির মাধ্যমে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বাংলার যাত্রার ইতিহাসে যুগান্তর ঘটিয়েছেন এবং যাত্রার উন্নতি সাধন করেছেন।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — বাংলার যাত্রানাটক, সপ্তাহ ১.০৪.১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৩০

২। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — যাত্রাপথের শেষে, অম্বিকা কালনা মহিষমর্দিনী নাট্যসমিতির রজত জয়ন্তী উৎসবের ভাষণ, ১৯৭৪, যুগচেতনা, পৃষ্ঠা-১০৩৮

৩। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নাট্যলোক, নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ম বর্ষ, ৮ম-৯ম সংখ্যা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৩১

৪। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — যাত্রাপথের শেষে, অম্বিকা কালনা মহিষমর্দিনী নাট্যসমিতির রজত জয়ন্তী উৎসবের ভাষণ, ১৯৭৪, যুগচেতনা, পৃষ্ঠা-১০৪০

৫। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — যাত্রার গঙ্গাযাত্রা, নাট্যলোক, ১০ম বর্ষ, ৮ম-৯ম সংখ্যা, ১৯৮২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৪

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালার শ্রেণীবিভাগ

যুগপারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনে দর্শক সমাজ ও সামাজিকতার চাহিদা অনুসারে কালপ্রবাহে যাত্রার পালারূপের, পালার বিষয়বস্তুর নানাপ্রকার রূপান্তর ঘটেছে। যাত্রায় ভক্তিরস থেকে পৌরাণিকতা, পৌরাণিকতা থেকে ঐতিহাসিকতা, ঐতিহাসিকতা থেকে কাল্পনিকতা, কাল্পনিকতা থেকে সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক চেতনাজাত্য নানাবিধ রূপান্তর ঘটেছে কালের গতিতে ও যাত্রাপালাকারদের প্রতিভার স্পর্শে। এইভাবে যাত্রাপালার বিভিন্ন বিভাগকে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজন করেছেন।

নাট্যাচার্য অজিত কুমার ঘোষ যাত্রায় পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক কাহিনী, ঐতিহাসিক, জাতীয়-ভাবোদ্দীপক বিষয়, দেশাত্মবোধক কাহিনী, ধর্মমূলক, সামাজিক কাহিনী, বিশ্বের রাজনীতি, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং বিপ্লবী রাষ্ট্রনেতাদেব কাহিনী, বিপ্লবাত্মক কাহিনী ইত্যাদি বিষয় ভিত্তিক যাত্রার কথা বলেছেন (যাত্রা ঃ একালের বিচার, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১৪০১)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য যাত্রার আলোচনাকালে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক, স্বদেশী যাত্রা, সামাজিক যাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রার কথা বলেছেন (যাত্রা, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১৪০১)। শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায় যাত্রাকে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, দেশাত্মবোধক, রূপক, পল্লীগাথা, জীবনী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন (লোকনাট্য যাত্রাগান, মন্মথ রায়)। লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য যাত্রাকে বিষয় হিসাবে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক, ঐতিহাসিক, বিপ্লবী - বিদ্রোহী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকাহিনী, সামাজিক কাহিনী, কাল্পনিক কাহিনী, জীবননাট্য, কথাসাহিত্য ও স্বদেশী নাটকের যাত্রারূপ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভাজন করেছেন। ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নাট্যতত্ত্ব বিচার' গ্রন্থে পৌরাণিক – ধর্মমূলক, ঐতিহাসিক, সামাজিক যাত্রা-নাট্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন (নাট্যতত্ত্ব বিচার, ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়)।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ যেভাবে যাত্রাপালার বিভাজন করেছেন সেই বিভিন্ন প্রকার পালা বিভাজনের অনুসরণে বিভাগগুলি প্রধানত ঃ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও দেশাত্মবোধক, সামাজিক, রূপক, পল্লীগাথা, কাল্পনিক, বিপ্লবী-বিদ্রোহী ও রাজনৈতিক নেতৃকাহিনী, জীবনীমূলক, পৌরাণিক-ধর্মমূলক, কথাসাহিত্য ও বিদেশী নাটকের যাত্রারূপ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে -র যাত্রাপালার বিষয় বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তাঁর যাত্রাপালা সমূহের বিষয় বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। তাঁর যাত্রাপালা সমূহের প্রধান প্রধান বিভাগগুলি নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা যায় —

(ক) পৌরাণিক, (খ) ঐতিহাসিক, (গ) কাল্পনিক, (ঘ) সামাজিক, (ঙ) লৌকিক, (চ) জীবনী, (ছ) কথাসাহিত্যের যাত্রারূপ, (জ) রূপকথা, (ঝ) দেশাত্মবোধক, ও (ঞ) পল্লীগাথা ইত্যাদি।

পৌরাণিক নাটক ঃ স্বর্ণলঙ্কা, ভক্তাধীন, প্রবীরার্জুন, অম্বরীষ, লীলাবসান,

কুরুক্ষেত্রের আগে, দানবীর (হরিশচন্দ্র), ভক্তকবি (কবি জয়দেব / গীতগোবিন্দ), ভক্তের ডাক, দেবতার গ্রাস, মহিষাসুর, ভরতবিদায় (মহীয়সী কৈকেয়ী), সতী তুলসী, রক্তের আলপনা, পাণ্ডপ প্রদীপ, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, বজ্রনাভ, রাজর্ষি, রাজলক্ষ্মী, সতীর পতি, পুরুষোত্তম, জীবন যজ্ঞ (রামরাজ্য/ বিরোধী), বীর অভিমন্যু, উপেক্ষিতা, নাস্তিক (সংগ্রাম ও শাস্তি), সম্রাট দুর্যোধন, কৃষ্ণ-শকুনি, অকুল গাঙের মাঝি, কলঙ্কিনী রাই, সীতার বনবাস, কৃষ্ণ-সুদামা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নদে ভেসে যায়, রামরাজ্য, পরাজিত মেঘনাদ (মেঘনাদ বধ)।

ঐতিহাসিক নাটক ঃ নেকড়ের থাবা, ভৈরবের ডাক, জনতার মুকুট, সম্রাট জাহান্দার শাহ, চাষার ছেলে (মানিক মালা), বঙ্গবীর, বর্গী এলো দেশে, বিচারক, রাজ সন্ন্যাসী, দুর্গাদাস, রক্ততিলক, ঝাঁসীর রাণী, নবাব হোসেন শাহ (নফর নবাব), শেষ অঞ্জলি, সোরাব রুস্তম, শয়তানের চর, বাঙালী (শেষ নমাজ), নন্দকুমারের ফাঁসী, বালির বাঁধ, মুজিবের ডাক (ধ্বংসের ডাক/কাণ্ডারী হুঁসিয়ার), দাসীপুত্র, ধূলার স্বর্গ, হে অতীত কথা কও, কলিঙ্গ বিজয় (অশোক বলয়/রক্ত নদীর ঢেউ), রাজা গণেশ, বাঘিনী, চিতোর লক্ষ্মী, উদয়ের মা, দুর্গাদাস, সোনার ভারত, ময়ূর সিংহাসন, সুলতানা রিজিয়া, আবুল হাসান (দু'দিনের সুলতান), শের-ই-তুঘলক, বারুদের মসনদ, দেশের ডাক, চাঁদবিবি, রাজদ্রোহী, লৌহমানব, অশ্রু-রক্ত-কবর, পাপের ফসল, মতির কান্না, ভৈরবের ডাক, প্রতিদান, চাঁদমুকুল।

কাল্পনিক যাত্রাপালা ঃ যাদের দেখে না কেউ, রাজনন্দিনী, রক্তের নেশা, সত্যাশ্রয়ী, সোনাই দীঘির পরে।ব

সামাজিক পালা ঃস্বামীর ঘর, লৌহপ্রাচীর, দেশের দাবি,বাঁশের বাঁশি, পবিত্র পাপী, দোষী কে? (নিষিদ্ধ ফল), প্লাবন, মেঘে ঢাকা রবি, মূর্খের পাঁচালী, দুধ সায়রের দেশে, জবাব চাই, কাঁটার বাসর (শঙ্খ বলয়), তাসের ঘর (বাগদান/গৃহলক্ষ্মী), অনাথ জননী, মৃতের মিছিল, ঝড়ের খেয়া, ধর্মের বলি, আকালের দেশ, পরশমণি, উজানীর চর, গন্ধর্বের মেয়ে, কোহিনূর, ভারততীর্থ, যুগের দাবি, প্লাবন প্রভৃতি।

লৌকিক কাহিনী - নির্ভর যাত্রাপালা ঃ ঝড়ের দোলা, রামী চণ্ডীদাস, আঁধারের মুসাফির ইত্যাদি।

জীবনীমূলক যাত্রাপালা ঃ মায়ের ডাক, করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ - সারদামণি, মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন, নটী বিনোদিনী, বিদ্রোহী নজরুল, ভারতপথিক রামমোহন।

কথাসাহিত্যের যাত্রারূপ ঃ চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, সীতারাম, কৃষ্ণকান্তের উইল, দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী।

রূপকথা নির্ভর যাত্রাপালা ঃ পরশমণি, রাহুগ্রাস।

দেশাত্মবোধক যাত্রাপালা ঃ রক্তের নেশা, রাজা দেবিদাস।

ময়মনসিংহ গীতিকা -আশ্রয়ী যাত্রাপালা ঃ চাঁদের মেয়ে, সমাজের বলি,

গাঁয়ের মেয়ে, ভাগ্যের বলি, সোনাই দীঘি, লোহার জাল, সতীর ঘাট, কবি চন্দ্রাবতী, মহুয়া, ঝড়ের দোলা (সম্রাট কায়কোবাদ/বারুদের মসনদ), মগের মুল্লুক (অনেক রক্ত ছড়িয়ে)।

অন্যান্য পল্লীগাথা - নির্ভর যাত্রাপালা ঃ বর্গী এল দেশে, পাহাড়ের চোখে জল, পতিঘাতিনী সতী, আঁধারের মুসাফির, ছিন্নতার, ধর্মের বলি ইত্যাদি।

উপরিউক্ত বিষয়ভিত্তিক যাত্রাপালাগুলি লক্ষ্য করে আমরা দেখতে পাই ব্রজেন্দ্রকুমার দে বাংলার যাত্রাপালার বহু প্রচলিত ধারাগুলি অবলম্বন করে যেমন যাত্রাপালা রচনা করেছেন, তেমন যুগ চাহিদা ও স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে সৃষ্টি করেছেন যাত্রাপালার নব নব রূপ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও রূপ রচনার বৈশিষ্ট্য ব্রজেন্দ্রকুমার দে - কে সুপরিচিত করেছে পালাসম্রাট রূপে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন পালার পরিচয় পাঠ

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে - রচিত পালাসমূহের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন পালার সম্যক পরিচয় পাঠ একান্ত প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে তাঁর রচিত বৈশিষ্ট্যময় পালাসমূহের কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। এই দিক থেকে প্রয়োজনানুসারে ব্রজেন্দ্রকুমার দে - র বিভিন্ন যাত্রাপালার বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা বাঞ্ছনীয়।

লীলাবসান (১৯৩৪) – ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত এই পৌরাণিক পালাটির প্রকাশক ডায়মণ্ড লাইব্রেরী। ১৭৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে পঁয়ত্রিশ টাকা। সর্বপ্রথম গণেশ অপেরা এই পালাভিনয় করে এবং প্রভূত যশলাভ করে।

ব্রজেন্দ্রকুমার এই পালায় প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার লীলাপ্রসঙ্গের অবতারণা না করে তাঁর লীলাবসানের পালাগান গেয়েছেন। এ নাটকের ভূমিকায় পালাকার বলেছেন —

> "দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে তো আঁকিতে পারি নাই, তাঁর সারা জীবনের লীলাখেলা পশ্চাতে রাখিয়া বাহিরের যে শ্রীকৃষ্ণ সুখ-দুঃখের অনুভূতি লইয়া মুখের হাসি চোখের জলে লোকচক্ষে ধরা দিয়েছিলেন, তাঁহাকে লইয়াই এই নাটকের অবতারণা করিয়াছি।" ১

এই নাটকের চরিত্র সংখ্যা ২২, এরমধ্যে পুরুষ চরিত্র ১৫ জন। পঞ্চাঙ্ক এই পৌরাণিক নাটকের প্রথমাঙ্কে ছয়টি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। দ্বিতীয়াঙ্ক পাঁচটি দৃশ্যে সমাপিত। তৃতীয়াঙ্ক পরিব্যাপ্ত রয়েছে ছয়টি দৃশ্যে। চতুর্থাঙ্কে পরিলক্ষিত হয় পাঁচটি দৃশ্য। পঞ্চম তথা শেষাঙ্ক তিনটি দৃশ্যে সমাপ্ত।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে - র 'লীলাবসান' (১৯৩৪) পালাখানি আলোচনার প্রাক্কালে পালাখানি রচনার পশ্চাদপটটি জানা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে পালাসম্রাটের পুত্র শ্রীযুক্ত তরুণকুমার দে মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য —

> "রাত্রে শুয়ে শুয়ে তাঁর মনে পড়ে ছোটবেলার একটা দৃশ্য। জ্ঞাতিভাইরা ছিল খুবই ধনী। তারা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে-আম খেত। ব্রজেন্দ্রকুমার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতেন। ওরা বলত, 'খাবি?' ব্রজেন্দ্রকুমার হাত বাড়ালেই ওরা খোসাটা ছুঁড়ে দিত।"
>
> আরও মনে পড়ত সেই মহাজনের কথা, যার কাছ থেকে চাল-ডাল আনা হত। দাম বাকি থাকত। বাবার টাকা এলে শোধ করা হত। এক একবার বাবার টাকা আসতে দেরী হত। মহাজন চালও দিত, ডালও দিত, সঙ্গে দিত কতকগুলো কড়া কথা, যা শোনার পর ব্রজেন্দ্রের গলা দিয়ে ভাত আর নামতে চাইত না।
>
> এইসব দৃশ্যগুলো মিলেমিশে ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে গেল একদিন। মহাভারতের মুষল পর্ব এসে আশ্রয় দিল ঐ গুঁড়ো দৃশ্যপুঞ্জকে। তারপর একদিন গণেশ অপেরা পার্টি 'লীলাবসান' পালা রিহার্সাল দিতে শুরু করল।" ২

বর্ণভেদ এবং বঞ্চনার আরও একটি ঘটনা বিবৃত করেছেন পালাকারের ছাত্র এবং স্বনামধন্য নাট্যকার শ্রী সত্যেন ভদ্র। এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন —

> " এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে ওঁনার নিমন্ত্রণ ছিল। ... পরিবেশন শুরু হবার দিককার প্রথম আসনে বসেছিলেন উনি। তথাপি ব্রজেন্দ্রকুমারের পাতে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হয় নি। তাঁকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির থেকে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। " ৩

এর কারণ হল, ঐ সারিতে আর সকলে ছিলেন উচ্চবর্ণের লোক। এই ঘটনায় ব্রজেন্দ্রকুমার অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলেন। এই প্রকার মানসিক যন্ত্রণা ও আঘাতই সৃষ্টি করেছিল 'লীলাবসান' জাতীয় বর্ণভেদের বিরুদ্ধে রচিত যাত্রাপালা।

'লীলাবসান' পালার মূল কাহিনী গৃহীত হয়েছে কাশীরাম দাসের 'মহাভারতের মূলপর্ব থেকে'। মহাভারতে আছে, জরা নামে এক ব্যাধ ভুলক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করেছে। — পুরাণের এই কাহিনী ব্রজেন্দ্রকুমার হুবহু গ্রহণ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর তিনি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পালার শেষে দেখা যায়, শূদ্রানী - গর্ভজাত সন্তান, কৃষ্ণের ভ্রাতা জরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সজ্ঞানে কৃষ্ণকে হত্যা করেছে। ব্রজেন্দ্রের জরা কাশীরাম দাসের মহাভারতের ব্যাধের মত কৃষ্ণকে আঘাত করে হাহাকার করে নি।

নাটকের প্রস্তাবনায় দেখা যায়, শতপুত্র শোকাতুরা গান্ধারী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং কুরু বংশ ধ্বংসের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করেছেন —

" তুমি যদি নিরপেক্ষ হতে
বাধিত না কুরুক্ষেত্র রণ,
মজিত না সবংশে কৌরব। " (প্রস্তাবনা পৃঃ ৯)

সকল নাটের গুরু শ্রীকৃষ্ণকে দায়ী করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, ক্রোধোন্মত্তা গান্ধারী দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ ও তাঁর যদুবংশকে তীব্র অভিশাপ দিয়েছেন —

" পাপে তাপে পূর্ণ হবে দ্বারকানগর —
নয়ন গোচরে তব শত শত পুত্র পরিবার
ছাগশিশু সম মরিবে অকালে
তারপর সোদরের সহ
তুমি — তুমি অকালে কালের গ্রাসে
লভিবে বিশ্রাম! হস্তিনায় বাজায়েছ
মরণের ভেরী, আজই হতে দ্বারকার
ঘরে ঘরে বাজুক বিষাণ। " (প্রস্তাবনা পৃঃ ৯)

প্রস্তাবনার পরেই শুরু হয় মূল নাটক, শুরু হয়ে যায় দ্বারকার বিপর্যয়। গান্ধারীর অভিশম্পাতের ফলে দ্বারকানগরে পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, ভ্রাতা বন্ধুর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দ্বারকাবাসী সুরা ও নারীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

এইরূপ ধ্বংসোন্মুখ দ্বারকাপুরীতে কালস্বরূপ উপস্থিত হয় জরা — কৃষ্ণ বলরামের পিতা বসুদেবের স্ত্রী শূদ্রানীর গর্ভজাত পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানের পর তথাকথিত ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেইসময় জরা এসে সরাসরি কৃষ্ণকে বলে — " শুনেছি, তুমি ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছ, তাই দেখতে এসেছিলাম তোমার ধর্মরাজ্যে দরিদ্রের আহার মেলে কি না। " (১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য) সাত্যকি জরাকে লুণ্ঠনকারী বলে অভিযোগ করে - -" কোন্ সাহসে দ্বারকাবাসীর ধনৈশ্বর্য লুঠ করেছো? " এই কথায় কর্ণপাত না করে জরা কৃষ্ণের কাছে খাদ্যের দাবি জানায় — " ঘরে আমার ভাই বন্ধুরা আজ সাত দিন খেতে পায় নি, তাদের জন্য তোমার কাছে মিনতি জানাতে এসেছি, অন্ন দাও কৃষ্ণ — অন্ন দাও ! " (১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

অতঃপর জরার পিতৃ পরিচয় প্রকাশিত হয়। পিতা বসুদেবের কাছে সে দাবি জানায়- " তোমার ধর্মরাজ্যে আমাদের মানুষের মত বাঁচতে দাও।এই পদদলিত সঙ্কুচিত জীবনের বোঝা আর আমরা বইব না। " সে সন্তানের অধিকার চেয়ে বলে — " রামকৃষ্ণের মত আমিও যখন তোমার পুত্র, তখন তাদের পাশে আমি বসতে চাই, এই আমার শেষ দাবি। " জরার সমানাধিকারের প্রশ্নে বসুদেব বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মের অজুহাতে তিনি জরাকে বঞ্চিত করলেন। অধিকার না পেয়ে জরা শূদ্রদের নিয়ে ধনী আর্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো — " তোমার বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করছি। "(১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

এদিকে ব্রাহ্মণ ঘরে প্রতিপালিত এবং বিতাড়িত চন্দন নামে এক শূদ্র যুবক উপবীত পরিত্যাগ করে তার শূদ্র ভাই-বোন, জ্ঞাতি বন্ধুদের কাছে ফিরে আসে। সে পূর্বের শিক্ষানুযায়ী বিদ্রোহী শূদ্র ভাইদের গীতার বাণী শুনিয়ে 'মুক্তির পথ' দেখাতে চায় - " ওরে কাঙাল। ওরে বঞ্চিত। আয় আয় তোরা আমার চারদিকে ঘিরে বোস, আমি তোদের বেদ শোনাবো — তোদের আঁধার ঘরে গীতার সহস্র মানিক জ্বেলে দেবো। " (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) চন্দনের মুখে গীতার "কর্মে তোমার অধিকার — ফল চাইবার অধিকার নেই" বাণী শুনে জরা তাকে ভুল বোঝে এবং তার সন্দেহ হয় চন্দন আর্যদের গুপ্তচর। তাই সে চন্দনকে সরসরি অভিযোগ করে — " তুমি একটা আর্য সন্তান, তোমার জাতি তোমায় পাঠিয়েছে অনার্যের মধ্যে এই বিষ ছড়াতে, না? "

(২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

কিছুক্ষণ পরে জরা জানতে পারে চন্দন ব্রাহ্মণ ঘরে প্রতিপালিত কিন্তু শূদ্র। বর্তমানে সে ব্রাহ্মণ ঘর থেকে বিতাড়িত। সে এসেছে তাঁর শূদ্র ভাইদের পাশে দাঁড়াতে। চন্দনের শৌর্য-বীর্য-শক্তির পরিচয় পেয়ে জরা সানন্দে আর্যশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্বভার তার কাঁধে তুলে দিয়ে তাকে সেনাপত্যে বরণ করে নেয়। শূদ্রের উত্থান ও আর্যদের দর্পচূর্ণ করার সংগ্রামে চন্দনের মত শক্তিধর বীরকে পাশে পেয়ে এবং জরার উৎসাহ ও চন্দনের নেতৃত্বের ভরসায় নিরন্ন অবহেলিত শূদ্রেরা খুশিরগানে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে ঃ—

" বাজারে মাদল বাজা
থাকবে না আর দুঃখ মোদের
এসেছে ঐ রাখাল রাজা।।
.... খাটবে না জারিজুরি, আনবো লুঠে ইন্দ্রপুরী
পেটটি পুরে খেয়ে বাড়বে মজ্জা মেদ। " (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

চন্দনের মুখে বেদ, উপনিষদ,চণ্ডী একে একে সবই শুনে বিস্মিত জরা লক্ষ্য করে—

জরা ।। সবাই বলছে শ্রেষ্ঠ আর্য, নিকৃষ্ট এই অনার্যজাত। ব্রাহ্মণ চলেছে আগে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য তার দুই পার্শ্বে, আর শূদ্র রয়েছে তার পিছনে। কেউ বলছে না যে, শূদ্র ও মানুষ — তার জীবন - তার মরণ পরের জন্য, নিজের বলতে আর কিছুই নেই ওর। এতকাল ধরে চলে আসছে এ অত্যাচার, কেউ একটা প্রতিবাদ ও করছে না। এরই নাম ধর্মরাজ্য ?

অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে সে বলে – "এই শূদ্রকে আমি উন্নতির চরম শিখরে তুলবো। (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) জরা বুঝেছে শাস্ত্র সৃষ্টি হয়ছে বিভেদ কায়েম রাখার জন্য, ব্রাহ্মণের ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য। সে বসুদেবকে পূর্বের সেই একই কথা জানিয়ে দেয় —

জরা।। আমায় দিতে হবে না, নিজের জন্য আমি এক কণা ভূমিও চাই না, আমার এই অনার্য ভাইদের রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে সমান আসন চাই।" (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

শান্তি প্রচেষ্টায় বসুদেবের শত অনুনয়েও জরা নিজের দাবি থেকে সরে এসে কোনভাবেই আপোষ করে না। যুদ্ধের লেলিহান শিখা বেড়েই যায়। বলরাম জরাকে প্রশ্ন করে — " ভাই বলেই চিনেছিস যদি, তবে তার রক্তপাত করতে এলি কেন? " উত্তরে জরার কঠিন হৃদয় থেকে এক অদ্ভুত স্নেহধারা নিঃসারিত হয় —

জরা।। কেন এলুম? জানতে যদি রাম, কি দাহ এ অনার্যের মনে, তাহলে হাত থেকে তোমার অস্ত্র খসে পড়ত। কৃষ্ণ সকলের, কিন্তু আমার ভাই হয়েও কেউ নয় — কারণ আমি শূদ্র। শোন রাম—শোন। আমার ভাইয়ের স্নেহ আমার ভোগে যদি না আসে, জগতকে তা ভোগ করতে দেবো না। আমি থাকবো উপবাসী, আর আমার চোখের উপর তোমরা অমৃত পান করবে, জরা তা সইবে না।" (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

নাটকে তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, জ্ঞাতিতে বন্ধুতে যুদ্ধ দেখে, যুদ্ধের পৈশাচিকতা প্রত্যক্ষ করে চন্দন বিচলিত হয়ে এই অন্যায় যুদ্ধ থেকে জরাকে নিবৃত হতে অনুরোধ করে। চন্দনের মুখে ন্যায় যুদ্ধের বাণী শুনে ব্যঙ্গের কশাঘাত করে জরা বলে — " যুদ্ধ আবার ন্যায় হয়েছে কবে? অন্যায়ের উপর এর প্রতিষ্ঠা, অন্যায়েই এর পুষ্টি।" জরা তার বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে বুঝতে পারে বঞ্চনাতেই সৃষ্টি হয়েছে ক্ষোভ। আর সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে জন্ম নিয়েছে সংগ্রাম। তার লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ বিজয় এবং ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সে কারণেই পিতৃদ্রোহী কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে সে নির্দ্বিধায় সাদরে তার দলে বরণ করে নেয়। জীবন সংগ্রামে অভিজ্ঞ জরা দেখেছে যারা শাস্ত্রকার তারাই তো করেছে শাস্ত্র বিরোধিতা। অতএব শাস্ত্র তার কাছে একটা ভণ্ডামি, ভেকমাত্র। এক সময় চন্দন জানতে পারে জরা তার পিতা। চন্দন জরাকে জিজ্ঞাসা করে যে তার মা ব্রাহ্মণ কন্যা আর জরা শূদ্র। তাহলে সে কি? উত্তরে জরা বলে —

জরা ।। তুমি অভিনব, শূদ্র-ব্রাহ্মণের মধ্যে যোগসূত্রের মত দেবতার আশীর্বাদ বহন করে তুমি এসেছ, জাতি ধর্মের সঙ্কীর্ণতা তোমার জন্য নয় যুবক। তুমি বিধাতার একটা মানস সৃষ্টি ।(৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

নাটকের শেষে দেখা যায়, প্রবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসংগঠিত শূদ্র সমাজ পরাজিত হয়েছে। পলাতক জরা নিঃশেষিত অনার্য সেনার মৃত্যু এবং তার জাতির প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ নিতে বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষক কৃষ্ণকে হত্যার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে। নির্বান্ধব কৃষ্ণকে পেয়ে সজ্ঞানে শরাঘাতের পূর্বে জরা তাকে বলে —

জরা ।।
বসুমতী সবার জননী,
সেই জননীর অন্তরমথিত সুধা
আর্য তুমি কণ্ঠায় কণ্ঠায় নিতি করিয়াছ পান,
অভাগা অনার্য মোরা রহিলাম চির-উপবাসী।
চূর্ণ হোক ধর্ম-সিংহাসন,
তার সনে চূর্ণ হও
তুমি—তুমি কৃষ্ণ নারায়ণ। (শরত্যাগ)

(৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

" সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ " (ভূমিকা) যে কৃষ্ণের মুখের বাণী সেই কৃষ্ণের বাইরের আবরণে জরার নিক্ষেপিত অস্ত্রভেদ করল।

শতবর্ষ পরিপূর্ণ আজ,
আমি যাই বৃন্দাবনে শ্রীরাধার পাশে
রাধা । রাধা । রাধা ।

(৫ম অঙ্ক, শেষ দৃশ্য)

রাধানাম স্মরণ করতে করতে কৃষ্ণ তাঁর ইহলৌকিক দেহ পরিত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসান হোল। জরার প্রতিবাদী চরিত্র পূর্ণতা পেল।

এই পালায় একটি মধুর প্রেমকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। প্রেমকাহিনীর নায়ক চন্দন ও নায়িকা যুবতী গায়ত্রী। তারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু চন্দনের অপরাধ সে শূদ্র বংশজাত। সেকারণে ব্রাহ্মণকন্যা গায়ত্রীর সাথে মিলন সম্ভব হয় না। প্রেম পরিণতি লাভ করে না। বর্ণভেদের শোচনীয় সামাজিক পরিণাম চন্দন-গায়ত্রী এপিসোডে (Episode) চিত্রিত হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রকুমার লীলাবসানের কাহিনী কাশীরাম দাসের মহাভারতের 'মুষলপর্ব' থেকে আহরণ করলেও এই নাটকের জরা চরিত্র পরিকল্পনায় অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এই পৌরাণিক পালায় তিনি নতুন 'ট্রিটমেন্ট' করেছেন। সে যুগের ট্রাডিশনাল যাত্রার নিয়মানুযায়ী এ পালায় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে " যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি " - র অংশ বিশেষ উচ্চারিত হয়েছে সত্য, তবুও শূদ্র জরা চরিত্র পরিকল্পনায় নতুনত্বের আভাস পাওয়া যায়। গীতা, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যে সচেতন সমালোচনা এপালায় করা হয়েছে যাত্রাপালার আঙিনায় তা সম্পূর্ণ নতুন। বৈষ্ণব মন্দিরে এ পালাভিনয় নিষিদ্ধ ছিল। নাটকের ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রকুমার সে কথা উল্লেখ করেছেন — " জানি, কোন কোন বৈষ্ণব মন্দিরের মন্দির প্রাঙ্গণে লীলাবসানের অভিনয়

'অবসান' বলিয়াই নিষিদ্ধ ছিল।" রাম বা কৃষ্ণের মতো চরিত্রের আকস্মিক নতুন ব্যাখ্যা দর্শক সমাজ কতটা গ্রহণ করবে সে বিষয়ে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন। কিন্তু এ পালার অসাধারণ জনপ্রিয়তা সকল সন্দেহের অবসান ঘটায়। এ পালার সমাদর এখনও দর্শকদের কাছে সমান। কয়েক বছর পূর্বে ১৯৭৮ সালে নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা এই পালাভিনয় করে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ব্রজেন্দ্রকুমারের এই পালা রাজরোষে পড়েছিল। সরকার এই পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র জরার সমানাধিকারের দাবি, অভিজাত যাদবশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ পায়। এর কৈফিয়ৎ দিতে ব্রজেন্দ্রকুমারকে লালবাজারে ডেকে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে ব্রজেন্দ্র পুত্র শ্রী তরুণকুমার দে –র রচনা থেকে জানতে পারি —

> " বাড়ি ফিরতেই ডাক পড়ল লালবাজারে। ছুটে যেতেই অফিসার বললেন, গীতার এসব কি কেচ্ছা করেছেন। শুধু গীতার কেন বেদ, উপনিষদ কিছুই তো বাদ দেন নি। জরার দলবল নিয়ে কৃষ্ণের রাজ্য কেড়ে নেবার চেষ্টা করিয়েছেন। এ সব রাজদ্রোহ। এগুলো বাদ দিতে হবে। ব্রজেন্দ্রকুমার বললেন পরের সংস্করণে দেখব। এ সংস্করণ সম্পর্কে কিছু করার নেই। অফিসার বললেন, তাহলে এ বই বাজেয়াপ্ত করব। ব্রজেন্দ্রকুমার বললেন, সে তো আমার সৌভাগ্য। তবে অভিনেতাদের মুখ থেকে তো আর সংলাপ কাটতে পারবেন না। " ৪

বলাবাহুল্য, ব্রজেন্দ্রকুমার সেদিন ইংরাজ সরকারের পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আপোষ করেন নি। কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি।

ব্রজেন্দ্রকুমারের লীলাবসান পালাখানি শ্রেণীবিচারে পৌরাণিক হলেও আধুনিকতার অগ্রদূত। এ পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র জরা নিপীড়িত বঞ্চিত শোষিত শূদ্রশ্রেণীর নেতা। শ্রীকৃষ্ণ শোষকের প্রতিনিধি। এই পালায় ধনী দরিদ্রের দ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রাম প্রদর্শিত হয়েছে। অসাধারণ অভিনয় সার্থক বিয়োগান্তক এই পালানাটকে আদি, রৌদ্র, বীভৎস ও করুণ রসের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।

চাঁদের মেয়ে (১৯৩৬) **:** পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত পালাখানি ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। ডবল ক্রাউন ৭ ইঞ্চি – ৫ ইঞ্চি মাপের পুস্তক খানিতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৩ বইটির বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হয়েছে মাত্র ৩৫ টাকা।

এ পালায় প্রধান চরিত্রের সংখ্যা ১২। এর মধ্যে স্ত্রী চরিত্র ৪ জন, পুরুষ চরিত্র ৮। এতদ্ব্যতীত কেশরী, বান্দা, দিলপিয়ার, সনাতন, চাষা, রক্ষী ও মাঝি প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্র অংশ গ্রহণ করেছে। পালার অপ্রধান স্ত্রী চরিত্র – গুলবাহার ও দাসী।

পঞ্চাঙ্ক এই পালানাটকের বিভিন্ন অঙ্কে একাধিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমাঙ্কে পরিবেশিত হয়েছে পাঁচটি দৃশ্য। দ্বিতীয়াঙ্কে প্রদর্শিত হয়েছে ছয়টি দৃশ্য। চতুর্থাঙ্কে নাট্যকার পাঁচটি দৃশ্য দেখিয়েছেন। শেষাঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে তিনটি দৃশ্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে।

ব্রজেন্দ্রকুমারের 'চাঁদের মেয়ে' নাটকে চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির দেখা মেলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই এবং সংশ্লিষ্ট ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। কিন্তু গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই পালানাটকটি পাঠ করলে দেখা যাবে, এ পালার কাহিনী আদৌ ইতিহাসের পথ ধরে অগ্রসর হয় নি — পালার কাহিনী পল্লীগাথাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে। এ পালায় ব্রজেন্দ্রকুমার চাঁদ-কেদারের কাহিনী বর্ণনা করেন নি — তিনি সোনার জীবন নাট্য রচনা করেছেন। তাই মানসিংহ ও কার্ভালোকে খুঁজতে ইতিহাসের দ্বারস্থ হলে হবে না। ব্রজেন্দ্রকুমার এ পালার ভূমিকায় বলেছেন —

> " কোন কোন ঐতিহাসিক সোনাকে চাঁদের ভগিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ চাঁদ রায়কে কেদার রায়ের পিতা বলিতেও ছাড়েন নাই। সেদিনকার কথা, আজও কেশোর মার দীঘিতে, কাচকীর দরজায়, কেদার বাড়ির ধূলিকণায় কেদার রায়ের কীর্তি বিজড়িত, তবু ঐতিহাসিকেরা এদের পরিচয় অনুসন্ধান করেন ম্যাকমিলানের পুস্তকালয়ে। " ৫

স্বভাবতই আমরা 'চাঁদের মেয়ে' দেখতে, তার পরিচয় জানতে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিপাত না করে প্রবেশ করব পল্লীগাথার অভ্যন্তরে।

" দেওয়ান ঈশা খাঁ " পূর্ববঙ্গের একটি জনপ্রিয় গীতিকা। এই পল্লীগীতিকা থেকেই 'চাঁদের মেয়ে'কে সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরাপর গীতিকাগুলির ন্যায় এই গীতিকাটিরও নানাবিধ পাঠভেদ বা পরিবেশনভেদ পরিলক্ষিত হয়। পালাকার সেগুলির সমন্বয়ে চাঁদের মেয়ে-র রূপদান করেছেন।

পল্লীগীতিকায় দেখা যায়, চাঁদ রায়-কেদার রায়ের ভগিনী সোনামণি বা সুভদ্রাকে দেখে ঈশা খাঁ মুগ্ধ হয়েছেন। ক্রমে পরস্পরের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা গভীর হলে ঈশা খাঁ সোনার সম্মতিক্রমেই নদীর ঘাট থেকে সোনাকে তুলে নিয়ে যান। ব্রজেন্দ্রকুমারের চাঁদের মেয়ে কিন্তু ভিন্ন কথা বলে।

এ পালায় স্বর্ণময়ী অর্থাৎ সোনা চাঁদ-কেদারের ভগিনী নয়, — সে চাঁদ রায়ের কন্যা, চাঁদের মেয়ে। সোনা ঈশা খাঁ-র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে পলায়ন করে নি। সোনা বালবিধবা। কিন্তু তার বৈধব্যের কথা তার কাছে গোপন রাখা হয়েছে। সে নিজেকে কুমারী বলেই জানত। কেদার রায় স্বর্ণময়ীর বিবাহ দিতে তৎপর হলে সমাজের মাথা স্বর্ণময়ীর পিতা চাঁদ রায় -ই বিধবা কন্যার বিবাহে ঘোর আপত্তি জানায়। কেদার রায়ের এই উদ্যোগের কথা জানতে পেরে কুলপুরোহিত তথা গুরু সুমন্ত স্বর্ণময়ীকে তার বৈধব্যের কথা অবগত করান। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বালবিধবা সোনা তার পূর্বতন স্বামীকে শ্রদ্ধা এবং বৈধব্যকে সম্মান জানাতে পুনর্বিবাহে নারাজ হয়। ক্রুদ্ধ কেদার রায় কুলগুরু সুমন্তকে পদচ্যুতি করেন। এদিকে রূপমুগ্ধ ঈশা খাঁ সোনাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান চাঁদ রায়ের কাছে। বিধর্মী মুসলমান ঈশা খাঁ-র দুঃসাহস দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে চাঁদ-কেদার ঈশা খাঁ-র দুর্গগুলো অধিকার করতে থাকে। অপরদিকে বিতাড়িত কুলপুরোহিত প্রতিশোধ স্পৃহায় ঈশা খাঁ-র সঙ্গে হাত মেলায় এবং মিথ্যা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে স্বর্ণময়ীকে ঈশা

খাঁ-র কাছে পৌঁছে দেয়। স্বর্ণময়ী বালবিধবা এবং তাঁকে বিবাহে অসম্মত — একথা অবগত হয়ে ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীকে সসম্মানে তার পিত্রালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে চাঁদ রায় তাকে পরিত্যাগ করেন। স্বর্ণময়ীকে কেন্দ্র করে চাঁদ-কেদার ও ঈশা খাঁ-র মধ্যে সংঘর্ষ দানা বাঁধে এবং ক্রমে তা সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। পরিশেষে ঈশা খাঁ-র ভগিনী আলেয়ার মধ্যস্থতায় হিন্দু-মুসলমান — দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয়। —এই হোল এ পালার সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

পূর্বে দেবস্থানে, দেব পূজা-প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা হোত। 'চাঁদের মেয়ে' যাত্রাপালায় ঈশা খাঁ, এনায়েৎ, বান্দা, দিলপিয়ার, গুলবাহার, আলেয়া প্রভৃতি একাধিক মুসলমান চরিত্র বর্তমান। পালাটিতে মুসলমান চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করে যাত্রামালিকেরা তাদের ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা করেছিলেন। উপরন্তু পালাটি সংক্ষিপ্ত সংলাপে রচিত। দীর্ঘ সংলাপ শ্রবণে অভ্যস্থ দর্শকেরা সংক্ষিপ্ত সংলাপ-নির্ভর পালা গ্রহণ করবে কি না, এ বিষয়ে ধন্ধে পড়েছিলেন দলমালিকেরা। সে কারণে গণেশ অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, জয়ন্তী অপেরা, আর্য অপেরা প্রভৃতি যাত্রাদল এই পালাভিনয় করতে অসম্মত হয়। অতঃপর 'চাঁদের মেয়ে' -কে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত করতে এগিয়ে আসেন নট্ট কোম্পানীর ম্যানেজার মাটির সূর্য—সূর্যকুমার দত্ত মহাশয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তিন দিন পালা আসরস্থ হতে পারেনি। তথাপি সূর্যবাবু হতোদ্যম হননি। চতুর্থ রাত্রিতে চাঁদের মেয়েকে যাত্রানুরাগী দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করলেন সূর্যবাবু। শুরু হল সংক্ষিপ্ত সংলাপময় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নতুন দৃষ্টিভঙ্গির নাটক 'চাঁদের মেয়ের' পালাভিনয়।

এ নাটকের চরিত্র চিত্রণে ব্রজেন্দ্রকুমার সার্থকতা লাভ করেছেন। ঈশা খাঁ এই পালার এক অসাধারণ গতিশীল চরিত্র (Dynamic Character)। পালকার এই চরিত্রাঙ্কনে মনোবিকলন তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। ঈশা খাঁ-র মনের দোদুল্যমান অবস্থাকে পালাসম্রাট অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মূর্ত করে তুলেছেন। চাঁদ রায়ের অপরূপা সুন্দরী কন্যা স্বর্ণময়ীকে দর্শন করে রূপমুগ্ধ ঈশা খাঁ-র ন্যায় অন্যায়বোধ হারিয়ে তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা, পরমুহূর্তেই তাঁর বিবেক জাগ্রত হয়ে ভদ্র, শালীনতা ও সৌজন্যবোধে উত্তরণের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করে দর্শকেরা অভীভূত ও ধন্য হয়ে যান।

ঈশা খাঁ ।। কে বললে? না-না, মিথ্যা কথা। এ হতে পারে না। খোদা-খোদা। বুকে পাষাণ চাপিয়ে দাও, হৃদয় টাকে পুড়িয়ে মরুভূমি করে ফেল। এনায়েৎ কোনো যুদ্ধের খবর আছে? আমি একবার ছুটতে চাই – রণভেরীর তালে তালে একবার নৃত্য করতে চাই।

(১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

সেনাপতি এনায়েৎ খাঁ প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে কুপথে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি সেপথে পা বাড়ান, আবার আলেয়া যুক্তির জাল বিস্তার করে তাঁকে সুপথে ফেরাতে চাইলে তিনি ফিরেও আসেন। কিন্তু কুমতি সুমতির দ্বন্দ্বে কুমতি শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ঈশা খাঁ এনায়েতের হাত দিয়ে চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে বিবাহের প্রস্তাব সম্বলিত পত্র পাঠান। আলেয়া তাঁকে বিবাহের ব্যাপারে হিন্দু সংস্কারের কথা জানালে তিনি পত্র প্রেরণের জন্য অনুশোচনাবোধ করেন এবং বিবাহের সংকল্প পরিত্যাগ করেন কিন্তু ততক্ষণে তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণ বিদ্ধ করে চাঁদ রায়-কেদার

রায়ের বক্ষস্থল। ঈশা খাঁকে সমুচিত শিক্ষা দিতে কাঞ্চন ধ্বংস করে তাঁর কলাগাছিয়া দুর্গ, কার্ভালো ধূলিসাৎ করে দেয় তাঁর ত্রিবেনীর দুর্গ। শুধুমাত্র বিবাহ - প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া যে এতখানি ভয়াবহ হতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। বন্ধু রাজার এই বিধ্বংসী আচরণে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে শ্রীমন্তের হীন প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। কিন্তু শ্রীমন্ত যখন ভুলিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্বর্ণময়ীকে তাঁর প্রাসাদে পৌছে দেয় তখন তাঁর বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়। তিনি বলেন — " নারীর দরবিগলিত অশ্রুধারার মধ্যে তাকে জোর করে আমি বিবাহ করতে পারবো না। " (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) আপন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে শ্রীমন্ত তাঁকে " বিবাহ ছাড়াও অন্য উপায় আছে " বলে কুপ্রস্তাব দিলে তিনি বলেছেন –

ঈশা খাঁ ।। গুরুজী। আমি দোজোখের পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, তবু বিনা অপরাধে একটা নারীর সর্বনাশ করতে আমার হাত উঠবে না। বলুক লোকে আমায় লম্পট, তবু চাঁদ রায়ের নামে এতবড় কলঙ্ক দিতে পারবো না। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

" নির্ভয় রাজকুমারী। আমি তোমায় রক্ষা করলুম " বলে তিনি স্বর্ণময়ীকে মুক্তি দিলেন। তারপর কাঞ্চনের হাত থেকে আলেয়াকে উদ্ধার করতে শ্রীপুরাধিপতি চাঁদ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

ঈশা খাঁ ধর্মে মুসলমান. স্বভাবে অত্যাচারী কিন্তু তিনি পরধর্ম - বিদ্বেষী নন, — পরধর্মে পরমশ্রদ্ধাশীল। শ্রীমন্তের হাতে দেববিগ্রহের লাঞ্ছনা দেখে তিনি গর্জে উঠেছেন। শ্রীমন্তকে হিন্দু সমাজের কলঙ্ক বলে ভর্ৎসনা করে তাকে র্নিদেশ দিয়েছেন —

ঈশা খাঁ ।। যাও — যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমার কাছে ওর কোন মূল্য নেই বটে, কিন্তু চাঁদ রায়ের কাছে এই কাঠের পুতুল অমূল্য রত্ন। সে আমার অনেক ক্ষতি করলেও আমার ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করে নি। আমিও তার ধর্মকে সসম্রমে সেলাম করি।

(৪য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

ঈশা খাঁর জবানীতে নাট্যকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রীতির বাণী-প্রচার করছেন।

শ্রীপুরাধিপতি চাঁদ রায় হিন্দু ধর্মের রক্ষক, তিনি সমাজপতি। ভ্রাতা কেদার তাঁর বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ীকে পুনর্বিবাহ দিতে চাইলে তিনি হিন্দু শাস্ত্রের বিধান দেখিয়ে ভাইকে ওই অধর্ম থেকে বিরত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মীয় বাতাবরণ তাঁর থাকলেও ঘন্টা নাড়া ব্রাহ্মণ তিনি নন, ঈশা খাঁর স্বর্ণময়ীকে বিবাহের প্রস্তাবে তার তরবারি ঝলসিয়ে উঠেছে — "বল গিয়ে তোমার প্রভুকে, তার প্রস্তাবের উত্তর চাঁদ রায় রণক্ষেত্রে দেবে। " (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) চাঁদ রায় সন্তানের পিতা। অপহৃতা সন্তানের জন্য তিনি ব্যাকুল। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে তাঁর কন্যা নিষ্কলঙ্কিনী। তথাপি তিনি কন্যাকে বুকে টেনে নিতে পারেন নি। তাঁর পিতৃসত্তা ধর্মীয় অহঙ্কারের কাছে হার মেনেছে।

চাঁদ ।। নিয়ে যা কাঞ্চন, নিয়ে যা, অপহৃতা কন্যাকে চাঁদ রায় গ্রহণ করে না। ... আমি সাবাইকে ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু হিন্দুধর্মের অমর্যাদা করতে পারি না।

(৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

পালাকার এখানে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার এবং তার কুফল চাঁদ রায়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। হিন্দুধর্মের এই অনুশাসন কেবলমাত্র হিন্দুনারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পুরুষেরা বিধি নিষেধের উর্দ্ধে। যাই হোক, এই ঘটনার পরে চাঁদ রায় আর প্রকৃতিস্থ থাকে নি, তাঁর মনোবিকার ঘটেছে। " চুপ-চুপ। সোনা ঘুমুচ্ছে, জেগে উঠবে " -- এই ধরণের প্রলাপ তিনি পাগলের ন্যায় বকতে থাকেন। নাটকের অন্তিম লগ্নে দেখা যায়, অপ্রকৃতিস্থ চাঁদ রায় চম্পকের মৃতদেহ কোলে নিয়ে দীঘির শীতল জলে সমাধিস্থ হয়েছেন।

চাঁদ রায়ের ধর্মপত্নী ভবানী সন্তান বৎসলা ও পতিব্রতা নারী কিন্তু তিনি ব্যক্তিত্বহীনা। আপন গর্ভজাত সন্তান স্বর্ণময়ী ঈশা খাঁ-র প্রাসাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেন কিন্তু কেদার রায় কন্যাকে ফিরিয়ে আনতে অগ্রসর হলে ভবানী তাঁকে বাধা দেন। স্বামীর অন্যায় আদেশ সন্তান বাৎসল্যের চেয়ে বড় মনে হয় তাঁর কাছে। নারীর এরূপ দাস মনোভাবই নারীকে পুরুষের ছায়া করে রেখেছে মনে হয়।

স্বর্ণময়ীর মধ্যে এই দাসমনোবৃত্তি আরও প্রকট। যে স্বামীকে সে চোখে দেখে নি, যার সঙ্গে সংসার করে নি, যার কোনো স্মৃতি তার মনে জাগ্রত নেই, অপরের কথায় সেই মৃত স্বামীর আত্মার মঙ্গল কামনায় বালবিধবার কঠোর অনুশাসন সে হাসিমুখে মেনে নেয়। তবে তার দুঃখ হয় সেই দিন, যে দিন ঈশা খাঁ-র প্রাসাদ থেকে সম্মানে নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় ফিরে এলে সে শুচি জেনেও তার পিতাই তাকে পরিত্যাগ করে। ব্যথিত স্বর্ণময়ী এরূপ অবিচারের জন্য অভিযোগ জানায় নি সত্য, কিন্তু হৃদয় ব্যথা নীরবে সহ্য করে নি।

স্বর্ণময়ী ।। বাবা । আমি মেয়ে বলেই আমার উপর এ অবিচার করলে, যদি আমি ছেলে হতুম তাহলে আজ আমায় যাদরে বুকে তুলে নিতে। (৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

পুরুষশাসিত সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে স্বর্ণময়ীর এই উক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

সুমন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুলগুরু। 'বিধবার বিয়ে দিলে পূর্বপুরুষেরা নরকে যাবেন' -- এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি স্বর্ণময়ীকে তার বৈধব্যের কথা জানিয়ে দেন। তাঁর এই দুষ্কর্মের জন্য তাঁকে রাজগুরু পদ থেকে অপসারিত করা হয়। প্রতিহিংসাপরায়ণ সুমন্ত এরপর মনুষ্যত্বের একেবারে নীচে অবতরণ করেন। স্বর্ণময়ীকে মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়ে তিনিই ঈশা খাঁ-র প্রাসাদে পৌঁছে দেন। ঈশা খাঁ একজন বিধবাকে তার অসম্মতিতে বিবাহ করতে অস্বীকার করলে তিনি ঈশা খাঁ-কে 'বিবাহ ছাড়াও অন্য উপায় আছে' এই হীন জঘন্য পরামর্শ দেন। শ্রীমন্ত শুধু নীচ প্রকৃতির কুলগুরু নন, তিনি একজন ঘাতক। চাঁদ রায়ের শিশুপুত্র চম্পককে তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। সামাজিক কুসংস্কার এবং রক্ষণশীলতার আবেষ্টনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সুমন্ত চরিত্র। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিংস্রতা, পশুত্ব। জীবনের শেষ প্রান্তে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত শ্রীমন্ত তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। 'ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়' লোকনাট্যের এই অন্যতম বৈশিষ্ট্য পালাকার শ্রীমন্তের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

এ পালায় অপর এক খল চরিত্র এনায়েৎ। সে ধর্মান্তরিত মুসলমান। পূর্বে হিন্দু রাজপুত ছিল। ধর্মান্তরের পূর্বে হিন্দু সমাজের অত্যাচার সে আজও ভোলে নি। প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য সে ঈশা খাঁ-র আশ্রয় নেয়। সাম্প্রদায়িকতায় ধর্মান্তরিত মুসলমানের কাছে মৌলবাদী ধর্মান্ধ মুসলমানও পরাজিত হবে। এনায়েৎরূপী জয়সিংহ হিন্দু বিদ্বেষী, কুটিল এবং হিংস্র। ঈশা খাঁ এবং চাঁদ - কেদারের মধ্যে যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল তার হোতা মূলতঃ এনায়েৎ। তারই প্ররোচনায় ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীকে বিবাহের জন্য চাঁদ রায়ের নিকট প্রস্তাব পাঠান। সে-ই বন্ধুতে বন্ধুতে আগুন লাগিয়েছিল। যাকে লাভের জন্য সে এইরূপ হিংসার আশ্রয় নিয়েছিল, সেই আলেয়ারূপী সত্যবতীর সাক্ষাৎ সে পেলেও হিংসার জন্যই পুনরায় তাকে হারাতে হয়।

কুলগুরু পদ থেকে শ্রীমন্তকে অপসারণের পর চাঁদ রায়ের কুলগুরু নিযুক্ত হন শ্রীমন্তেরই জ্ঞাতিভ্রাতা দেবল। তার আচরণ এবং বিচরণ দুই-ই শ্রীমন্তের বিপ্রতীপ। তিনি নির্লোভ, তবে অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির। ভীতির কারণেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাদা শ্রীমন্তের দেওয়া ঘুষ গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন। স্বর্ণময়ীকে অপহরণের চক্রান্ত ফাঁস করে দেবেন ভেবেও তিনি তা পারেন নি। কিন্তু নিজেকে বলি দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। চম্পকের মৃত্যুর দায়ভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে তিনি ভ্রাতা শ্রীমন্তের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এবং আত্মবলি - দান করে ভ্রাতার অনন্ত পাপ স্খালন করেছেন।

দেবল চরিত্রের মাধ্যমে পালাকার নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। দেবলঠাকুরকে কুলগুরুর পদে অধিষ্ঠিত করার জন্য চাঁদ রায় কেশরীকে দেবলের গৃহে প্রেরণ করেন। কেশরী তার গৃহে উপস্থিত হলে দেবল - জগদম্বা দম্পতির কথোপকথনে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

কেশরী ।। তোমার নাম দেবলঠাকুর?

দেবল ।। আমার নাম? তা - হ্যাঁ - না - না, আমি কেন দেবল হতে যাব? সে আমার সুমুন্দি।

জগদম্বা ।। মর মুখপোড়া মিনসে। নিজের নাম ভাড়িয়ে —

দেবল ।। মরবে - নির্ঘাত মরবে। তা দেখ কেশরী চাঁদ। তোমার খবর ভালো হয় তো আমার নাম দেবলঠাকুর, আর যদি মন্দ হয়, দেবল আমার শালা।

জগদম্বা ।। সাধে কি আর বলি বামুনের ঘরের গরু। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

সরল সাদা সিধে গরীব ব্রাহ্মণ দম্পতির কথোপকথনে রাজ ভীতি জন্ম দিয়েছে নির্মল হাস্যরস, যা আস্বাদনে দর্শকেরা ধন্য হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায়ের মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণীয় —

" হাস্যরসকে পালারসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দেওয়া ব্রজেন্দ্রকুমারের বৈশিষ্ট্য।"৬

প্রসঙ্গক্রমে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটিও স্মর্তব্য —

" দর্শকদের কি করে ধরে রাখতে হয় সে কৌশল ছিল তাঁর পূর্ণ আয়ত্তে। করুণ রসের পাশেই তিনি হাস্যরসের অবতারণা করে দর্শকবৃন্দকে জমিয়ে রাখতে পারতেন। নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে তাঁর সবিশেষ দক্ষতা ছিল। "৭

ঈশা খাঁ-র ভগিনী আলেয়া ব্যক্তিত্বময়ী নারী, সে প্রতিবাদী। আমাদের মনে হয় সে পালাকারের মানসকন্যা। তার মাধ্যমেই পালাকার হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি গড়ে তুলেছেন। এ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তাই, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনসেতু রচনা। আলেয়ার পূর্ব পরিচয় হল, সে হিন্দু - কন্যা, সত্যবতী নাম। এনায়েতের বেগম কিন্তু সেটা তার অজ্ঞাত। এনায়েতের বীরত্বে সে মুগ্ধ হয় কিন্তু নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁকে সে ঘৃণা করে। পালার শেষাংশে এই সত্য যখন উন্মোচিত হয় যে, এনায়েৎ তার স্বামী, তখন সে তাঁকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে —

আলেয়া ॥ "তোমার এ হিংস্র স্বভাব এ জন্মের সাধনায় দূর কর, পর জন্মে আমি তোমার কৃতদাসী হয়ে থাকবো।" (৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

আলেয়া সাহসিনী, তেজস্বিনী নারী। ঈশা খাঁ - কেদার রায়ের দ্বন্দ্বে সে নীরব দর্শকের ভূমিকায় স্থির থাকতে পারে নি। নিজের জীবন বিপন্ন করে হিন্দু মুসলমানের অস্ত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছে।

আলেয়া ।। ফেলে দাও অস্ত্র। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, একই অক্ষয় বটের দুটি শাখা তোমরা, একই বাংলা মায়ের দুটি সন্তান তোমরা হিন্দু-মুসলমান, এক জনের গায়ে বিস্ফোটক হলে আর একজনকে বিষের জ্বালা সইতে হয়, একের ঘরে আনন্দের স্রোত এলে অপরকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় — তবু তোমরা এমনি করে নিজের মাংস নিজে কামড়ে খাবে? তোমরা তো বনের পশু নও, তোমরা তো কৃমিকীট নও। তোমরা মানুষ, তোমরা বীর, তোমাদের ভাতৃ স্নেহের অমৃত ধারায় বাংলার মাটি সরস হয়ে উঠুক, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিতে বাংলায় একটা মহামানবের জাতি গড়ে উঠুক।
(৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

সাম্রদায়িক সম্প্রীতির উপরিউক্ত বাণী আলেয়ার মুখে শুনে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তাদের ভুল বুঝতে পেরে পরস্পরের বিরুদ্ধে উদ্যত অস্ত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করেছে। যুদ্ধ পরিত্যাগ করে তারা পরস্পরে ভ্রাতৃপ্রেমে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছে।

লোকনাট্যকারের সদিচ্ছা 'সাম্প্রদায়িকতার অবসান' কর্মটি 'চাঁদের মেয়ে' পালা রচনাতেই থেমে থাকে নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পালানাটকে ব্রজেন্দ্রকুমার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছেন। কেননা, ছেচল্লিশের দাঙ্গা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন হিন্দু-মুসলমানের হানাহানি, কাটাকাটি, বীভৎস মৃত্যুযন্ত্রণা। যন্ত্রণা কাতর আর্তমানুষগুলির মুখ দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হতেন। ১৯৪৬ সালেই তিনি লেখেন 'বাঙালী' এবং 'উজানীর চর' এরপর 'ধরার দেবতা' (১৯৪৮)। এই ধারা অব্যাহত থাকে। একে একে তিনি রচনা করেন – 'ধর্মের বলি', (১৯৫২) 'স্নেহের জয়', (১৯৫৬), 'বর্গী এল দেশে'(১৯৬০), 'নেকড়ের থাবা' (১৯৬৬), 'দেশের ডাক' (১৯৬৬), 'দুধ সায়রের দেশে' (১৯৬৬), 'কালাপাহাড়' (১৯৬৯), 'কাঁটার বাসর' (১৯৭০), 'পাহাড়ের চোখে জল' (১৯৭৩) প্রভৃতি একাধিক যাত্রাপালা। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে সমাজে আজও আমরা সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতা লক্ষ্য করি। ব্রজেন্দ্রকুমারের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক যাত্রাপালাগুলি সেদিক থেকে আজও প্রাসঙ্গিক।

এই পালা থেকেই ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রাপালার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটান। পূর্বে যাত্রাপালায় দীর্ঘ-সংলাপ প্রচলিত ছিল। এই নাটকের চরিত্রপাত্রদের মুখে তিনি সংক্ষিপ্ত সংলাপ প্রদান করলেন। কবিগানের চাপান-উতোর টেকনিক তাঁকে এক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবিত ও সহায়তা করেছিল। যাত্রার পালা বদলে সংক্ষিপ্ত সংলাপের প্রয়োগ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। নিম্নে এ পালার কিয়দংশ উদ্ধৃত হল, যেখানে ঈশা খাঁ-র সৈন্য আলেয়াকে খুঁজতে এসেছে এবং ভুলক্রমে স্বর্ণময়ীকে শাহজাদী আলেয়া বলে মনে করেছে —

স্বর্ণময়ী ।। কে তুমি? কোথা থেকে আসছো?

সৈনিক ।। সুলতান ঈশা খাঁ-র সৈনিক, আসছি শ্রীপুর থেকে।

স্বর্ণময়ী ।। তা এখানে কি? কাকে চাও?

সৈনিক ।। শাহজাদীকে।

স্বর্ণময়ী ।। কে শাহজাদী?

সৈনিক ।। হুজরাইন আমার সম্মুখে।

স্বর্ণময়ী ।। আমি? মিথ্যা কথা।

সৈনিক ।। তবে আপনি কে?

স্বর্ণময়ী ।। আমি এক ভিখারিণী।

সৈনিক ।। কেদার রায়ের পুত্রের সঙ্গে এক ভিখারিণী।

স্বর্ণময়ী ।। কেদার রায়ের পুত্র? কে সে? (৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

উপরে উদ্ধৃত ছোট ছোট সংলাপ কত স্বাভাবিক, সাবলীল এবং আন্তরিক হয়ে উঠেছে। থিয়েটারে সংক্ষিপ্ত সংলাপ প্রযোজ্য হতে পারে তা আমরা জানি। কিন্তু যাত্রায় এই ধরণের সংক্ষিপ্ত সংলাপের ব্যবহার এক দুঃসাহসিক কর্ম। ব্রজেন্দ্রকুমার সেই দুরূহ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য স্মর্তব্য —

> " যাত্রায় যেখানে সব কথাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে না বললে চারিদিকে লোক গল্পের খেই হারিয়ে ফেলে, সেখানে Short dialogue এর পরিবেশন এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। এরজন্য প্রয়োজন গল্পের মনোজ্ঞ বাঁধুনী যাতে শ্রোতারা উৎকর্ণ হয়ে সব কথা শোনে, আর শিল্পীরা সব টুকরো কথা যত্ন করে বলে, কারণ একটা কথা ফস্কে গেলেই সূত্র ছিঁড়ে যাবে। এরই ফলে শিল্পী সর্তক হয় আর শ্রোতা হয় মনোযোগী। আজ যাত্রাপালায় Short dialogue অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। " ৮

দর্শক রুচির কথা চিন্তা করে, যাত্রার প্রাচীন ধারার আঙ্গিকের সংস্কার - সাধন করে তাকে যুগোপযোগী রূপদান করেছেন ব্রজেন্দ্রকুমার। এ বিষয়ে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

" তার প্রজন্মের দর্শকদের রুচির প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি বাহুল্য বোধ স্বগতোক্তি ও দীর্ঘ সংলাপ বর্জন করতে পেরেছিলেন। সংলাপের ভাষা সহজবোধ্য করে তিনি তা সর্বজন - গ্রাহ্য করেছিলেন। দর্শকদের কি করে ধরে রাখতে হয় সে কৌশল ছিল তার পূর্ণ আয়ত্তে। " ৯

সনাতন এ পালায় বিবেক চরিত্র। বিয়োগান্তক নাটকটিতে বীররস, করুণরস, হাস্যরস ও বীভৎস রসের প্রাধান্য দেখা যায়। গল্পে, ১৮ টি গানে, অভিনবত্বে এ পালা আজও সাফল্যের দাবিদার।

আকালের দেশ (১৯৪৩) — কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত এই পালাটি ১৯৪৩ সালে ইউনাইটেড পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। কলকাতার স্বনামধন্য নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি নাটকটি প্রথম আসরস্থ করে। ডবল ক্রাউন সাইজের ৭ ইঞ্চি – ৫ ইঞ্চি মাপের ১৬৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানির বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৩৫ টাকা।

ষাটের দশকের প্রারম্ভেই যাত্রায় একটি অবশ্যম্ভাবী এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। স্বদেশীযাত্রা ছাড়া সাধারণ যাত্রায় বিশুদ্ধ সামাজিক পালা ছিল না। ব্রজেন্দ্রকুমারের 'আকালের দেশ'; 'পরশমণি' (১৯৪৫) প্রভৃতি যাত্রাপালা সামাজিক পালা রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। সেক্ষেত্রে সামাজিক পালা হিসাবে 'আকালের দেশ' রচনার একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে। ব্রজেন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠপুত্র তরুণকুমার দে গ্রন্থখানির ভূমিকায় বলেছেন —

" এ পালা যখন রচিত হয়, তখন পালাসম্রাট যুবক। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় এক মজুতদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। দুর্ভিক্ষ কারা কেন সৃষ্টি করে, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন মরমী পালাকার। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি চোখের উপর যে শোচনীয় অবস্থা দেখেছেন, তারই বহিঃপ্রকাশ এই আকালের দেশ। " ১০

সূচনা পর্ব ব্যতীত পালাখানি তিনটি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে একাধিক দৃশ্য। প্রথম পর্বে আছে সাতটি দৃশ্য। দ্বিতীয় পর্বে আটটি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। তৃতীয়পর্বে দুটি দৃশ্য পরিবেশনেই নাটকের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

পালাখানিতে ১৭ টি চরিত্র অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে স্ত্রী চরিত্র আছে চার জন ও পুরুষ চরিত্র তেরো জন। এছাড়া রয়েছে রক্ষী ও বিবেক চরিত্র 'চারণ'। এ পালায় দশটি গান পরিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এবং স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনা ও সেই ঘটনায় আত্মনিয়োগ —ব্রজেন্দ্রকুমারের এই পালার প্লট তৈরীতে সহায়তা করেছে। উক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে এই পালারচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। ব্রজেন্দ্রতনয় তরুণকুমার জানিয়েছেন —

" তখন ব্রজেন্দ্রকুমার কার্তিকপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শস্যশ্যামলা পূর্ববঙ্গের বুকেও নির্মম শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষ কালো হাত বাড়িয়েছিল। পালাকার চোখের সামনে দেখেছিলেন এই মানুষমেধ যজ্ঞ। তাঁর গাঁয়ে এক জমিদার

বহু মন চাল আটক করে রেখেছিল। পালাকার সে চাল উদ্ধার করে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্য যুবকদের নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। শেষাবধি সরকারী তরফকেও বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছিল, চাল, তেল — সবই বেরিয়ে আসে। " ১১

পালাকারপুত্র তরুণকুমার দে অন্যত্র তথা শুভলিপিকার পাতায় ও অনুরূপ কথাই বলেছেন -

" ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন দরিদ্র শিক্ষক। সোজাসুজি ডাকলেন নাটক করিয়ে ছেলেদের। তারপরে চললেন পাড়ায় পাড়ায়। মজুতদার মহাজনের বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠলেন তিনি। সবাইকে নিয়ে দাঁড়ালেন মহাজনের সম্মুখে। মহাজন কিন্তু আদৌ স্বীকার করল না যে চাল আছে। হয়তো বা সেই নগণ্য শিক্ষকের দলকে আমলই দিল না। ছুটলেন ব্রজেন্দ্রকুমার আদালতে। .... জেলা শাসকের দরবারে চলল নিয়মিত বিক্ষোভ। অবশেষে আদালত রায় দিল মজুত চাল সব বিলিয়ে দিতে হবে। " ১২

এবার পালানাটকের পরিচয় পাঠ করা যাক। সুবর্ণপুরের রাজা মণিকণ্ঠ তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করলে তাঁর পুত্র সুকণ্ঠ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাতা মন্দাকিনীর প্রশ্রয়ে এবং সেনাপতি সুদর্শনের সহযোগিতায় সুকণ্ঠ নারীসম্ভোগ ও ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। প্রজাপালন, দুর্দিনে তাদের সহায়তা প্রদান— এসব তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। প্রজাদের দুর্দশায় রাজা উল্লসিত হন। বিলাসে গা ভাসান। বিলাসভ্রমণে রাজার ময়ূরপঙ্খী নৌকা নদীতে বাধাপ্রাপ্ত হলে তাঁর আদেশে নদীবাঁধ কেটে দেওয়া হয়। জলের তলায় তলিয়ে যায় উজানগাঁয়ের চাষীদের মাঠের ফসল, ক্ষুধার অন্ন। নিরন্ন প্রজারা প্রতিবাদে মুখর হয়। বচসাকালে ঘটনাচক্রে লাঠির আঘাতে রাজার মাথা ফেটে যায়। ক্রোধোন্মত্ত রাজা প্রতিশোধ নিতে এরপরে অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি করে। প্রজাদের কুটিরে অগ্নিসংযোগ, হত্যা কিছুতেই তাঁর বাধে না। প্রজারা বিদ্রোহ করলে, শুধু হাতে নয়— ভাতে মারারও ব্যবস্থা করেন তিনি। রাজ্যের সমস্ত খাদ্যশস্য গুদামজাত করে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করা হয়। দুর্বৃত্ত রাজার অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে সুকণ্ঠের স্ত্রী বাণী রাজমাতার প্ররোচনাতেই নির্বাসিতা হন। রাজমাতা মন্দাকিনীরই ভুলে এরপর রাজপুত্র নীলকণ্ঠ গুলিতে প্রাণ হারায়। নীলকণ্ঠের শোচনীয় মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে মন্দাকিনী অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন। পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু, মাতার শোচনীয় পরিণতি এবং স্ত্রী-র প্রতি ঘোরতর অবিচারের কথা স্মরণ করে সুকণ্ঠের বিবেক জাগ্রত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন রাজবংশধর হলেই রাজা হওয়া যায় না, রাজা হওয়ার জন্য চাই প্রজাদরদ। — এই অন্তোপলব্ধিতে রাজা সুকণ্ঠের চারিত্রিক এবং মানসিক ভাবান্তর হয়। স্বেচ্ছায় রাজমুকুট তিনি প্রজাদের হাতে তুলে দেন।

নাটকখানি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আকালের দেশের নিরন্ন, বঞ্চিত, অসহায় কৃষকেরা দুর্ভিক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছে রাজা তাদের প্রতি অত্যাচার করছে এবং দেবতা দর্শকের ভূমিকায় নীরবে তা প্রত্যক্ষ করছে। তাদের মনে প্রশ্ন জাগল, দেবতা তবে কি শুধু ধনীদেরই? রাজার অত্যাচার-নিপীড়ন এবং দেবতার নিস্পৃহভাব তারা নীরবে মুখ বুজে সহ্য করলো না। 'মানুষ মোরা নহি তো মেষ'— এই বোধ তাদের জাগ্রত হোল। তারা রাজা তথা

ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'জাগলি যদি ঘুমুসনে আর সর্বহারার দল' (১ম পর্ব, ৪র্থ দৃশ্য) 'জাগো জাগো রে ভাই' (১ম পর্ব, ৪র্থ দৃশ্য), 'মরার মত মরা সে তো বাঁচার চেয়ে ভালো' অথবা 'সেদিন তো দূরে নয়, আগমনী তার কাছে শোনা যায়' (২য় পর্ব, ৫ম দৃশ্য) প্রভৃতি গণসংগীত জাতীয় গান গাওয়া সত্ত্বেও এবং শ্রেণীচ্যুত অঙ্কুরের মুখে বারবার রাজ শক্তির বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান শোনা গেলেও পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে আপোষহীন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে গেলেন না। চাষীরা একতাবদ্ধ হয়েছিল, সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু নাটকের শেষপর্বে রাজশক্তির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে অনিবার্য সশস্ত্র সংগ্রাম কৌশলে এড়িয়ে গেলেন পালাকার। কার্যতঃ ব্রজেন্দ্রকুমারের 'আকালের দেশ' পালা থেকে যাত্রায় যে গতিবেগ সঞ্চারিত হতে পারত, তা হলো না।

ব্রজেন্দ্রকুমার যখন 'আকালের দেশ' রচনা করেন, তখন সমাজিক যাত্রাপালা প্রযোজনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি। সে কারণে বহু যাত্রাদল এই পালাভিনয় করতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। এ পালার অভিনয় সাফল্য নিয়ে অনেকে শঙ্কিত ছিলেন। নটসূর্য সূর্যদত্ত অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও আকালের দেশ অভিনয় করে সেই শঙ্কা দূর করেছিলেন। যাত্রা জগতের গুরুমশাই সূর্যকুমার দত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন —

> " আকালের দেশ পালাতে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতকে সংঘবদ্ধ হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সে সময়ও সবাই আপত্তি করেছিল। আমি জোর করে খুলেছিলাম আমি জানতাম সমস্যাগুলো বাস্তব, সুতরাং তার রূপায়ণ মানুষ নেবেই। সত্যই দর্শক নিয়েছিল।"১০

সূর্য দত্তের নির্দেশনায় নট্ট কোম্পানী এই পালাভিনয় করে আশাতীত যশ লাভ করেছিল।

সুকণ্ঠ সুবর্ণপুরের রাজা। রাজশক্তি হাতে পেয়ে তিনি প্রজাদের হিতসাধনের পরিবর্তে তাদের সর্বহারা করে ছাড়েন। নারীবিলাসী রাজা তাঁর ময়ূরপঙ্ক্ষী চলাচলের সুবিধার্থে নদীবাঁধ কেটে দেন। ফলে চাষীদের মাঠের ফসল জলের তলায় ডুবে যায়। অঙ্কুরের নেতৃত্বে চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এবং রাজাকে প্রহার করে। ক্রোধোন্মত্ত রাজা ক্ষমতাবলে চাষীদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা লাগামছাড়া করেন। পিতা মণিকণ্ঠ প্রতিবাদ করলে সুকৌশলে তাঁকেও বন্দী করেন।

সুকণ্ঠ ।। দাঁড়ান। রাজদ্রোহের সুযোগ আমি আপনাকে দেবো না। আপনাকে নজরবন্দী করলাম। প্রাসাদের বাইরে আপনি যেতে পাবেন না। (১ম পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

রাজার নামটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সুকণ্ঠ — অত্যাচারী রাজার মধুর স্বরের কথা স্মরণে রেখেই ব্যঙ্গ করে পালাকার এরূপ নাম দিয়েছেন। এই রাজা ব্যক্তিত্বহীন, বিচারশক্তিরহিত। রাজমাতা মন্দাকিনীর নির্দেশেই কার্যতঃ তিনি শাসন ও শোষণ করেন। তাঁর স্ত্রী বাণী তাঁকে সুপথে ফেরাতে চাইলে তিনি তাকে " রাজনীতির কথায় চাষার মেয়ের প্রয়োজন কি? " বলে অপমান করেন। প্রতিবাদিনী বাণী রাজবাড়িতে থাকলে মন্দাকিনীর স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতে পারে, এই আশঙ্কায় মন্দাকিনী সুকণ্ঠকে দিয়ে তাকে নির্বাসন দণ্ড দেন। মায়ের হাতের পুতুল সুকণ্ঠ বাণীকে ভালোবাসলেও তাকে নির্বাসন দিয়ে বেদনাবোধ করেন —

সুকণ্ঠ ।। নিঃশব্দে চলে গেল, একটা প্রতিবাদ করলে না, একটা নিঃশ্বাসও ফেললে না। শাস্তিটা বড় বেশী হয়ে গেল, না? সে ও তো একবার ক্ষমা চাইলে না। চাষার মেয়ে কি না। যাক্, আমার আর কি – বরং একটা বাঁধন কাটলো। কিন্তু প্রাসাদটা বড় ফাঁকা লাগছে। (একপাশে বসিয়া পড়িল) (২য় পর্ব, ৪র্থ দৃশ্য)

চক্রান্ত করে মাকে বিতাড়িত করা হয়েছে বুঝতে পেরে সুকণ্ঠের পুত্র নীলকণ্ঠ তার ঠাকুমা মন্দাকিনীকে জব্দ করতে তৎপর হয়। মন্দাকিনী কিশোর নীলকণ্ঠকেও নির্বাসিত করতে চাইলে সুকণ্ঠের পিতৃসত্তা জাগ্রত হয়। মায়ের নাগপাশ ছেড়ে বেড়িয়ে এসে তিনি মাকে বলেন — " তোমার আদেশে স্ত্রী ডালি দিয়েছি, পুত্রকে ডালি দিতে পারব না। " (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য) ধীরে ধীরে সুকণ্ঠের শুভবুদ্ধি ও বিবেক জাগ্রত হয়। আত্মচেতনায় ফিরে তিনি বুঝতে পারেন মায়ের স্বরূপ এবং সেনাপতি সুদর্শনের মতলব। পরিবর্তিত সুকণ্ঠ নারী অপহরণের জন্য সেনাপতিকে ভৎর্সনা করেন —

সুকণ্ঠ ।। ... তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু বিশ্বাস করি না। যাও ভবিষ্যতে আমার বিনা অনুমতিতে যদি কোন নারীকে তার ঘর থেকে টেনে আন, আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

(২য় পর্ব, ৪র্থ দৃশ্য)

এরপরে দেখা যায়, নারীলোলুপ সুকণ্ঠ লক্ষ্মীকে রাজপ্রাসাদে ভগিনীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মায়ের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। রাজভাণ্ডারে মজুত খাদ্য শস্য কমে আসতে দেখে উজানগাঁয়ের সমস্ত খাদ্য লুঠ করে আনতে আদেশ দিলে মায়ের সেই আদেশ তিনি অমান্য করেছেন। মায়ের আদেশ অগ্রাহ্য করা মাতৃত্বেরই লাঞ্ছনা বলে তার মা অনুযোগ করলে সুকণ্ঠ তাঁর অন্তরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন —

সুকণ্ঠ ।। তুমি যে আর একজনের মাকে এরচেয়েও লাঞ্ছনা দিয়েছ মা। চাষার মেয়ে বলে যখন তার মুখে অহরহঃ থুৎকার দিয়েছ, যখন তারই ঘর থেকে তাকে বেত্রাহত কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছ তখন তো মনে কর নি যে – তারও ছেলে আছে। মায়ের কোন জাত নেই মা। একটা মাকে যে নির্যাতন করছে, ছেলের কাছে সে মায়ের মর্যাদা কেমন করে পাবে মা? তোমার প্রশ্রয়ে অসংখ্য অন্যায় আমি করেছি, বাধা পেয়েছি এইখানে। আজ আমার আদর্শের সমাধি, আমার মাতৃঋণ পরিশোধ।

(২য় অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য)

এরপর পুত্রের মৃত্যুতে সুকণ্ঠের নবজন্ম লাভ হল। মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসার মতো সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি তিনি অনুভব করতে পারলেন। স্ত্রী বাণীকে তাদের সন্তানের অবস্থান জানালেন এইভাবে—

সুকণ্ঠ ।। দেখবে এসো। (বাণীকে কাছে টানিয়া লইয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া) ওইখানে, ঐ যে একটা তারা দেখছো না? ওই তোমার নীলকণ্ঠ।

(৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে মণিকণ্ঠ বাণীর হাতে অস্ত্র তুলে দিলে সুকণ্ঠ বাণীকে বলেছেন —

সুকণ্ঠ ।। তোমার ছেলের নাম তুমিই রেখেছিলে নীলকণ্ঠ। মহেশ্বর জগৎকে অমৃত দিয়ে নিজের কণ্ঠে বিষ ঢেলেছেন — তাই তিনি নীলকণ্ঠ। তোমার ছেলে একা প্রাণ দিয়ে গোটা সুবর্ণপুরকে বাঁচিয়েছে, তার নাম সার্থক করেছে। (বাণীর হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল)। (৩য় পর্ব, ২য় দৃশ্য)

এরপর সুকণ্ঠ আর রাজা থাকতে চায় নি। রাজমুকুট প্রজাদের প্রতিনিধি জনার্দনের হাতে তুলে দিয়েছে। রাজ্যশাসনে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন এবং জীবন সম্বন্ধে ত্যাগ সুকণ্ঠ চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

মণিকণ্ঠ সুবর্ণপুরের ভূতপূর্ব রাজা। তাঁর শাসনে প্রজারা সুখে-শান্তিতে নির্ভয়ে জীবন-যাপন করত। পুত্র সুকণ্ঠের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করে তিনি তীর্থভ্রমণে গেলে সুবর্ণপুর 'আকালের দেশে' পর্যবসিত হয়। তীর্থভ্রমণ সমাপন করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে রাজ্যের শ্রীহীন অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত এবং বিচলিত হন। প্রজাদের দুর্দশার কথা শুনে তিনি মন্ত্রী কর্ণপুরের কাছে এর কৈফিয়ৎ চান।

মণি ।। আমি তো আর কাউকে বিশ্বাস করিনি। পুত্র, পত্নী কারও উপর আমি নির্ভর করি নি, করেছিলাম তোমার উপর। বল তবে, কেন আজ এই যোজনব্যাপী হাহাকার? নারী কেন নির্ভয়ে নিদ্রা যায় না, কর্মচারীরা কেন বেতন পায় না, শস্যক্ষেত্র সোনালী ধানে ভরে গেছে, তবু কেন এ দুর্ভিক্ষ? (১ম পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী রাণী, রাজপুত্র এবং সেনাপতি সুদর্শন, একথা জানতে পেরে কঠোর হস্তে তাদের সাজা দিতে তিনি অগ্রসর হন। কিন্তু রাণী মন্দাকিনীর চালে তিনি নিজেই সাজা পেয়ে যান। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে গৃহে নজরবন্দী করে রাখা হয়। পুত্রবধূ বাণীর তৎপরতায় বন্দীদশা মুক্ত হলে তিনি নিপীড়িত প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন — " মানুষ মোরা নহি তো মেষ। " নীলকণ্ঠের মৃত্যুর পরেই রাজমাতা এবং রাজার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তিত পুত্রকে দেখে তিনি আনন্দে উদ্বেল হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করেন।

মন্দাকিনী নিষ্ঠুরা, রাজদম্ভে গর্বিতা। মন্দাকিনী শব্দের অর্থ স্বর্গের পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনী। কিন্তু নাটকে দেখা যায়, তাঁর মধ্যে কোমলতার লেশমাত্র নেই। মায়ামমতাহীন কঠিন হৃদয় তাঁর। বংশমর্যাদা এবং রাজশক্তির অহংকার তাঁর নারীত্বের সমস্ত কমনীয়তা শোষণ করে নিয়েছে। তিনি রাজমাতা হলেও রাজার ভূমিকায় তাঁর অবস্থান। তাঁর নির্দেশেই চলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত গরীব চাষীদের উপর পীড়ন, অত্যাচার, শোষণ এবং হত্যার নারকীয় তাণ্ডব। মা হওয়া সত্ত্বেও অন্য মায়ের বেদনা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁরই চক্রান্তে রাজবধূ বাণীকে নির্বাসনে যেতে হয়, ফুলের মতো কোমল নীলকণ্ঠকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। তবে নীলকণ্ঠের মৃত্যুতেই তাঁর মানসিক ভাবান্তর ঘটে। নীলকণ্ঠের মৃতদেহ দর্শন করে তিনি উম্মাদ হয়ে যান। শুরু হয় তাঁর প্রায়শ্চিত্তের পালা। জীবিত অবস্থাতেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করে তিনি তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করেন।

এ নাটকে বাণী রাজবধূ হয়েও এক উপেক্ষিতা নারী। তাঁর অদৃষ্ট তিনি স্পষ্টবাদিনী এবং জন্মসূত্রে কৃষককন্যা। স্বামী সুকণ্ঠ তাঁকে ভালাবাসেন কিন্তু স্বামীর আভিজাত্যের অহঙ্কার তাঁদের মধ্যে মানসিক ব্যবধান সৃষ্টি করে।

বাণী ।। দেখি তোমার মাথাটা — একটু হাতবুলিয়ে দিই (হাত বুলাইতে লাগিল)।

সুকণ্ঠ ।। তোমার স্পর্শ কি শীতল বাণী। দূর হ, দূর হ, কেবল ফাঁদে ফেলবার মতলব। চাষার মেয়ের আকাশস্পর্শী কল্পনা (১ম পর্ব, ৩য় দৃশ্য)।

শাশুড়ী এবং স্বামী দুজনে ষড়যন্ত্র করে শ্বশুরকে সিংহাসনচ্যুত করে নজরবন্দী করলে প্রতিবাদে তিনি ফেটে পড়েন এবং তাঁরাই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী বলে শাশুড়ীকে তিনি অভিযোগ করেন।—
-

বাণী ।। কিন্তু এতদিন তো তিনি রাজ্যরক্ষা করে এসেছেন। রাজ্যের এক কণাও তো খসে যায় নি। কোন্ রাজ্যে কোন্ রাজার শাসনে এমন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করতো? রাজ্যটা ধ্বংস হতে বসেছে বরং তোমার পুত্রের শাসনে। এই এক বছর রাজ্যময় যে আগুন তিনি জ্বালিয়েছেন, সে আগুনে কি প্রজাদের আরও পোড়াতে চাও?

(১ম পর্ব, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

শুধু অভিযোগ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, 'স্বামীর অধিকারে স্ত্রীর অধিকার' শাস্ত্রের এই বিধানকে কার্যে রূপদান করেছেন। রাজপ্রাসাদে মজুত খাদ্যশস্যাদি তিনি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নিরন্ন প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং কারার লৌহকপাট উন্মুক্ত করে নিরপরাধ বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন— এজন্য তাঁকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে।

স্বামীর অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা অক্ষুন্ন ছিল। নিজপুত্রঘাতিনী উন্মাদ শাশুড়ী মন্দাকিনীকে আর সকলে ত্যাগ করলেও মমতাময়ী বাণী তাঁকে 'মা' বলে আশ্রয় দিয়েছেন। এ নাটকে বাণী চরিত্রের মধ্যে শ্বশুর - শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্বামীর প্রতি বিশ্বাস - ভালোবাসা, পুত্রের প্রতি বাৎসল্য এবং সর্বোপরি মানবপ্রীতি প্রভৃতি গুণের সমাবেশ ঘটেছে।

লক্ষ্মী নন্দীপুরের রাজা ধনপতির কন্যা। ভাগ্যের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসেই চাষার ছেলে জনার্দনকে পতিরূপে বরণ করে সমস্ত রাজৈশ্বর্য বিলাস বৈভব এক লহমায় ত্যাগ করে তিনি স্বামীর হাত ধরে চলে আসেন। জনার্দনের যোগ্য সহধর্মিনী তিনি। আহত আর্ত সুকণ্ঠকে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুললে প্রতিদানস্বরূপ সুকণ্ঠ তাঁকে কিছু দিতে চাইলে তিনি নিজের জন্য কিছুই চান না। স্বামীর ন্যায় তাঁরও দৃষ্টি ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীদের অন্নকষ্ট দূর করা। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি বলেন —

লক্ষ্মী ।। প্রতিদান দিলেই যদি আপনার শান্তি হয়, আমার একটা অনুরোধ — নিজের জন্য নয়, আমার এই দুঃখী প্রতিবেশীদের জন্যে। আপনার ঘরে অনেক চাল আছে, তার দশ ভাগের এক ভাগ এদের দান করুন, এরা খেয়ে বাঁচুক। (১ম পর্ব, ২য় দৃশ্য)

লক্ষ্মী কৃষকবধূ হলেও জন্মসূত্রে তিনি রাজকন্যা। স্বভাবতঃই রক্তে তাঁর রাজনীতি: রাজশক্তির ক্ষমতাকে প্রতিহত করতে চাষীরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে যেতে চাইলে তিনি তাঁদের নিষেধ করেন। কেননা, সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে সংঘর্ষে অধিকাংশ নিরস্ত্র অদক্ষ চাষীদের প্রাণ যেতেপারে বলে তিনি মনে করেন। তিনি রাজশক্তি এবং ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে চাষীদের সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতোই পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা চাষীদের জানিয়েছেন। —

লক্ষ্মী ।। হাতে না মেরে ভাতে মারুন। সব চাষী মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে ওদের বর্জন করুন, ধনিকের কাছে এক কণা চালও যেন কেউ বিক্রী না করে। (১ম পর্ব, ৪র্থ দৃশ্য)

লক্ষ্মীর বক্তব্য তাকে কৃষক আন্দোলনের একজন সংগ্রামী নেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী সংঘবদ্ধ চাষীরা ধনিক শ্রেণীর কাছে খাদ্যশস্য বিক্রী বন্ধ করে দেয়। ফলতঃ রাজপরিবার খাদ্য সংকটের মুখে পড়ে। রাজমাতা মন্দাকিনী বুঝতে পারেন লক্ষ্মীর নেতৃত্বেই চাষীরা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অগত্যা কালবিলম্ব না করে তিনি ছুটে যান লক্ষ্মীর কাছে এবং চাষীদের বিদ্রোহ বন্ধ করার জন্য তাকে অনুরোধ করেন। লক্ষ্মী তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, 'সিংহাসন প্রজাদের হাতে তুলে দিতে হবে।' পরিশেষে দেখা যায়, উজানগাঁয়ের চাষীরা লক্ষ্মীর নেতৃত্বে তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।

সুদর্শন স্বার্থান্বেষী, অত্যাচারী, লম্পট । মূলতঃ তার জন্যই যুবরাজ সুকণ্ঠ বিপথে যান। জনার্দন উজানগাঁয়ের চাষীদের যোগ্য নেতা। অহিংস আন্দোলনে তিনি বিশ্বাসী। তার নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহে রাজশক্তি ভয়ে কেঁপে ওঠে। রাজশক্তি অন্তর্দ্বন্দ্বে শক্তিহীন হয়ে কৃষকদের কাছে পরাভূত হয়। জনার্দনের ভূমিকায় ছোট ফণীবাবুর অভিনয় দেখে যাত্রাপ্রেমী দর্শকেরা মুগ্ধ হতেন।

অক্রুর অভিজাত বংশোদ্ভূত প্রতিবাদী চরিত্র। তিনি সুবর্ণপুরের রাজা মণিকণ্ঠের জ্ঞাতি। কৃষক বিদ্রোহের নেতা। তবে তাঁর আন্দোলনের পথ লক্ষ্মী বা জনার্দনের থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে রাজশক্তির হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার তিনি পক্ষপাতী। তাঁর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে বিদ্রোহী কৃষকেরা রাজশক্তির শৃঙ্খলে বন্দী হয়। তবে শ্রেণীচ্যুত রাজবংশধর অক্রুরের সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ও সততা প্রশংসনীয়।

এ নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মানুষ মোরা নহি তো মেষ' গানখানি ব্যবহৃত হয়েছে। পালাখানিতে আদি, রৌদ্র, বীর, বীভৎস ও করুণ রসের প্রাধান্য ঘটেছে। কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত এই সামাজিক পালাটির অভাবনীয় জনপ্রিয়তার জন্য নাটকটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

বাঙালী (১৯৪৬) — রচনাকালে পালাখানির নাম ছিল 'শেষ নমাজ'। পরে কর্মবীর আলামোহন দাস পালাকারকে নাটকখানির 'বাঙালী' নাম দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তখন থেকে নাটকটির নাম হয় বাঙালী। কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী এ নাটকের প্রকাশক। ডবল ক্রাউন ৭ ইঞ্চি – ৫ ইঞ্চি

মাপের গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৩। পুস্তকটির বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয়েছে পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র।

এই নাটকের চরিত্রের সংখ্যা ষোল, যার মধ্যে পুরুষ চরিত্র বারো এবং স্ত্রী চরিত্র রয়েছে চার জন। এছাড়া ফকির ও ভৃত্যের দুটি চরিত্র আছে। পঞ্চাঙ্ক নাটকটিতে একাধিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমাঙ্কে রয়েছে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয়াঙ্কে প্রদর্শিত হয়েছে চারটি দৃশ্য, তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে চারটি দৃশ্যে, চতুর্থাঙ্কেও আছে চারটি দৃশ্য এবং পঞ্চমাঙ্কে একটি দৃশ্য পরিবেশনেই নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে।

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে 'বাঙালী' নাটক রচনার প্রেরণার কথা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন —

> " কলকাতায় তখন ভীষণ দাঙ্গা চলছে, তখন হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল কোনো এক দৈনিক পত্রিকা লিখেছে — লেখকের উচিত উভয় সম্প্রদায়ের যেটুকু ভালো তা লোকচক্ষে তুলে ধরা। কথাটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। দুপুরে স্কুলে পড়াতে গেলাম। ইতিহাস পড়াতে পড়াতে হঠাৎ একটা লাইন চোখে লেগে গেল। লাইনটিতে একটি নাম ছিল — বাংলার নবাব দায়ুদ খাঁ। আর কিছু ছিল না। ব্যস্, আমার বাঙালী পালাও তৈরী হতে লাগল। ক্লাসের ঘন্টাও পড়ল, আমার বাঙালী পালার ছক শেষ। " ১৪

পালার প্রথমে দেখা যায়, দিল্লীর আকবর বাদশার তহশীলদার আলি মনসুর খাজনা আদায় করতে বাংলায় এসেছেন। বাংলায় এসে তিনি গণপতির পাঠশালার ছাত্রগণের প্রার্থনা সঙ্গীত — 'যিনি হিন্দুর ভগবান, মুসলমানের তিনি আল্লা, ক্রেস্তানের তিনি গড়' শুনতে পান। মৌলবাদী আলি মনসুর ভগবানের সঙ্গে আল্লার নাম একীভূত করে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি পাঠশালার পণ্ডিত গণপতিকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে গণপতি এবং বাংলার নবাব দায়ুদ খাঁ-র নাজির মোবারক রুখে দাঁড়ান। বাংলার নবাব দায়ুদ খাঁ স্বয়ং দিল্লীর বাদশার তহশীলদারের এইরূপ হীন সাম্প্রদায়িক মনোভাবের তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গণপতির পাশে এসে দাঁড়ান। শুধু তাই নয়, আলি মনসুরের এইরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ নবাব খাজনার সাথে নজরানা দিতে অস্বীকার করেন। বাংলা তথা বাঙালীর অধিকার এবং স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কায় তিনি দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই বিদ্রোহ দমন করতে দিল্লীশ্বর সিপাহশালার মুনীম খাঁকে পাঠান। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মুনীম খাঁ-র দলে সসৈন্যে যোগ দেয় নবাবপুত্র নাসির খাঁ এবং বাহাদুর। যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ঘটে এবং তাঁকে সবংশে হত্যা করা হয়। — এটাই সংক্ষিপ্ত নাট্যকাহিনী।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রজেন্দ্রকুমার দে সাধারণতঃ যে কৌশল অবলম্বন করে থাকেন, বাঙালী নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি সেই একই কৌশল প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি হিন্দুর ত্রুটি হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি দ্বারা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত

কারও ত্রুটি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ কাউকে দিয়ে সমালোচনা করান। সেই সূত্রানুসারে 'বাঙালী' পালায় দেখা যায়, মুসলমান মৌলবাদী চরিত্র আলি মনসুর, নাসির খাঁ এবং বাহাদুরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে দায়ুদ খাঁ, মোবারক। আবার বিক্রমাদিত্যের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছে তারই পুত্র প্রতাপাদিত্য। প্রসঙ্গত প্রখ্যাত যাত্রানাট্যকার শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায়ের উক্তিটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য —

> " হিন্দু - মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরম প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি একাধিক নাটকে ঐ উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যেমন, 'বাঙালী' -তে 'দায়ুদ খাঁ' এবং 'সোনাই দীঘি' -তে 'হোসেনশাহ'। মুসলমান এই চরিত্র দুটি হিন্দু বিদ্বেষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর তাতেই বক্তব্যটা জোরদার হয়েছে। এটা একটা শুভ সামাজিক প্রচেষ্টা। " ১৫

'বাঙালী' পালার অভিনয়কালে দেখা গেছে, দায়ুদ খাঁ যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অপরাধে শাস্তিস্বরূপ বাহাদুরের পদচ্যুতি এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ মোবারকের পদোন্নতি ঘটাচ্ছেন, তখন দর্শকের সহস্র করতালিতে প্যাণ্ডেল মুখরিত হয়ে যায়। এরূপ কৌশল অবলম্বনে দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা যায় এবং নাটকও একটা বিশেষ মাত্রালাভ করে। ব্রজেন্দ্রকুমার স্বয়ং এ সম্পর্কে বলেছেন —

> " কলিকাতার দাঙ্গা এবং নোয়াখালির মারণযজ্ঞের পরই আমি লিখেছিলাম 'বাঙালী' নাটক। পালানাটকের বিবর্তনের ইতিহাসে 'বাঙালী' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই নাটকে নিপীড়িত হিন্দুর নালিশ মুসলমানেরাই মুসলমানের দরবারে পেশ করেছে। " ১৬

বাংলার পাঠান নবাব দায়ুদ খাঁ হিন্দু - মুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টি ও সমমনোভাব পোষণ করতেন। প্রজানুরঞ্জক নবাব জন্মের অধিকারের চেয়ে কর্মের অধিকারকে অধিকতর মর্যাদা দিতেন।

দায়ুদ ।। দায়ুদ খাঁ কারও জন্মের দাবি স্বীকার করে না বাহাদুর। আত্মীয় বলে কেউ তার কাছে বিশেষ অধিকার পাবে না। সে যখন মরবে, তার সব কিছুই পড়ে থাকবে চাটুকার আত্মীয়ের জন্য নয়, দীন দরিদ্র দেশবাসীর জন্য। (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতার জন্য নবাব দায়ুদ খাঁ সহিস পুত্র মোবারককে দশহাজারী মনসবদারে উন্নীত করেন, আবার ভাতুষ্পুত্র বাহাদুরের পদচ্যুতি ঘটাতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। পিতার এরূপ বিচারে নবাব পুত্র নাসির খাঁ পিতৃদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাতেও তিনি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। গণপতি ঠাকুর বাদশার তহশীলদার আলি মনসূরের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতার অভিযোগ আনলে তিনি বলেন — " তোমার জন্য নয়। আমার প্রজার অপমানে আমার অপমান। তোমার ভগবানকে আমি ডাকব না সত্য, কিন্তু তার অপমানও আমি সইব না। " বাংলার নবাব দায়ুদ খাঁ যথার্থ ধার্মিক। কত সহজেই তিনি ধর্মের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করেছেন। ধর্ম নিরপেক্ষ নবাব বিশ্বাস করেন — " ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ, যে যে ধর্মই আচরণ করুক, তাতে বাধা

দেবার অধিকার কারও নেই। " (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য) মতিচ্ছন্ন যুবক সত্যপীর ধর্মীয় বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তাঁর কাছে আসলে তিনি তাকে দেশসেবা ও দেশরক্ষার মতো মহান পথে, মহৎ কর্মে চালিত করেন।

দায়ুদ ।। তোমার জন্মভূমি .... এই সুজলা সুফলা বঙ্গজননী তোমার যে আরাধনার ধন। এর মধ্যে খোদাও আছেন, ভগবানও আছেন। তোমায় নমাজও পড়তে হবে না, পুজোও করতে হবে না। তুমি বাংলা মায়ের সেবা কর। (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

গণপতির পাঠশালায় অনধিকার প্রবেশ এবং গণপতিকে অপমান করার শাস্তিস্বরূপ নবাব আলি মনসুরকে বন্দী করেন। হিন্দুর নালিশে মুসলমান হয়ে মুসলমানকে বন্দী করলে নবাবের প্রতি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অসন্তুষ্ট হন। প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রজানুরঞ্জক দেশপ্রেমিক নবাব দায়ুদ খাঁ ভাতুষ্পুত্রকে বলেন — " আমি আগে বাঙালী, তারপর মুসলমান। ..... আমার পিতা পিতামহের পরিচয় যাই হোক, আমি জন্মেছি এই বাংলার মাটিতে। বাঙলা আমার জননী, বাঙালী আমার ভাই। " (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) আলি মনসুর খাজনা আর সেই সঙ্গে নজরানা অর্থাৎ প্রণামী দাবি করলে তিনি স্পষ্টই বলেন — " খাজনা আমি দেব না। আর নজর? নজর দেব পাঁচ জুতি। " এরপর নবাব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলার জাতীয় পতকা উড্ডীন করেন। শুধু তাই নয়, দিল্লীর বাদশাহের রূপমহল তিনি ধূলিস্যাৎ করে দেন।

বাংলার বিদ্রোহ দমন করতে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসেন দিল্লীর বাদশার সিপাহশালার মুনীম খাঁ। নবাব তার সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। স্বভাবতই নবাবের সঙ্গে দিল্লীর সম্রাটের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় রাজমহলে। যুদ্ধে নবাব পুত্র নাসির খাঁ উজীরী পদ লাভের প্রলোভনে সম্রাটের দলে যোগ দেয় এবং পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। শেষ পর্যন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সম্মুখ যুদ্ধে পিতার হাতে তার মৃত্যু হয়। দায়ুদ খাঁ নবাব হলেও তিনি একজন পিতা। অপরাধী পুত্রের মৃত্যুকালে পুত্রের মঙ্গল কামনায় তিনি আল্লার কাছে কাতর প্রার্থনা জানান —

দায়ুদ ।। খোদা, নাসির আমার অপরাধী পুত্র। মুমূর্ষু অপরাধীকে আমি ক্ষমা কচ্ছি, তুমিও ক্ষমা কর, তুমিও ক্ষমা কর। (৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

ক্ষমাপ্রাপ্ত বেইমান বাহাদুর বিশ্বাসঘাতকতা করে সসৈন্যে দিল্লীর সম্রাটের দলে যোগ দিলে দায়ুদ খাঁ নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হন। তাঁরই ভ্রান্তির জন্য তাঁদের বিজয় দূরস্থ হয়ে পড়েছে ভেবে তিনি আত্মগ্লানিতে কাতর হন। —

দায়ুদ ।। আমি জানি জয় আমাদের হবে না। মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে দশ হাজার নিলে নাসির খাঁ, পাঁচ হাজার বাহাদুর ডালি দিলে। অবশিষ্ট যারা আছে, তাদের নিয়ে বাদশাহী ফৌজ হটিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু দোষ তোমার নয়, আমার, বাহাদুরকে আমি আবার মনসবদারি দিয়েছিলাম। (৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

পুত্রের শেষকৃত্য ও প্রার্থনা উপলক্ষে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা সত্ত্বেও নরপিশাচ আলি মনসুর নিরস্ত্র অবস্থায় প্রার্থনারত বাংলার নবাব দায়ুদ খাঁ-কে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মৃত্যুমুখে পতিত

নবাব জীবনে 'শেষ নমাজে' খোদার কাছে বাঙলা এবং বাঙালীর মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা জানান।

দায়ুদ ।। হজরৎ আমাকে একটু তুলে ধরুন, আমি নমাজ শেষ করব। (ফকির তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলেন) খোদা, কণ্ঠে ভাষা নেই, বুকে বল নেই, অপরাধ ক্ষমা কর দীনদুনিয়ার মালিক। মন্ত্র থাক, অনুষ্ঠান ·থাক, — বাঙলার মঙ্গল কর, বাঙালীকে শান্তি দাও।

(৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

এ নাটকে ধর্মপ্রাণ দায়ুদ খাঁ সুশাসক ও সুবিচারক। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের চেয়ে দেশ ও জাতি তাঁর কাছে বড়। তাঁর পরিচয় তিনি বাঙালী এবং বাঙালার স্বাধীন নবাব।

নবাবপুত্র নাসির খাঁ-র মধ্যে পিতার গুণাবলীর কণামাত্র নেই। ধর্মীয় মৌলবাদী নাসির খাঁ মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুর সমানাধিকারে ঘোর বিরোধী। পিতার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নীতিকে তিনি প্রথম থেকেই বিরোধিতা করে আসছেন। উদ্ধত স্বভাবের নাসির খাঁ সামান্য উজীরী লাভের আকাঙ্ক্ষায় পিতৃদ্রোহী হন। সম্রাট আকবরের সিপাহশালার মুনীম খাঁকে খুশি করতে তস্করের ন্যায় নারী অপহরণ করে তাঁকে উপঢৌকন দিতেও তার চরিত্রে বাধে না। মুনীম খাঁ তাকে চিনতে পেরে বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত করেছে। পাপ বাপকে ছাড়ে না। নাসির খাঁ পিতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মুনীম খাঁ-র দলে যোগ দিলেও যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার হাতে তার মৃত্যু হয়। লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়' প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

দিল্লীর বাদশা আকবরের তহশীলদার আলি মনসুর, সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ, অত্যাচারী লম্পট এবং নৈতিকতাহীন বিশ্বাসঘাতক। শাহজাদা নাসির খাঁ-র কবর উপলক্ষে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা সত্ত্বেও নিরস্ত্র অবস্থায় হীন কাপুরুষের ন্যায় সে বাঙলার নবাবকে অস্ত্রাঘাত করে হত্যা করে।

দায়ুদ ।। দাঁড়াও আলি মনসুর। আমি নিরস্ত্র। একখানা অস্ত্র আমায় দাও, তারপরে এগিয়ে এস, দেখি কত ধার তোমার তরবারিতে।

আলি ।। এই যে দিচ্ছি অস্ত্র। (অস্ত্রাঘাত) (৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

মোবারককেও সে নিষ্ঠুরভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করে। কিন্তু আকবরের সেনাপতি মুনীম খাঁ তার মতো বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করেন নি, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

এই পালায় মুনীম খাঁ আকবরের সিপাহশালার। বাদশা তাঁকে বাংলার বিদ্রোহ দমন করতে পাঠিয়েছেন। তাঁর মহত্ত্বের জন্য তিনি দর্শকের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। তিনি ন্যায়বান। পরনারী তাঁর কাছে মায়ের সমান। তাঁকে খুশি করতে শয়তান আলি মনসুর নারী উপহার দিতে চাইলে তিনি আলিকে ভর্ৎসনা করে বলেন —

মুনীম ।। আমার কাজের জন্য আমিত বেতন পাই আলি মনসুর। প্রজারা যদি আমাকে উপহার দেয়, সে উপহার আমার নয়, সম্রাটের। যুদ্ধের পর এ উপহার আমি সম্রাটের কাছে

নিয়ে যাব। তিনি যদি গ্রহণ করেন, ভাল, না করেন, আমি যেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানেই রেখে যাব। তোমার কোন ভয় নেই মা। তুমি আহার্য্য গ্রহণ কর। সম্রাট মহানুভব, আর তার গোলামের গোলাম এই মুনীম খাঁর কাছে নারীমাত্রই সেলামের পাত্রী। (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

মুনীম খাঁ শান্তিপ্রিয় মানুষ। দায়ুদ খাঁ-র বুদ্ধিমত্তার তিনি প্রশংসা করেন। মোবারকের মতো বিশ্বাসী সাহসী বীরকে বন্ধু ভাবতে তাঁর ভাল লাগে। তিনি নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ চান না। বাংলার নবাব সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও বাংলার সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর অনীহা। আলি মনসূর সম্মান-অসম্মানের প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন —

মুনীম ।। আমার একটুখানি অসম্মানের বিনিময়ে এমন দু'জন বন্ধু যদি পাওয়া যায়, আর এমন সুন্দর একটা দেশ যদি রক্তস্নানের হাত থেকে রক্ষা পায়, তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় কি আছে আলি মনসূর? চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে বাঙলাকে আমি চষে ফেলতে পারি, কিন্তু যুদ্ধ না করেই যদি জয় করতে পারি, সে কি আরও ভালো নয়?

(৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

বাঙলার সঙ্গে যুদ্ধ তাঁর অনভিপ্রেত হলেও যুদ্ধ তিনি এড়াতে পারলেন না। যুদ্ধে সম্রাটের জয় হল। অকৃতদার মুনীম খাঁ প্রেমকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বন্দী করে নবাবের বান্দা এবং বাঁদীকে তাঁর সামনে শাস্তির জন্য হাজির করা হলে দেশপ্রেমের জন্য তিনি তাদের তারিফ করেন এবং তাদের পরস্পরের হৃদয় গঠিত প্রেম সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাদের শাস্তির পরিবর্তে বিবাহের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন —

মুনীম ।। এই কুকুর দুটোকে মোল্লার বাড়িতে নিয়ে যা। মোল্লাকে বলবি যেন আজই এদের বিয়ে দিয়ে দেয়। ... এদের একটা বাড়ি আর একটা লাঙ্গল কিনে দিবি, আর কেটে ফেলবি তাকে, যে এদের গায়ে কাঁটার আঁচড় দেবে। (৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

এমন বাঙলার বিরুদ্ধে, এমন দেশপ্রেমিক, জাতিপ্রেমিক নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ পেয়েছেন বলে মুনীম খাঁ নিজেকে হতভাগ্য মনে করেছেন। দেশপ্রেমিক সমস্ত বীর শহীদদের দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। শিশু বুলবুলের মৃত্যুতে মর্মাহত মুনীম খাঁ বাদশাহের চাকুরী পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করেছেন। পুত্রহীন মায়ের বেদনা উপলব্ধি করেও পুত্র শোকাতুরা নবাবের বেগম ফুলবেগমকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন—

মুনীম ।। যেও না, আত্মহত্যা মহাপাপ। দায়ুদ খাঁ থাক, বাঙলার স্বাধীনতা থাক — শুধু তুমি আমার কাছে এস মা। বাদশাহের গোলামি আর করব না। তোমাকে নিয়ে মাতৃহীন আমি, পর্ণকুটীরে বাস করব। সারাজীবন অশ্রুজলে তোমার পা ধুয়ে দিয়ে এই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করব। (৪র্থ অঙ্ক,৪র্থ দৃশ্য)

যুদ্ধ সমাপ্তিতে এই যুদ্ধের চক্রান্তকারী, যুদ্ধের হোতা আলি মনসূরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়ে তিনি ন্যায়বিচারই করেছেন।

মোবারক সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞানহীন স্বাধীনচেতা যুবক। সামান্য একজন সহীসপুত্র হয়েও সুকৃতির জন্য নবাবের সিপাহশালার পদে তিনি উন্নীত হতে পেরেছেন। কোনরূপ প্রলোভনে তাঁকে টলানো যায় নি। নারীর সম্মান বাঁচাতে তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত বাজী রেখেছেন। বেদেনীর ছদ্মবেশে গণপতির ভগিনী ছবিকে আলি মনসূর এবং নাসির খাঁর থাবা থেকে উদ্ধার করে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

বিক্রমাদিত্য দায়ুদ খাঁ-র অমাত্য। অর্থলোভী সুযোগসন্ধানী বিক্রমাদিত্য ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়েও যেন-তেন-প্রকারেণ আখের গুছিয়ে নিতে তৎপর। জাতিপ্রীতি, দেশপ্রীতির ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। তিনি কায়স্থ সম্প্রদায়ের সমাজপতি। তৎকালীন সমাজের সমাজপতিদের নিষ্ঠুরতা তার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

ফকির এ পালার বিবেক চরিত্র। আমাদের মনে হয়, তিনি পালাকারের প্রতিভূ। "রাজ্যটা হিন্দু বা মুসলমানের নয় — রাজ্যটা বাঙালীর।" — একথা নবাব দায়ুদ খাঁ ঘোষণা করলে নবাবজাদী আশমান অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি এরূপ রাজত্বের ধ্বংস কামনা করেন। ফকির গান গেয়ে আশমানকে সাম্প্রদায়িকতা থেকে সরে এসে দেহতত্ত্বের দিকে তাকাতে বলেছেন—

ফকির ॥ মিছে কেন ভেদাভেদ, হিন্দু-মুসলমান।
একই মাটি দিয়ে গড়া দু'জনেরি দেহ ঘর,
একই মাটিতে লয় দু'জনে মরার পর।
দু'জনেরি দেহতলে,
একই লাল খুন চলে,
ভাই ভাই তোরা দুই বাঙলার সন্তান–হিন্দু -মুসলমান। (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

হিন্দুবিদ্বেষবশতঃ জুতোপরে নাসির খাঁ গণপতি ঠাকুরের মন্দিরে জোর করে প্রবেশ করতে চাইলে নাসির খাঁর বিবেক জাগ্রত করার জন্য ফকির গেয়ে উঠেছে ——

শুধুই মুষল, শুধুই মানে,
গড়ে না ভাই মুসলমানে
মানের গোড়ায় ছাইদে আগে, ভরবে মানে বিশ্বধাম। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

হিন্দু সমাজপতিদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্তা হিন্দু বিধবা গণপতির ভগিনী ছবি অভিমানে ফকিরের কাছে কোরান চাইলে ফকির তাকে গীতা দিয়ে যে কথা বলেছেন তাতে সর্ব ধর্মের সার কথা প্রকাশিত হয়েছে — " ওর মধ্যে কোরানও আছে, বাইবেলও আছে। "

ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি, সম্রাট আকবর সর্বধর্ম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সকল ধর্মের সারকথা নিয়ে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। নব প্রবর্তিত ধর্মের নাম দিয়েছিলেন 'দীনইলাহী'। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে আকবর প্রবর্তিত ধর্মে প্রভাবিত হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য এ নাটকে এক অভিনব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, সত্যপীর তার নাম।

সত্যপীর হিন্দু পিতা-মাতার সন্তান। মাতৃবিয়োগের পর তিনি মুসলমান গৃহে প্রতিপালিত হন। দুই ধর্মে অবগত সত্যপীর ঠিক করেছেন হিন্দুর ভগবান এবং মুসলমানের খোদার একত্রীভবন করবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি লুঙ্গি পরিধান করেন কিন্তু গায়ে নামাবলী দেন, দাড়ি রাখেন আবার টিকিও ধারণ করেন। তিনি 'পূমাজ' (পূজা + নমাজ) পড়েন 'খোদাবানের' (খোদা + ভগবান) উদ্দেশ্যে। মানবপ্রেমিক 'হিন্দুমান' (হিন্দু + মুসলমান) সত্যপীর তাঁর নব উদ্ভাবিত 'হিন্দুলাম' (হিন্দু + ইসলাম) ধর্মে সকলকে দীক্ষা দিতে চান। সেই উদ্দেশ্যে নবাব দায়ুদ খাঁকে নতুন ধর্মে দীক্ষা দিতে গেলে নবাব এই বিপথগামী যুবক সত্যপীরকে দেশসেবার ন্যায় সঠিক পথের সন্ধান দেন। অতঃপর সত্যপীর যথার্থ বাঙালী হয়ে বাংলা মায়ের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে অগ্নিনিয়োগ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্ভীক দেশপ্রেমিকের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি শহীদ হন।

নবাবপুত্র বুলবুল নাটকে 'একানে বালক' চরিত্ররূপে এসেছে। 'বাপ্‌কা বেটা' বলতে যা বোঝায় বুলবুল একেবারে তাই। পিতার ন্যায় বঙ্গপ্রীতিতে সে ভরপুর। যুদ্ধক্ষেত্রে হাসতে হাসতে সে বীরের মৃত্যুবরণ করেছে।

নবাবকন্যা আশমান বাঙালী ঘরের টিপিক্যাল মেয়ে। সে মোবারককে ভালোবাসে অথচ লোকসম্মুখে তাঁর বিরোধিতা করে। মোবারকের শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করে।

আশমান ।। ছোটলোকটা বলে কি – শাহাজাদীর রক্তচক্ষু আর বিলোল কটাক্ষকে আমি সমানই তুচ্ছজ্ঞান করি। শাহাজাদী তোর দিকে হাঁ করে আছে কি না। (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

মোবারকের প্রতি শাহাজাদী আশমানের এই বিরাগ অনুরাগেরই নামান্তর বলে আমাদের মনে হয়।

ব্রজেন্দ্রকুমারের এ পালায় দুটি বালক চরিত্র আছে – বুলবুল ও প্রতাপ। তবে প্রতাপ বুলবুল অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। এই প্রতাপ ইতিহাসখ্যাত বীরযোদ্ধা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের কিশোররূপ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সে মুখর। পাঠশালার গুরুমশাই গণপতি পণ্ডিতের প্রতি আলি মনসূরের অন্যায় কার্যের প্রতিবিধানের জন্য সে স্বয়ং নবাব বাহাদুরের নিকট সুবিচার দাবি করে। ঘুষখোর সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও তার নালিশ। সুবিচার না পেলে প্রয়োজনে তরবারির সাহায্য সে নিতে পারে, একথা নবাবকে জানিয়ে আসে। কিশোর প্রতাপের এই চোখ রাঙানি বৈষ্ণবীয় দীনতার চেয়ে ভালোলাগে নবাবের। স্বাধীনতাকামী প্রতাপ দিল্লীর বাদশার শাসানতন্ত্র থেকে বাংলাকে স্বাধীন করতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। সে-ই প্রথম স্বাধীন বাংলার উড্ডীন পতাকাকে সেলাম জানায়। যুদ্ধের প্রাক্কালে তার " চল পথে দুর্বার শঙ্কারে করি জয় " উদ্দীপক সংগীত এবং " জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য " সূচক সংলাপ নারীবাহিনীদের উৎসাহ জোগায়। ইতিহাসখ্যাত প্রতাপাদিত্যের মতোই এ পালার প্রতাপের নারীসম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কুচিত। নারী-পুরুষের সমানাধিকারে সে পক্ষপাতী নয়। তার মতে, রাজনীতি নারীর জন্য নয়, নারীর ভূমিকা অন্তঃপুরে। সে বলে — " রাজা-প্রজার কথার মধ্যে মেয়েছেলে আসবে কেন? তারা শুধু অন্দরে বসে কাঁদবে। " — কিশোর প্রতাপের জবানীতে এ জাতীয় সংলাপ জ্যাঠামি মনে হতে পারে, তবে আসরে পুরুষ দর্শকের হাততালি কুড়োতে এ জাতীয় সংলাপের জুড়ি নেই।

ব্রজেন্দ্রকুমারের 'বাঙালী' ঐতিহাসিক নাটক হলেও ইতিহাসকে লেখক পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি। ব্রজেন্দ্র-সমসাময়িক পালাকার শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 'বাঙালী' পালার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছেন কিনা ব্রজেন্দ্রকুমারকে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন –

> " আমি নিই নি। কারণ আমার কাছে তখন বক্তব্যটাই প্রধান ছিল। এরপরে আমি কখনও ইতিহাসের তথ্য বিশেষ গ্রাহ্য করি নি। সর্বত্রই বক্তব্যের খাতিরে, পালার প্রয়োজনে ইচ্ছামত ইতিহাসকে ভেঙেচুরে নিয়েছি। " ১৭

ব্রজেন্দ্রকুমার দে 'বাঙালী' পালায় ইতিহাস রচনা করেন নি, ইতিহাসকে আশ্রয় করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পালাগান গেয়েছেন। 'বাংলার যাত্রানাটক' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> " বাঙালী নামেই ঐতিহাসিক পালা। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। " ১৮

ব্রজেন্দ্রকুমার সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে জনসচেতনতার জন্য এ পালা রচনা করেছেন। এই লক্ষ্যে উত্তীর্ণের জন্য তিনি ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে মান্য না করে যথাসম্ভব অনুসরণ করেছেন। নন্দনতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্বের অনুভাবনায় বলা যায়, ঐতিহাসিক সাহিত্য (ঐতিহাসিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক নাটক) ইতিহাসের ঘটনাবলীর পুঞ্জীভূত তথ্যমাত্র নয়, ঐতিহাসিক সাহিত্য যুগ-বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের মূলস্রোত বা ভাবনাকেই মূর্ত করে তোলে উপন্যাস, নাটক, কাব্য বা যাত্রাপালার আঙ্গিনায়।

ব্রজেন্দ্রকুমারের এই যাত্রাপালাখানি আর্য অপেরা প্রথম অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিল। এ পালার একাধিক সংস্করণ নাটকটির অসাধারণ জনপ্রিয়তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। শুধুমাত্র আর্য অপেরা নয়, একে একে নরবঞ্জন অপেরা, নাট্যভারতী, নিউ আর্য অপেরা, সাঁঝের আসর প্রভৃতি পেশাদার যাত্রাদলে মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যাত্রাপালাখানি নট্ট কোম্পানির জন্য রচিত হলেও পাকিস্তানকামীদের ভয়ে তারা বাঙালী পালাভিনয় করতে সাহস পায় নি।

'বাঙালী' পালার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে প্রখ্যাত নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য মহাশয় পালাখানির নাট্যরূপ প্রদান করে থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন ——

> " ব্রজেন্দ্রবাবুর বাঙালী নাটকটি দেখার পর থেকেই আমার মাথায় ঘুরছিল কেমন করে এটিকে মঞ্চনাট্যে রূপান্তরিত করা যায়। কথাটা ওকে বলতেই উনি তো লাফিয়ে উঠলেন। হাসিমুখে বললেন — রূপান্তর আপনিই করবেন তো? বললাম – হ্যাঁ।
>
> — তাহলে আপনার যেমন ইচ্ছে করুন। আমার কিছুই বলার নেই। তাই হল। বই হল এবং বেশ ভালই হল। নাম হল — লালপাঞ্জা, অভিনয় হল রঙমহলে। " ১৯

ব্রজেন্দ্রকুমারের এই যাত্রাপালা যেমন গ্রামে-গঞ্জে খেটে খাওয়া সাধারণ চাষী মজুর এবং কলিয়ারী

অঞ্চলের যাত্রাপ্রেমী শ্রমিকদের চিত্ত জয় করেছিল, তেমন এর নাট্যরূপ 'লালপাঞ্জা' মঞ্চনাট্যরূপে শহরের শিক্ষিত জনমানসেও স্থান করে নিয়েছিল। 'লালপাঞ্জা' প্রথমে রঙমহলে মঞ্চস্থ হলেও একে একে স্টার থিয়েটার, বিশ্বরূপা থিয়েটার, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, মহাজাতি সদন ও বিভিন্ন যাত্রা উৎসবে শিল্পী সমন্বয়ে মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। তবে 'বাঙালী' যেভাবে আসরে দর্শকমনকে নন্দিত করেছিল বিধায়ক ভট্টাচার্য্যকৃত মঞ্চনাট্য 'লালপাঞ্জা' মঞ্চে তদ্রূপ সাড়া জাগাতে পারে নি। প্রসঙ্গত যাত্রাপালাকার সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য

> " বিধায়ক ভট্টাচার্য ব্রজেন্দ্রবাবুর 'বাঙালী' নাটকটি কেটেকুটে মঞ্চনাটক 'লালপাঞ্জা' -তে রূপ দিলেও নাটকটি থিয়েটারে বিশেষ জমে নি।" ২০

ব্রজেন্দ্রকুমারের 'বাঙালী' পালার অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে যাত্রাজগতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে উপজীব্য করে যাত্রাপালা রচনার জোয়ার আসে। 'বাঙালী'-র প্রদর্শিত পথে হিন্দু-মুসলমানকে অবলম্বন করে ও তাদের বৈরিতা-মিত্রতা প্রদর্শন করে যাত্রানাটক রচনা করে অনেক লেখক সফল পালাকাররূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই পথেই রচিত হয়েছিল সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'রক্তের টান', বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু-মুসলমান' নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর 'মিলন সেতু', জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'ডাকিনীর চর' প্রভৃতি জনপ্রিয় যাত্রাপালাগুলি।

ব্রজেন্দ্রকুমারের বাঙালী পালাখানি আজও গ্রামে-গঞ্জে অ্যামেচার যাত্রাদলে অভিনীত হয়ে থাকে। বাঙালী পালার প্রাসঙ্গিতকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রখ্যাত যাত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্তা বলেন —

> " বাঙালী পালার বিষয় কাহিনী, এর ভাষা, সংলাপ অসাধারণ। বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনয়নে বাঙালী পালা এখনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এ পালা আজও প্রাসঙ্গিক। " ২১

প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা এবং পরিচালক নটসম্রাট স্বপনকুমার বাঙালী পালায় নাসির খাঁ -র ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। তিনি ব্রজেনবাবুর পালার বিশিষ্টতা সম্পর্কে বলেন—

> " ব্রজেনবাবুর চিন্তাধারা, যাত্রাপালার বিষয় কাহিনী, নাটকীয় সংলাপ এত মডার্ন ছিল ভাবা যায় না। ১৯৫১ – ১৯৫২ সালে তাঁর চিন্তাধারার যে রূপ অগ্রগতি দেখেছি, ১৯৯৯ সালেও তা ছাপিয়ে যাবে। আজ আমার স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে ব্রজেনবাবুর নাটকে অভিনয় করে, ব্রজেনবাবুর নাটকের স্বাভাবিক সংলাপ বলে আজ আমি স্বপনকুমার হতে পেরেছি। " ২২

ব্রজেন্দ্রকুমার সম্পর্কে স্বপনকুমারের এই মূল্যায়ন যথার্থ। প্রথম শ্রেণীর একজন সফল এবং মহৎ শিল্পী একজন পালাকারের কাছে এইভাবে ঋণ স্বীকার করতে পারেন।

অসাধারণ জনপ্রিয় বিয়োগান্তক এই নাটকে আদি, করুণ, বীভৎস ও বীর রসের প্রাধান্য ঘটেছে। নাটকটিতে সতেরোটি গান আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের " বাংলার মাটি, বাংলার জল " এবং প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের " সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে " গান দু'খানি এপালায়

যথার্থভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানী এইচ. এম. ভি. বা হিজ মাস্টারস ভয়েস ১৯৬৬ সালে পালাটির লং প্লে রেকর্ড প্রকাশ করে। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকেও যাত্রাপালাখানি সম্প্রচারিত হয়েছিল।

আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার ইতিহাসের পটভূমি ও কাঠামোকে এবং কতিপয় ইতিহাসের চরিত্রকে ব্যবহার করে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাবনাকে পালায় রূপদান করেছেন। ইতিহাসের বিচারে দায়ুদ খাঁ চরিত্রটি হয়ত ভিন্ন প্রকৃতির। লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখ্য—

> " দাম্ভিক ও শাসনকার্যে অপটু দায়ুদ খাঁ-কে (১৫৭০ – ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) অবলম্বন করিয়া নাটকে যে ঘটনাবলীর অবতারণা করা হয়েছে তাহাতে ইতিহাসের মর্যাদা সংরক্ষিত হয় নাই। .... এই নাটকে ঐতিহাসিক রঙ আছে কিন্তু ঐতিহাসিকতা নেই।" ২৩

ব্রজেন্দ্রকুমার যুগ প্রয়োজনে ইতিহাসের চরিত্রকে কিছুটা নতুনরূপে প্রদর্শন করেছেন এবং 'দিন ইলাহী' ধর্মের প্রবর্তক আকবরের উদার ভাবনার সঙ্গে গ্রোথিত করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আদর্শকে প্রকাশ ও প্রচার করেছেন বাঙালী পালায়। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির প্রশ্নটি বাঙালীর ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের এক বিশিষ্ট দিক এবং এই দিক থেকে এই পালাটি শুধু অভিনব নয়, তার প্রভাবও বাংলার যাত্রা ও নাট্যজগতে সুদূরপ্রসারী হয়েছে। সাম্প্রতিককালেও এই পালাটি গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে সাড়ম্বরে অভিনীত হয়, যা পালাটির জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন।

গাঁয়ের মেয়ে (১৯৫১) — ব্রজেন্দ্রকুমার দে ১৯৫১ সালে এই যাত্রাপালাখানি রচনা করেন। ডায়মণ্ড লাইব্রেরী নাটকটি প্রকাশ করেছিল। মেদিনীপুরের একটি নিতান্তই ক্ষুদ্র অখ্যাত যাত্রাদল সত্যনারায়ণ অপেরাকে ব্রজেন্দ্রকুমার এই পালাভিনয় করতে দিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালেই তারা 'গাঁয়ের মেয়ে' আসরস্থ করেছিলেন।

ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা দুর্বল 'রূপবতী' পল্লীগীতিকাই এ পালার উৎস। এই গীতিকার কবি অজ্ঞাত। ব্রজেন্দ্রকুমার সেই অজ্ঞাত পল্লীকবির রচিত কাহিনী প্রায় অবিকৃত রেখে যুগোপযোগী যাত্রাপালারূপে পরিবেশন করেছেন। এইপালার ভূমিকায় তিনি বলেছেন —

> " দূর পল্লীগ্রামে অখ্যাত কবি অনেক পল্লীগাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মেয়েদের ব্রতকথায়, ঠাকুরমার গল্পে, গুণাই বিবির গানে, চাষাভূষাদের কেচ্ছায় পর্যন্ত সেইসব পল্লীগাথার অপরূপ মাধুর্যটি ছড়াইয়া রহিয়াছে। ... গাঁয়ের মেয়ে রচনায় আমার কৃতিত্ব সামান্যই। পল্লীকবির লেখনীতেই ইহার সৌন্দর্য রূপায়িত।" ২৪

মহানুভব পালাকার এ পালার অজ্ঞাত কবির ভূয়সী প্রশংসা করে মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, পালাকার গীতিকার দুর্বলতা সত্ত্বেও আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে এক আকর্ষণীয় পালানাটকে রূপদান করেছেন। তবে কখনও তিনি পল্লীগীতিকার মূল সুর থেকে বিচ্যুত হন নি।

'চাঁদের মেয়ে' -তে জমিদার কন্যা বালবিধবা স্বর্ণময়ীর জীবনের বেদনাময় রূপ তুলে ধরা হয়েছে। 'সমাজের বলি' -তে নিম্ন সম্প্রদায়ের ঘরের মেয়ে কাঞ্চনের প্রতি সামাজিক অবিচারের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। আর 'গাঁয়ের মেয়ে' পালানাটকে উচ্চবর্ণের ভূস্বামীর কুমারী মেয়ে রূপবতীর প্রতি সামাজিক অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। এই রূপবতী মূলতঃ শহরের মেয়ে। কিন্তু সামজিক নিপীড়নে সে গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং 'গাঁয়ের মেয়ে'তে পরিণত হয়।

'গাঁয়ের মেয়ে'-র কাহিনী এই রকম — রাজা রামচন্দ্র মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে খাজনা দিতে গেলে নবাব তাঁকে বন্দী করেন। রাজার মেয়ে রূপবতীর সঙ্গে নবাবের বিবাহ দিতে হবে, অন্যথায় কারাগারবাস। এমতাবস্থায় বিবাহের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে রাজা রামচন্দ্র মুক্তি লাভ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে রানী শীঘ্রই রাজকর্মচারী মদনের সঙ্গে রূপবতীর বিবাহ দেন। দরিদ্র মাঝি কানা চৈতার নৌকায় চেপে নবদম্পতি মদন ও রূপবতী পালিয়ে যায়। তারপর কাঙ্গালিয়া ও পুণাইয়ের গৃহে সন্তানস্নেহে আশ্রয় পায়। কাঙ্গালিয়ার ছেলে জঙ্গলিয়া কাজীর কাছে টাকা খেয়ে রূপবতীকে ধরিয়ে দিতে চাইলে কাঙ্গালিয়া আত্মজ জঙ্গলিয়াকে হত্যা করে আশ্রিতদের রক্ষা করে। কিছুদিন বাদে মদন রূপবতীর পিতামাতাকে দেখতে গেলে রাজকর্মচারী পীতাম্বর মদনকে বন্দী করে। খবর পেয়ে পুণাই, কাঙ্গালিয়া, চৈতা এবং তার আত্মীয়স্বজনেরা রাজদরবারে ছুটে আসে। বিচারের সময় গোটা রাজ্যের লোক রাজপ্রাসাদে সমবেত হয়। অতঃপর নবাব মদনকে মুক্তি দেন।

সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূরীকরণে ব্রজেন্দ্রকুমার প্রায় সারাজীবন কাজ করেছেন। 'চাঁদের মেয়ে' (১৯৩৬) থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিম যাত্রাপালা 'পরাজিত মেঘনাদ' (১৯৭৬) পর্যন্ত অসংখ্য পালানাটক রচনা করে তিনি এই সামাজিক সমস্যা অবসানের চেষ্টা করেছেন। তবে এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সর্বব্যাপী বলে ব্রজেন্দ্রকুমার কখনোই স্বীকার করেন নি। 'চাঁদের মেয়ে' পালার শেষ দৃশ্যে আলেয়ার সংলাপের ন্যায় তিনি এই পালায় দরিয়ার মুখে একটি সংলাপ প্রদান করেছেন, যার মধ্যে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের আবহমানকালের সম্প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে—

দরিয়া ।। এখানে হিন্দুরা পুজো করে, মুসলমানেরা প্রসাদ খায়, মুসলমানের মসজিদ ওঠে, হিন্দুরা চাঁদা দেয়। হিন্দুর মাথায় মুসলমান যদি লাঠি তোলে মুসলমান পড়শীরাই তার কলজেটা আগে কামড়ে ধরে।

এ পালায় জয়চন্দ্র, পীতাম্বরের মতো নিন্দনীয় চরিত্র যেমন আছে তেমন আছে কাঙ্গালিয়া, পুণাইয়ের মতো প্রশংসনীয় মহৎ চরিত্র। কাঙ্গালিয়ার ছেলে জঙ্গলিয়া পুরস্কারের লোভে রূপবতীকে কাজীর হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কাঙ্গালিয়া নিজহাতে জঙ্গলিয়াকে হত্যা করে আশ্রিতাকে রক্ষা করে। হত্যা পরবর্তী পিতা-মাতার সংলাপ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী —

কাঙ্গালিয়া ।। আমি তাকে কেটে ফেলেছি পুণাই। সে শান্তির (কাঙ্গালিয়ার আশ্রয়ে থাকাকালীন রূপবতীর শান্তি নাম রাখা হয়েছিল) হাত ধরেছিল, টাকা খেয়ে বুনকে কাজীর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিল।

পুণাই ।। ভালোই করেছো।

কাঙ্গালিয়া ।। তবে আয়, আমরা চোখের জল মুছে ফেলি। ...

পুণাই ।। হ্যাঁ গা, বাপের হাতে মলে তো আর পাপ থাকে না। মরার পরেও কি তাকে যমদূত মারবে?

কাঙ্গালিয়া ।। দু'জনে ঠাকুরের কাছে মাপ চাই আয়।

সন্তানকে হত্যা করে পিতা-মাতার অনুশোচনাবোধ হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু সন্তানের পারলৌকিক দুশ্চিন্তায় তারা ব্যাকুল। তাদের বিশ্বাস, রূপবতীকে কাজীর হাতে ধরিয়ে দিতে গিয়ে তাদের পুত্র যে পাপ করেছিল, পিতার হাতে মৃত্যুতেই তার সমস্ত পাপ ধুয়ে গেছে।

চৈতা সাধারণ মাঝি হলেও সে নির্ভীক। রাজার রক্তচক্ষুকে সে ভয় পায় না। রাজা জয়চন্দ্র চৈতাকে শাস্তির ভয় দেখালে সে নির্ভয়ে শাস্তিকে উপেক্ষা করে। তার কথায় শুধু নির্ভীকতা নয়, হাস্যরসও ফুটে উঠেছে – " বেশী দেরী করবেন না হুজুর। দেরী হলে ক্ষিধে পাবে, ঘরে কিছু নেই। " দরিয়া চৈতার যোগ্য সহধর্মিনী। তার মুখের সামনে নবাব পর্যন্ত রেহাই পায় না— " আমার যদি মেয়ে থাকতো, আর নবাব যদি তাকে সাদি করতে চাইতো, আমি তো তাকে মেয়ে দিতুম না, দিতুম খ্যারার বাড়ি। " কাঙ্গালিয়া এবং পুণাই দম্পতি এ পালার প্রতিবাদী চরিত্র। তারা রূপবতী এবং মদনকে আশ্রয় দিয়ে অপরাধ করেছে, নবাবের একথার উত্তরে পুণাই বলেছে— "বেশ করেছি", কাঙ্গালিয়া বলেছে – "ফাঁক পেলে আবারও তাই করবো।"

বীর, করুণ ও বাৎসল্য রসের সমন্বয়ে মিলনাত্মক এই পালাটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনয়নের লক্ষ্যে এক সার্থক সংযোজন। এই পালাভিনয়কালে আসরে যাত্রাপ্রেমী মনুষের ঢল নামতে দেখা যেত।

ধর্মের বলি (১৯৫২) — ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত একখানি জনপ্রিয় ঐতিহাসিক যাত্রাপালা। নির্মল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, থেকে পালাটি প্রকাশিত হয়। কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ পেশাদার যাত্রাদল আর্য অপেরা পালানাটকটি প্রথম অভিনয় করে। পরবর্তীকালে ক্যালকাটা অপেরাও এ পালাভিনয় করে। ১৭৫ পৃষ্ঠার নাটকটির মূল্য স্থির করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ টাকা। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ রবিবার কুচবিহারে আর্য অপেরা এই পালাখানি প্রথম আসরে রূপদান করেছিল।

নাটকখানির ভূমিকায় পালাকার বলেছেন, ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য, সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির কারণে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে ঘটেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের মৃত্যু, পিতার হাতে পুত্রের হত্যা। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজও আমাদের সমাজে মিশে আছে। মানবতার শত্রু সেইসব ধর্মান্ধ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিদের ইতিহাস থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন —

> "বাঙালী নাটকের পর 'ধর্মের বলি' -তে আর একবার দেখিলাম দেশের সাধারণ মানুষ ধর্মের বিভেদ সত্ত্বেও গলাগলি করিয়া বাস করিতে চায়। উচ্চ আসনে আসীন

মহারথীরা যখন ধর্ম বিপন্ন বলিয়া জিগির তোলে বিপদ আসে তখনই। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত সহকর্মীকে যাহারা মুখের সহানুভূতি জানায় না, শান্তির সময় তাহারাই সহধর্মীর কল্পিত দুঃখে কাঁদে। মানবতার শত্রু এইসব অবাঞ্ছিত দরদীর ধর্মান্ধতার ফলে বহু মূল্যবান জীবন অকালে বিনষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের শিক্ষা কবে ইহারা গ্রহণ করিবে? শান্তি আর কত দূরে?" ২৫

এই নাটকে মোট ২২টি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এরমধ্যে নারী চরিত্রের সংখ্যা ৫, এছাড়া আছে গণের চরিত্র - বাঈজী ও নর্তকীর।

পঞ্চাঙ্ক এই পালানাটকের প্রথমাঙ্কে আছে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয়াঙ্কে অবতারণা করা হয়েছে তিনটি দৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে প্রদর্শিত হয়েছে পাঁচটি দৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে দেখানো হয়েছে তিনটি দৃশ্য এবং পঞ্চমাঙ্কে উপস্থাপিত হয়েছে একটি দৃশ্য।

ব্রজেন্দ্রকুমারের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক ঐতিহাসিক পালা 'ধর্মের বলি' আলোচনার পূর্বে আমাদের অবগত হতে হয়, তিনি এই পালা রচনার প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে? এ সম্পর্কে আমরা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তরুণকুমার দে মহাশয়ের রচনা থেকে জানতে পারি ——

" ব্রজেন্দ্রকুমার ছিলেন পূর্ববঙ্গের সন্তান। ফরিদপুর জেলার এক গন্ডগ্রামের অতি দরিদ্র এক পরিবারে তাঁর জন্ম। কৈশোরে তিনি শিক্ষার তাগিদে এসেছিলেন কলকাতায়। তারপর কর্ম জীবনে প্রবেশ করে সাত বছর কাটিয়েছিলেন হাওড়া জেলার বাইনান গ্রামে। এরপর আট বছরের জন্য ফিরে এসেছিলেন পূর্ববঙ্গের কার্তিকপুর গ্রামে। ফলতঃ দুই বঙ্গের মানুষের সঙ্গেই তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ঘটেছিল। দেশবিভাগের সামান্য আগেই তিনি চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। তাঁর চোখের সামনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং তাঁর এক ভগ্নীপতি ঐ দাঙ্গায় নৃশংসভাবে নিহত হন। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর নিবিড় সংস্পর্শে এসেছে — ছাত্র হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে। স্বভাবতঃই এই ভয়াবহ দাঙ্গা তাঁর চোখে অশ্রু বইয়েছে, মনে জাগিয়েছে ক্রোধ। সেই জন্যই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন বারবার তাঁর 'বাঙালী', 'ধর্মের বলি', 'স্নেহের জয়', 'কাঁটার বাসর', 'সোনার বাঙলা', 'দুধ সায়রের দেশে' পালার মধ্য দিয়ে। " ২৬

সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হয়ে ব্রজেন্দ্রকুমারকে চিরতরে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করতে হলেও পূর্ববঙ্গের স্মৃতি তাঁর মনে কখনও ধূসর হয়ে যায় নি। তারই ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে 'উজানীর চর', 'ধর্মের বলি' -র মতো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পালা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পালা।

ব্রজেন্দ্রকুমারের এই পালায় দেখা যায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার জন্য দায়ী হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের গোঁড়ামি, অস্পৃশ্যতা এবং অযৌক্তিক ব্যবহার। পরধর্ম বিদ্বেষের কারণে এক মুসলমান ফকির হিন্দু দেববিগ্রহের নয়ণ লাঠির আঘাতে ভেঙে দেয়। তার

বক্তব্য, হিন্দুদের দেব-দেবীর বিগ্রহ খড়মাটি পুতুল ছাড়া কিছু নয়, হিন্দু দেবতার কোন অস্তিত্ব নেই। একমাত্র আল্লাতালাই সত্য। আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়। অন্যদিকে খঞ্জন মিশ্র নামে গোঁড়া ব্রাহ্মণ মুসলমানদের অস্পৃশ্য রূপে দেখে দাঙ্গায় ইন্ধন যোগায়। হিন্দুদের মধ্যেও বর্ণভেদ এবং যাত্যাভিমান লক্ষিত হয়। উচ্চবর্ণের লোক তথা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিম্নবর্ণের মানুষ তথা নমশূদ্রদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে, তাদের অস্পৃশ্য বলে মনে করে। কৌলীন্যের গর্বে খঞ্জনের স্ত্রী স্বামীকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে। মুর্শিদকুলি খাঁর মতো হিন্দুবিদ্বেষী নবাবকে পেয়ে মৌলবাদী মুসলমান ফকিরের বেশ সুবিধা হয়। কেশরী রায় হিন্দু হয়েও বজ্রনারায়ণের প্রতি প্রতিশোধ নিতে হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে যায়। এ পালার প্রতিবাদী চরিত্র ফরিদ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু পিতা মুর্শিদকুলি খাঁর ভুলের মাশুল গুণতে হয় তাঁকে। বজ্রনারায়ণ ও ফরিদ দুই ভাই মোল্লা-মৌলবী, ফকির, গোঁড়া ব্রাহ্মণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত 'ধর্মের বলি' হয়।

এই নাটকে ফকির যেমন হিন্দু বিগ্রহের চোখ লাঠির আঘাতে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনা ব্রজেন্দ্রকুমার নিজে একবার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তখন তিনি পূর্ববঙ্গে ছিলেন। এক মুসলমান জমিদার শীতলা মায়ের মূর্তি পিস্তলের গুলিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। ব্রজেন্দ্রপুত্র তরুণকুমার দে-র রচনা থেকে জানা যায় —

> " দুর্ভিক্ষের কিছু আগে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল মুচিপাড়ায়। অনেক চেষ্টা করেও তারা পুকুর বা নালার নোংরা সাফ করতে বা ব্লিচিং পাউডার ছেটানোর ব্যবস্থা করাতে পারে নি। তাই সবাই মিলে ঠিক করল বসন্তের দেবী শীতলার পুজো করবে। জমিদার মুসলমান। তিনি চাঁদা দিলেন না। তবে আমন্ত্রণের উত্তরে জানালেন, তিনি অবশ্যই হাজির হবেন পূজামণ্ডপে।"
>
> নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে পূজামণ্ডপে হাজির হলেন জমিদার। শত শত হিন্দু - মুসলমান ভক্তের সামনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন পুরোহিতকে, —এ মাটির মূর্তি কি সত্যই দেবী?
>
> আজন্ম লালিত বিশ্বাসে পুরোহিত জোর দিয়ে বললেন —হ্যাঁ।
>
> দাম্ভিক জমিদার বললেন — বেশ, তাহলে পরীক্ষা করা যাক্। বলেই তিনি পকেট থেকে পিস্তল বার করে শীতলা মূর্তির ডান চোখ লক্ষ্য করে গুলি করলেন।
>
> "পুজো বন্ধ হয়ে গেল। মুচিপাড়ার হিন্দু-মুসলমান সবাই জমিদারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেল।" ২৭

বলাবাহুল্য, হেডমাস্টার ব্রজেন্দ্রকুমার সেদিন নীরব থাকেন নি, জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। এই ঘটনার পরে তিনি পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নাটকটির সূচনায় দেখা যায়, জ্ঞানদাস সুদর্শনের স্ত্রী মরালীকে আশীর্বাদ করার সময় বলছেন — " একটা কথা মনে রাখিস মা, যিনি ঈশ্বর তিনিই আল্লা। " — ঈশ্বর এবং আল্লা সম্বন্ধীয় এরূপ অভেদাত্মক বাণী বলে তিনি আরও বললেন, 'সংসারে ঝড় আসছে বেটি'। সত্যি একদিন ঝড় এল। দর্পনারায়ণের পুত্র সুদর্শন আলমগীরের রাজসভা থেকে ফিরে এলো জাতি ধর্ম

বিসর্জন দিয়ে। তারা তাকে জোর করে কলমা পড়ে, কোরাণ স্পর্শ করে, গোমাংস ভক্ষণ করিয়ে মুসলমান করে নেয়। পুরস্কার স্বরূপ আলমগীর তাকে দেয় দেওয়ানীর পদ। বিধর্মী পুত্রকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দর্পনারায়ণ এবং সুদর্শনের স্ত্রী কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। তাঁরা তাকে পরিত্যাগ করে পথে নামলেন। কিন্তু সুদর্শনের পুত্র নিষ্পাপ খোকন কিছুতেই বুঝতে পারল না কোথা দিয়ে জাত গেল, জাত গিয়ে পিতা কি হারাল।

খোকন ।। হ্যাঁ বাবা, সত্যি তোমার জাত গেছে? কই দেখছি না তো। আগেও তুমি যা ছিলে এখন তাই, তবে কিসে জাত গেল? (সূচনা)

সুদর্শনের বৃদ্ধ পিতা পথেই পতিত হলেন এবং তার স্ত্রী নিলেন বৈধব্য। সুদর্শন হলেন পুরোপুরি মুসলমান — মুর্শিদকুলি খাঁ। এর পর ২৫ বছর কেটে গেছে। সুদর্শনের ছোট্ট পুত্র খোকন বড় হয়েছে। নারায়ণগড়ের রাজা হয়েছে সে। নাম হয়েছে বজ্রনারায়ণ। আর সুদর্শন হয়েছেন বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ।

সহসা নাটকের গতি বৃদ্ধি পায় এক গোঁড়া মুসলমান ফকিরের দুষ্কর্মের জন্য। রাজা বজ্রনারায়ণের কাছে পুরোহিত খঞ্জন মিশ্র উক্ত ফকির সম্পর্কে বললেন —

খঞ্জন ।। বলে, — এত পয়সা খরচ করে ভূত পুজো কচ্ছ কেন? তোমাদের ঠাকুরের যদি প্রাণ থাকে, করুক দেখি আমায় কি করতে পারে। এই কথা বলেই অকস্মাৎ ঠাকুরের ডান চোখটার উপর সজোরে লাঠিটা বিঁধিয়ে দিল।

প্রজাদের মুখে দেবমূর্তির হেনস্থার কথা শুনে বজ্রনারায়ণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন —

বজ্র ।। এরা ভেবেছে কি? দেশটা শুধু মুসলমানেরই, হিন্দুর কি এতে কোন দাবি নেই? নবাব বাদশা মুসলমান বলে এরা যা খুশি করবে, আর আমরা শুধু তাই মুখ বুজে সহ্য করব? এদের খেয়াল খুশির জন্য হিন্দুরা মন্দির গড়বে না, উৎসবে অনুষ্ঠানে বাজনা বাজাবে না, পিতৃ-পিতামহের আচার অনুষ্ঠান সব বিসর্জন দিতে হবে? আমি এই ফকিরকে চরম শিক্ষা দেব। (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

নাটকের গতিতে আরও বেগ সঞ্চারিত হয় যখন এই দুষ্টু ফকির নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দরবারে গিয়ে ঘটনার মিথ্যা বিবরণ দিয়ে বজ্রনারায়ণের হাতে তার হেনস্থার কথা, শাস্তি পাবার কথা বলেন। তাকে সমর্থন জানায় হিন্দুর আসল শত্রু কেশরী রায় — নবাবের পোষা কর্মচারী এবং হিন্দুধর্মত্যাগী নাজির আহম্মদ। সব শুনে হিন্দুবিদ্বেষী নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ আক্রোশে ফেটে পড়েন।

মুর্শিদ ।। ইসলাম - ইসলাম, মুর্শিদকুলি খাঁ যশ চায় না, মান চায় না, চায় শুধু ইসলামের অভ্যুদয়। যে কেউ আমার সাধনার পথে এসে দাঁড়াবে, তার ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারবে না। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

নবাবকে চিনতে অসুবিধা হয় না পুত্র ফরিদের। নবাবের পুত্র হলেও ফরিদ ভিন্ন প্রকৃতির। সে ইসলাম ধর্মকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু অন্যের ধর্মকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করে নয়। সে পিতাকে বলে—

ফরিদ ।। ইসলাম ধর্মকে আপনি আর কতটুকু ভালোবাসেন? আমি ভালোবাসি তার সহস্রগুণ। আপনার ইসলাম প্রীতি গজিয়ে উঠেছে হিন্দুবিদ্বেষের বীজ থেকে। আমার তা নয় পিতা। আমি খোদাকে বাসি ভালো, ভগবানকে করি শ্রদ্ধা। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

ফরিদের ধর্মভাবনা পিতার থেকে স্বতন্ত্র। সে বিশ্বাস করে, ভগবানকে ঘৃণা করে, তাকে তাচ্ছিল্য করে আল্লাতালার করুণা লাভ করা অসম্ভব। তাই পিতাকে সে ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা নেবার কথা বলেছে।

ফরিদ ।। ... হাজার হাজার মন্দির ভেঙে আপনি মসজিদ বানিয়েছেন। ইতিহাস খুঁজে দেখুন, কোন হিন্দু রাজা মসজিদ ভেঙে মন্দির তৈরী করেন নি। আপনি জানেন না মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের উপর যে মসজিদ গড়ে ওঠে, তারমধ্যে ভগবানের নিঃশ্বাস আছে, খোদার করুণা নেই। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

মুর্শিদকুলি আজ পুত্রকে তাঁর অতীত জীবনের না-বলা চরম সত্য কথাগুলো জানান। তিনি আরও জানান তাঁর হিন্দুবিদ্বেষের জন্য মূলতঃ হিন্দুরাই দায়ী।

মুর্শিদ ।। ... বাধ্য হয়েই আমি একদিন ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলুম, হিন্দুসমাজে ফিরে আসতেই চেয়েছিলুম। পিতাকে কত অনুরোধ করেছি, স্ত্রীর কাছে কত কাকুতি-মিনতি জানিয়েছি। কেউ গ্রাহ্য করেনি। এত যারা আপন ছিল, হিন্দুসমাজের অনুশাসনে এক মুহূর্তে তারা সব পর হয়ে গেল। আমার শিশুপুত্রকে নিয়ে তারা সেই দণ্ডেই আমার গৃহত্যাগ করলে। অসহায় রুগ্ন পিতা অনাথের মত রাজপথে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে, আমায় স্পর্শ করতে দিলে না। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

ওদিকে মরালী, মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্বের স্ত্রী এতদিনে বুঝেছে সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু, ধর্ম নিয়ে তত ভাবে না তারা। তাদের পরিচালিত করে, ক্ষেপিয়ে দেয় সমাজপতিরা। পুত্র বজ্রনারায়ণ ফকির ছিন্নকারী চাষীদের চাবুক মারতে উদ্যত হলে তিনি তাঁর আত্মোপলব্ধির কথা বলেন ——

মরালী ।। এমন কাজ করো না বজ্রনারায়ণ। সাধারণ চাষীদের বুদ্ধি নেই, ধর্মের নামে মোড়ল তাদের ক্ষেপিয়েছে। সমাজপতিরা চিরদিনই এমনি করে ধর্মের নামে অজ্ঞ লোকদের তাতিয়ে তোলে। তারা যখন মার খায়, গুলি খেয়ে মরে, সমাজপতিরা তখন নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

মরালী আরও বলেন —" বাবা ধর্ম যখন আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে, তখন ভক্তিও থাকে না, যুক্তিও থাকে না। " (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

এই বোধই তাঁকে এই সত্য বলেছে যে, তিনি ধর্মের শিকার, ধর্মের বলি হয়েছেন।

মরালী ।। শ্মশানে যখন তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হোল, চেয়ে দেখি একধারে নিশ্চল হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, চোখে তাঁর শ্রাবণের ধারা বইছে। সে কি করুণ, সে কি মর্মস্পর্শী। আজ মনে হচ্ছে, তাঁর কোন দোষ ছিল না। সমাজের চেয়ে মানুষের দাম অনেক বেশী। (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

মুর্শিদকুলি খাঁ পুত্র ফরিদকে পাঠায় বজ্রনারায়ণকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় তাঁর পদতলে হাজির করতে। ফরিদ পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে রওনা দেয়। সেখানে সে ছদ্মবেশে ফকিরের সঙ্গে কথা বলে এই সত্য জানতে পারে যে, রাজার লোক মর্দানি খাঁ তাকে প্রহার করে নি, ঠাকুরের ডান চোখ লাঠির ঘায়ে ভেঙে দিয়েছিল বলে তাকে মন্দির থেকে বের করে দিয়েছিল। বৃদ্ধ চাষীর ছদ্মবেশে তারপর ফরিদ গেল চাষীদের কাছে। চাষীরা কেন ফকিরকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তার উত্তরে চাষীরা বলে —

১ম চাষী ।। হঠাৎ শুনলুম যে, ফকিরকে শুধু শুধু এরা মেরে হাড় গুড়ো করে দিয়েছে। একে দুপুরবেলা, তার উপর ফকিরের বেইজ্জতির কথা শুনে আমরা জ্ঞান হারিয়েছিলুম মিঞা। এখন দেখছি সবই মিথ্যে। (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

নবাবপুত্র ফরিদ এটাও জানতে পারে যে, উভয় সম্প্রদায়েরই কিছু স্বার্থান্বেষী গোঁড়া লোক ধর্মীয় জিগির তুলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে –

নাজির ।। ছলে বলে কৌশলে হিন্দুর সর্বনাশ করাই হচ্ছে পুণ্যের কাজ – একথা স্পষ্ট হাদিসে লেখা আছে। (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

মাতঙ্গিনী ।। এ যে নমঃশূদ্দুর। যাও, বেরোও, — এক্ষুনি বেরোও।

খঞ্জন ।। মারব বেটাকে খড়মের বাড়ি। আমি কি তোদের নমঃশূদ্র জাত যে চৌকিদারীর আশায় সগুষ্টি মিলে মসজিদে কলমা পড়ে টুপি মাথায় দিয়ে ঘরে আসব? আমি খঞ্জন মিশ্র ব্রাহ্মণ সন্তান।

খঞ্জন ।। তুই বেরো শূয়ার, আমি উঠানে গোবর ছড়া দেব। (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

ফরিদ ।। আমি সেই মুসলমান তরকারীওয়ালা। আমিই তোমার ঘরে জল চেয়ে পাই নি। আমাকে ছুঁয়েই তোমার জাত গেছে ঠাকুর। (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

এই সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবিদ্বেষ ফরিদের একান্ত অনভিপ্রেত। তাই সে বলে –

ফরিদ ।। শোন নাজির আহম্মদ, শুনুন রাজা বজ্রনারায়ণ, আমি সব জেনেশুনেই বিচার শালায় এসেছি। পুতুল পুজো আমি কখনও করি না সত্য, কিন্তু যে করে তাকে বাধা দেবার অধিকার আমার নেই। আপনি ঠিক বলেছেন রাজা, আমার কাছে যে পুতুল, আপনার কাছে সে অমূল্য সম্পদ। আপনার ঘরে এসে আপনার দেবতাকে যে অঙ্গহীন করেছে, তার কসুর আমি মাপ করতে পারব না। (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

অতঃপর নবাব পুত্র ফরিদ খাঁ সুবিচারক হিসাবে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ফকিরের একটি চোখ উপড়িয়ে নেবার আদেশ দেন। ফকির তখন তার ফকিরির কথা বললে ফরিদ খাঁ ধর্মের আসল ব্যাখ্যা তাদের সামনে তুলে ধরেন।

ফরিদ ।। ... ফকিরের পোশাক পরলেই ফকির হয় না। পৈতে গলায় দিলেই বামুন হয় না। ফকির হবে আকাশের মত উদার, পৃথিবীর মত সহিষ্ণু, নিজের ধর্মকে সে ভালবাসবে সত্য, কিন্তু পরের ধর্মকেও ঘৃণা করবে না। তুমি যা করেছ, তাতে ইসলামের অগ্রগতি

এই বাংলাদেশে দশ বছর পিছিয়ে গেছে। (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

" মানুষকে ছুঁলে যার জাত যায়, তাকে লোকালয়ে রাখা চলে না " বলে অস্পৃশ্যতাবাদী খঞ্জন মিশ্রকেও তিনি শাস্তি দেন, হিন্দু মৌলবাদী মোড়লও রেহাই পান না নবাবপুত্র ফরিদ খাঁর বিচারে, তাকেও শাস্তি দেওয়া হয়।

কিন্তু তারপরেই নবাবের হিন্দুবিদ্বেষী কর্মচারী নাজির আহম্মদ ও কেশরী রায় ষড়যন্ত্র করে ফরিদ খাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু এ হেন মানবদরদী ফরিদ খাঁকে বাঁচাতে কোন মুসলমান ছুটে আসে না, তাঁকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে চতুর্মুখ নামে একজন নির্ভীক ব্রাহ্মণ। কালবিলম্ব না করে মর্দান খাঁ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে ছুটে যায়। মর্দান খাঁ নবাবকে একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত জানায়। তৎক্ষণাৎ মুর্শিদকুলি খাঁ বিপদগ্রস্ত পুত্রকে বাঁচাতে ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। তাঁর পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর দুই পুত্র ফরিদ এবং বজ্রনারায়ণ দুজনেই 'ধর্মের বলি' হয়েছে। নাট্যঘটনা এখানেই সমাপ্ত হয়েছে।

ক্ষেত্রগবেষণা এবং সাক্ষাৎকারে জানা যায়, ফরিদ খাঁর ভূমিকায় ছোট ফণীবাবু (ফণী মতিলাল) -র অভিনয় দর্শকমন জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৬১ সালে শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রথম যাত্রা উৎসবে ক্যালকাটা অপেরা প্রযোজিত 'ধর্মের বলি' পালায় ছোট ফণীর ফরিদ খাঁ জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে স্যাটায়ার, উইট ও হিউমারের মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছিলেন।

জ্ঞানদাস এই নাটকে বিবেক হলেও একজন ক্রিয়াশীল নাট্যচরিত্র। তার কাছে যিনি আল্লা তিনিই নারায়ণ। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমান ফকিরের অন্তরে শুভবুদ্ধি জাগরণের জন্য সে গায় ——

" আল্লা হরি রাম রহিমে কোন প্রভেদ নেই।
সবার উপরে মানুষ সত্য শোনরে মানুষ ভাই ।।
আকাশ বায়ু চন্দ্রতারায়, পশুপাখি নদীর ধারায়,
এই একই নিত্য বাজে আল্লা হরি সকল ঠাঁই।। " (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

চণ্ডীদাস প্রভাবিত এই গীতের মাধ্যমে জ্ঞানদাস ফকিরের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করতে চেয়েছিল। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। হিন্দুবিদ্বেষী ফকির উল্টে তাকেই যষ্ঠীঘাতে জর্জরিত করে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'বাঙালী' এবং 'ধর্মের বলি' যাত্রাপালা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করায় সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উপজীব্য করে অন্যান্য পালাকারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক পালারচনার ঢেউ উঠেছিল। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন 'টিপু সুলতান' বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "বীরাঙ্গনা পাল"। নন্দগোপাল রায়চৌধুরী এই ধারায় সংযোজন ঘটিয়েছিলেন 'মিলন সেতু' যাত্রাপালা। কানাই নাথ তাঁর 'আহ্বান' নাটকের মধ্যদিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বাণী প্রচার করলেন। অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় সৃষ্টি করলেন 'রঘু ডাকাত', প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচনা করলেন 'মসনদ কার'। এক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালা অন্যান্য যাত্রাপালাকারদের উপর যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

লোকশিক্ষার অন্যতম বাহন হল যাত্রাগান। আগে লোকে যাত্রা শুনে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিজেরাই মীমাংসা করে নিত। এমন কি, যাত্রাগানের প্রভাবে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আদালত থেকে মামলা তুলে নিতেও দেখা গেছে। আজও আমাদের সমাজে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা বিরাজ করছে। যাত্রাগান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার কথা পালাকার এ পালার ভূমিকায় বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভবতোষ চক্রবর্তীর অভিমত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ——

> " নাটকের মধ্যে যেসব গুণ অথবা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, যাত্রার মধ্যে সেসব গুণ রয়েছে। কাজেই যাত্রাভিনয়কে তুচ্ছ মনে করলে চলবে না। যাত্রার মধ্যে অদ্ভুত এক শক্তি লুকিয়ে রয়েছে– যে শক্তি সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ভেদাভেদ, রেষারেষি সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠিয়ে ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে পারে, প্রেক্ষাগারের সৌখিন থিয়েটারের পক্ষে যা সম্ভব নয়। " ২৮

উপরের উদ্ধৃতি অনুসারে আমরা একথা বলতে পারি, ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক, দেশাত্মবোধক যাত্রাপালাগুলি ভারতবাসীর চরিত্র গঠনে এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং সাম্প্রতিককালেও সামাজিক অবক্ষয় দূর করতে কার্য্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

অসাধারণ লোকপ্রিয় বিয়োগান্তক এই পালানাটকে বীররস, করুণরস ও ভক্তিরসের প্রাধান্য ঘটেছে।

সোনাইদীঘি (১৯৫৯) — যাত্রাপালাখানি কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী প্রকাশ করেছিল। কলকাতার বিখ্যাত যাত্রাদল সত্যম্বর অপেরা ১৯৫৯ সালে প্রথম এই পালাভিনয় করে। ১৫১ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানির বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ৩৫ টাকা। এই যাত্রাপালা এতটা দর্শক সমাদর লাভ করেছিল যে, মুদ্রিত গ্রন্থটির হাজার হাজার কপি অতিদ্রুত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এই পালা যে কেবলমাত্র গ্রাম-গঞ্জ, চা বাগিচা অঞ্চল এবং কয়লাখনি এলাকার আসর মাৎ করেছিল তা নয়, সত্যম্বর অপেরা প্রযোজিত পালাখানি বিশ্বরূপা থিয়েটারেও বহুবার হাউসফুল অভিনয় হয়েছিল।

পঞ্চাঙ্ক এই নাটকে স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে মোট ষোলটি চরিত্র আছে। এই যাত্রাপালায় মোট্ট চোদ্দটি গান আছে, সেগুলি সখীদের, বিবেকের এবং একানে ছেলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

ব্রজন্দ্রেকুমার দে বিরচিত অন্যতম সর্বাধিক জনপ্রিয় যাত্রাপালা 'সোনাই দীঘি'। 'সোনাই দীঘি'-র কাহিনী তিনি আহরণ করেছেন মৈমনসিংহ গীতিকা পল্লীগাথা থেকে। কেবলমাত্র সোনাই দীঘিই নয়, মৈমনসিংহ গীতিকা পল্লীগাথা নির্ভর তাঁর একাধিক যাত্রাপালা আছে। সেগুলির নাম ও উৎস – 'সমাজের বলি'(১৯৪৪), উৎস – 'কাঞ্চনমালার কাহিনী'; 'ভাগ্যের বলি' (১৯৫৯) , উৎস – 'কঙ্ক'; 'লোহার জাল'(১৯৬০), উৎস – 'কমলা'; 'সতীর ঘাট'(১৯৬১), উৎস – 'মলুয়া'; 'কবি চন্দ্রাবতী'(১৯৬১), উৎস – 'চন্দ্রাবতী' ও 'কেনারাম - বেচারাম'; 'মহুয়া'(১৯৬১)

, গীতিকা — 'মহুয়া বা বাদ্যানের গান'; 'ঝড়ের দোলা'(১৯৬৮), গীতিকা — 'সখিনা'; 'মগের মুল্লুক'(১৯৭০), গীতিকা — 'সুজাকন্যার কাহিনী'। আমাদের আলোচ্য 'সোনাই দীঘি' পালাখানি 'সোনাই সুন্দরী' বা 'দেওয়ান ভাবনা' নামক মূল গীতিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রতিটি যাত্রাপালাই আসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে এ উত্তর অবিতর্কিত যে, পালাগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনসমাদর লাভ করেছে 'সোনাই দীঘি' পালাখানি। পল্লী বাংলার অগণিত যাত্রাপ্রেমী খেটে-খাওয়া-চাষী-মজুর-মানুষ যাত্রাগুলির ভেতরে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখময় ঘটনাই চরিত্রগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে। আজও গ্রামে-গঞ্জে অ্যামেচার যাত্রাদলগুলি দ্বারা অভিনীত সোনাইদীঘি যাত্রাপালার আসরে মানুষের ঢল নামতে দেখা যায়। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে এ পালার ভূমিকায় বলেছেন —

> " ময়মনসিংহ-গীতিকার অন্তর্গত "সোনাই" নামক প্রাচীন পল্লীগাথার নাট্যরূপ এই 'সোনাই দীঘি'। পল্লীকবির স্বভাব মধুর ভাষায় যে কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে, আমার অক্ষম লেখনী হয়ত তাহার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু কোহিনূরের আধখানা ভাঙ্গিয়া গেলেও তার জৌলুষ মানুষের চোখ ধাঁধাইয়া দেয়।" ২৯

সোনাইদীঘি যাত্রাপালার ভূমিকায় ঘোষিত অক্ষমতার উল্লেখে পালাকারের মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কথা সত্য যে, গীতিকাগুলির সুখপাঠ্য মধুর কাহিনীগুলি যখন যাত্রাপালারূপে আসরে পরিবেশিত হয়, তখন যাত্রানুরাগী দর্শকেরা আপন স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পালার পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। যাত্রাপালার চরিত্রদের অভিনয়ে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি দর্শকের চোখে ধরাই পড়ে না। সেকারণে গীতিকা - কাহিনী নির্ভর যাত্রাপালাগুলি সহজেই জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে শীর্ষস্থানে পৌছে যায়।

গীতিকার কাহিনী — গীতিকার নায়িকা সুনাই দশ বছরে পড়লে সে তার বাবাকে হারায়। তখন সুনাইয়ের মা বাপমরা অনাথ মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে তার নিঃসন্তান ভাই ভাটুকের আশ্রয়ে গিয়ে ওঠে। দিনে দিনে মেয়ে একাদশীতে উপনীত হয়। সুনাই হয়ে ওঠে অপরূপা সুন্দরী। ঘর আলো করা মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য ঘটক নিয়োজিত হয়। ইত্যবসরে সুনাইকে দেখে মাধব নামে এক যুবক মুগ্ধ হয়। মাধব তার অনুরাগের কথা জানিয়ে সুনাইকে পত্র পাঠায়। সুনাই মাধবের অনুরাগের ছোঁয়ায় ধরা দিয়ে মাধবের পত্রের ইতিবাচক প্রত্যুত্তর দেয়। দু'জনে যখন পরস্পরের প্রেমে মগ্ন তখন বাঘরা নামে এক লোভী বদমায়েশ লোক ভাবনা কাজীর কাছে সুনাইয়ের রূপ যৌবনের কথা জানায়। লালসায় মত্ত নারীলোলুপ ভাবনা তখনই ভাটুকের কাছে সুনাইয়ের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। অর্থলোভী ভাটুক ভাগ্নীর ভাবনা না ভেবে ভাবনার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যায়।

বিবাহের গোপন দিনক্ষণ জানতে পেরে কালবিলম্ব না করে সুনাই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে তার প্রেমিক পুরুষ মাধবকে পত্র পাঠায়। অতঃপর তারা পলায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই মতো মাধব সুনাইকে নদীর ঘাটে অপেক্ষা করতে বলে। মাধবের কথা মতো সুনাই নদীর ঘাটে উপস্থিত হলে ভাবনার লোকজন এবং মাঝিরা সুনাইকে বলপূর্বক নৌকায় তুলে নেয়। কিন্তু

সুনাইয়ের কান্না এবং চিৎকার শুনে গীতিকার নায়ক মাধব মাঝিদের হত্যা করে তার প্রেমিকা সুনাইকে উদ্ধার করে। মাধব-সুনাই আর দেরি না করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

ভাবনার গ্রাস থেকে সুনাইকে ছিনিয়ে নেওয়ায় ক্রূর ভাবনা কাজী ফন্দি করে মাধবের বাবাকে বন্দী করে। বাবাকে উদ্ধারের চেষ্টায় মাধবকে তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে হয়। হতভাগিনী সুনাই কেঁদে বুক ভাসায়। আপন বন্দীত্বের মূল্যে মাধব তার পিতাকে মুক্ত করে। শ্বশুরের নির্দেশে স্বামীকে কারামুক্ত করতে সুনাইকে প্রবেশ করতে হয় নারীলোলুপ হিংস্র ভাবনার খাঁচায়। কিন্তু ভাবনা সুনাইকে পায় না, পায় সুনাইয়ের মৃত দেহ। আপন সতীত্ব রক্ষার্থে সুনাই বিষপানে আত্মহত্যা করে। সুনাইয়ের জীবনের অশ্রুসিক্ত বেদনাময় ট্রাজিক কাহিনী সমাপ্ত হয়।

গীতিকার কাহিনী অবলম্বন করলেও ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর রূপায়িত "সোনাই দীঘি" যাত্রাপালায় কিছু সংযোজন এবং পরিমার্জন করেছেন। মূল গীতিকায় মাধব সোনাইকে উদ্ধার করেছে। পরে নিজ বন্দীত্বের মূল্যে পিতাকে ভাবনার কয়েদ থেকে মুক্ত করেছে। যাত্রাপালায় মাধব এখানেই থেমে থাকে নি, নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদ জানাতে পৌঁছে গেছে নবাব হোসেন শার দরবারে। গীতিকায় ভাটুক লোভী যাত্রাপালায় তেজস্বী প্রতিবাদী পুরুষ দরিদ্র হলেও সে নির্লোভ। সুনাইয়ের মামী গীতিকায় অনুপস্থিত। যাত্রাপালায় আবির্ভূত হয়ে সে সুনাইকে গালমন্দ করেছে ঠিকই, কিন্তু ভালোবেসেছেও সে মাতৃস্নেহে। সে প্রতিবাদী।

পালার নায়িকা সোনাইয়ের জীবন যেমন ঘটনা বহুল, তেমন বেদনাময়। তার ব্যথায় দর্শকশ্রোতা অশ্রুসিক্ত বেদনাবিদ্ধ হয়। পিতাকে হারিয়ে পরান্ন-পালিতা সোনাই মামীর বোঝা হয়ে যায়। শত লাঞ্ছনা সহ্য করেও সে মামীর বিরক্তির কারণ হতে চায় না, মামীর মন বুঝে চলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য কিছুতেই সে মামীর ভালোবাসা অর্জন করতে পারে না। এর উপর আছে তার আসল শত্রু — নিজের রূপযৌবন। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'। আর তাতেই ভাবনা কাজী তার শত্রু হয়ে উপস্থিত হয়। একদিন সে গরু খুঁজতে গিয়ে নেকড়ে স্বরূপ ভাবনা কাজীর দৃষ্টিতে পড়ে যায়। দর্শন মাত্রই ভাবনা কাজীর চক্ষুদ্বয় লালসায় জ্বলে ওঠে। ভাবনা কাজী সোনাইকে সাদির প্রস্তাব জানালে দশ বছর আগেই তার বিবাহ হয়ে গেছে, ভাবনা কাজীকে সে জানায়। ভাবনা কাজী তাকে 'কসবীর বাচ্চা' বলে গালাগাল করলে সোনাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। 'কসবীর বাচ্চা তুমি', 'দু'পেয়ে জানোয়ার' ইত্যাদি কথা বলে ভাবনা কাজীর কথার যোগ্য জবাব দেয়। সে মামীর গলগ্রহ বলে মামী মুক্তকেশী তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। অথচ মামীর হাসিমুখ দেখতে সে বড়ই কাঙাল।

সোনাই ।। লেখাপড়া শিখি নি, কেমন করে কথা বলতে হয়, তাও জানিনা। মামীমা, আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমায় শিখিয়ে দাও, কোন্ ভাষায় কথা বললে তুমি তুষ্ট হও, কি কি কাজ করলে তুমি খুশি হও। তোমার হাসি আমি কখনও দেখি নি। বল, — কি করলে তোমার মুখে হাসি ফুটবে। (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

এত মিনতি সত্ত্বেও, সে তার মামীর মুখে হাসি দেখতে পায় না। শ্বশুর বাড়িতেও তাকে কেতকী মল্লিকার দেওয়া দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। নারীত্বের প্রতি তার মর্যাদাবোধ ছিল প্রখর।

স্বামীর প্রতি ছিল তার অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা। সংসারে পতিপ্রেমে সে বিশেষ ভাগ্যবতী ছিল। তার স্বামী মাধব তাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসত। সেই ভালোবাসাকে সম্বল করে সে হাসিমুখে দুঃখসাগরে পাড়ি দিচ্ছিল। কিন্তু যেদিন সে জানল যে তার স্বামীর জীবন বিপন্ন এবং তার নারীত্ব লাঞ্ছনার দ্বারে উপনীত সেদিন সে বিষপান করে নিজের জীবন স্তব্ধ করে দিল।

এ নাটকে ভিলেন বা খল চরিত্র ভাবনা কাজী। সে বাংলার নবাব হোসেন শা-র দেওয়ান। দেওয়ানীকে হাতিয়ার করে সে হিন্দুনারী সম্ভোগ করে বেড়ায়। এইভাবেই সে নিশাচরের ভগ্নীর সতীত্ব লুণ্ঠন করে। নিশাচর আজও তার ঠিকানাহীন হারিয়ে যাওয়া বোনকে খুঁজে বেড়ায়। ভাবনা কাজীর ভেতরের কামুক লম্পট হিংস্র পশুটা সুন্দরী হিন্দুনারী দেখলেই তার উপর থাবা বসাতে উদ্যত হয়। ভাবনা কাজীর বান্দা আজিম তাকে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে নাবাব হোসেন শাহ-র মহত্ত্বের কথা শোনায়।

আজিম ।। জনাব, নবাব হোসেন শা-র দেওয়ান আপনি, সেই নবাব যাঁর কাছে রাম আর রহিমে ভেদ নেই, যাঁর আশ্রয়ে পশু কবি হয়ে গেল, কত মানুষ সাহিত্যিক বনে গেল, আপনি তাঁরই দেওয়ান — তাঁর রাজত্বে বসে পরনারীর উপর নির্যাতন কচ্ছেন?

(২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

নবাবের দেওয়ান হলেও নবাবের মহত্ত্বে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হয় না ভাবনা কাজী। তাই ছলে-বলে-কৌশলে সে সোনাইকে হস্তগত করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু ভাবনা কাজীর মতো হিংস্র শার্দূলের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেয় মাধব। স্বভাবতই কামার্ত ভাবনার হিংস্রতা বেড়ে যায়। ন্যায়-নীতির পরোয়া না করে 'কান টানলে মাথা আসে' নীতি অনুসারে ভাবনা কাজী মাধবের পিতা প্রতাপরুদ্রকে বন্দী করে। পিতাকে কারামুক্ত করতে এলে অভিসন্ধি অনুসারে ভাবনা মাধবকেও বন্দী করে। স্বামীকে বাঁচাতে এরপরে ছুটে আসে সোনাই। স্বামীকে মুক্ত করে ভাবনার হাতে ধরা দেবার পূর্বে সে বিষপানে আত্মহত্যা করে। এমতাবস্থায়, 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' করতে উপস্থিত হন বঙ্গেশ্বর হোসেন শা। ভাবনা কাজীকে তিনি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেন। দুর্বৃত্ত ভাবনা কাজীর মৃত্যুতে যাত্রার প্রথাগত ঐতিহ্য রক্ষিত হয়।

এই পালার নারীচরিত্র গুলির মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত মুক্তকেশী। পালাসম্রাট এই মুক্তকেশী চরিত্রটিকে সমাজের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে সংগ্রহ করেছেন। 'নুন আনতে পান্তা ফুরানোর' মতো অবস্থা যে পরিবারের, সেই পরিবারে অপ্রত্যাশিতভাবে অবাঞ্ছিত কেউ বরাবরের জন্য আশ্রিতা হলে গৃহিণীর মানসিক অবস্থা যে স্তরে পৌছায়, সেই অবস্থানেই রয়েছে মুক্তকেশী। সোনাইয়ের আগমনে তাই সে খুশি হতে পারে না। খিটখিটে স্বভাবের হয়ে যায় সে। নিঃসন্তান মুক্তকেশী তাই সোনাইকে সহ্য করতে পারে না।

মুক্তকেশী ।। হয়েছে তো দাঁড়িয়ে আছ কেন? গতরে হাওয়া লাগাচ্ছ না কি? গোয়ালঘর পরিষ্কার করবে কে? আমি?

সোনাই ।। পরিষ্কার করেছি।

মুক্তকেশী ।। তবে আর কি? আমায় উদ্ধার করে দিয়েছ। আর যেন কোন কাজ নেই। বলি উঠোন ঝাঁট দিতে হবে না?

সোনাই ।। উঠোন ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে মামীমা।

মুক্তকেশী ।। এই সামান্য কাজ করতে তোমার এতো বেলা হল? বলি পিণ্ডি রাঁধবে কখন?

(১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

পালাকার এ স্থলে চরিত্রানুযায়ী সংক্ষিপ্ত সংলাপ প্রয়োগের দ্বারা মুক্তকেশী চরিত্রটিকে আমাদের সামনে পরিস্ফুট করেছেন।

টাইপ চরিত্র মুক্তকেশী এ পালার সাহসী প্রতিবাদী চরিত্র। ভাবনা কাজী সোনাইয়ের সন্ধানে ভাটুকের গৃহে হাজির হলে শ্রেণীশত্রু দেওয়ানকে দেখে সে এতটুকু ভীত না হয়ে সোনাইকে অপহরণের অপরাধে তাকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হয় —

মুক্তকেশী ।। চোখ পাকাচ্ছ কেন? মুক্ত বামনীর নাম শোন নি? বসো, শুনিয়ে দিচ্ছি। আমার ভাগ্নীকে তুমি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলে, সামনে যখন পেয়েচি, তোমাকে জ্যান্ত কবর দেব।

ভাবনা ।। চোপরাও কসবী।

মুক্তকেশী ।। কসবী তোর মা। দাঁড়া বাঁদীর ব্যাটা, আঁশবটিটা নিয়ে আসছি। দেখি কেমন মরদ তুই, আর কেমন মহাপুরুষ তোর নবাব হোসেন শাহ। (৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

প্রতিবাদী মুক্তকেশী ভাবনা কাজীর লাম্পট্য, নারী নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে নারাজ। পুরুষদের উজ্জীবিত করতে উষ্মার সঙ্গে সে তাদের উদ্দেশ্য বলে —

মুক্তকেশী ।। তোমরা মানুষ, না জানোয়ার?

ভাটুক ।। কেন বল ত।

মুক্তকেশী ।। তোমাদের ঘরের মেয়ে গুলোকে নিয়ে ভাবনা কাজী দিনের পর দিন টানাটানি কচ্ছে, তবু তোমরা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পাচ্ছ? দীঘল হাটিতে এমন হিন্দু কি কেউ নেই যে এই লম্পটের মাথাটা নামিয়ে দিতে পারে?

ভাবনা কাজী ও তার দলবল নারী নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। নারীর সম্ভ্রম এবং মর্যাদা লুণ্ঠিত হতে থাকে পদে পদে। মুসলমানের রাজত্বে সুবিচার প্রার্থনা অরণ্যে রোদন। এই অভিজ্ঞতা ভাটুক ঠাকুরের মর্মে মর্মে হয়েছে। ফলতঃ সংঘবদ্ধ বৃহত্তর আন্দোলনের কথা ভাবছিল ভাটুক। মুক্তকেশীর অনুপ্রেরণা এবং ধিক্কার বাণীতে ভাটুকের অন্তর্নিহীত সংগ্রামী চেতনা প্রজ্জ্বলিত হয়। জীবন-মরণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রাক্কালে ভাটুক তার সহধর্মিনী মুক্তকেশীর কাছে জানতে চায় —

ভাটুক ।। আচ্ছা আমি যদি মরি? তুমি তাহলে কি করবে?

মুক্তকেশী ।। তুমি যেখানে থেমে যাবে, আমি সেখান থেকে শুরু করব। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

এখানেই মুক্তকেশীর উত্তরণ ঘটেছে। সাধারণ গৃহবধূর আবেষ্টনীতে সে আর নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে নি। মুক্তকেশী এখানে হয়ে উঠেছে আধুনিক নারীচেতনা-সঞ্জাত সংগ্রামী প্রতিবাদী

চরিত্র। নারীর এরূপ সংগ্রামী চেতনা থেকেই সম্ভবতঃ মাতঙ্গিনীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। পালার অন্তিম দৃশ্যে সোনাই ভাবনার হাতে ধরা দিয়েছে শুনে মুক্তকেশী তাকে মুক্ত করতে সশস্ত্র সংগ্রামে ভাবনা কাজীর প্রাসাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাবনা কাজীর কবল থেকে মুক্তকেশী সোনাইকে উদ্ধার করে আনে বটে, কিন্তু হিন্দু সতী নারী সোনাই আপন সতীত্ব রক্ষার্থে বিষপান করে পৌছে যায় ধরা ছোঁয়ার নাগালের অনেক দূরে।

মুক্তকেশীর আসল পরিচয় সে মা। মাতৃত্বে তার কোন খাদ নেই। নিরক্ষর মুক্তকেশী তথাকথিত শিক্ষিত লোকের মত সুন্দর করে কথা বলতে পারে না। তার ভাষায় 'ঢঙ' করতে সে অপারগ। শুধুমাত্র ভাগ্নী সোনাই নয়, তার ঝাঁঝালো বাক্যবাণ হতে বাচস্পতি থেকে শুরু করে দেওয়ান ভাবনা কাজী, এমনকি, নবাব হোসেন শাহ্ পর্যন্ত রেহাই পায় নি। তার ভাগ্নী সোনাইকে যারাই অপমান-অসম্মান, চরিত্রহনন বা চরিত্রে কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছে তাদের কাউকেই মুক্তকেশী ছেড়ে কথা বলে নি। হিন্দু সমাজপতি বাচস্পতির সমাজপতিগিরি তিনি ঘুঁচিয়ে ছেড়েছেন।

মুক্তকেশী ।। কুলটা তোমার মা বোন, কুলটা তোমার চোদ্দ পুরুষ। তোমার বিধবা ভাজ কোন্ ব্যামোতে মরেছিল, আমরা জানি নে? (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

গায়ে পড়ে ঝগরা করতে এসেছে বলে বাচস্পতিকে মুক্তকেশী ঝাঁঝালো স্বরে ভর্ৎসনা করে বলেছে —

মুক্তকেশী ।। আমার ভাগ্নীকে মারব আমি, কাটব আমি, তুমি তার খোয়ার করবার কে হে?

মুক্তকেশী বাচস্পতিকে শুধু বাক্যবাণে বিদ্ধ করে নি, তাকে সম্মার্জনী প্রদর্শন করে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে — " বেরুবে ত বেরোও, নইলে ঝাঁটাপেটা করব। " (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

মুক্তকেশীর ভাই ভাবনা কাজীর অনুচর — একথা জানতে পেরে মুক্তকেশী ভাইফোঁটার দিন ভাইফোঁটার পরিবর্তে ঝাঁটাপেটা করে তাকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভাইফোঁটার দিনে সে তার পুত্র পেলবকে রাজবাড়িতে সোনাইয়ের কাছে ভাইফোঁটা নিতে পাঠায়। মাতৃবাৎসল্যে ভরপুর মুক্তকেশী পেলবের কাছে সোনাইয়ের জন্য উপহার ও সন্দেশ পাঠাতে ভোলে না।

মুক্তকেশী ।। .... এই হারছড়া বেশ করে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নাও দেখি, আর এই টাকাটা সেই পোড়ামুখীকে দিও।

মুক্তকেশী ।। আ– মর, মুখের দিকে চাইছিস কি? যাবিই যখন, এক কাজ কর। তোর জন্যে সন্দেশ করেছিলুম, — গোটা কতক নিয়ে যা, রান্না ঘরে ঘটিতে মুখ বাঁধা আছে। খেয়ে যেন আমায় উদ্ধার করে, বলিস। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

উপরোক্ত সংলাপে মুক্তকেশীর মাতৃহৃদয়টি উন্মোচিত হয়ে গেছে। সোনাইয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত এবং সোনাইয়ের জন্য রক্ষিত মাতা মুক্তকেশীর অপত্য স্নেহময় হৃদয়ের বিশেষ স্থানটি পেলব আজ দেখতে পেয়েছে এবং আবেগ-বিহ্বল হয়ে সে মাতা মুক্তকেশীকে বলেছে —

পেলব ।। মা, — এই মানুষ তুমি। কি আশ্চর্য্য। ..... তোমার একটু পায়ের ধুলো রুমালে মাখিয়ে নিয়ে যাই মা, দিদির মাথায় বুলিয়ে দিয়ে আসব। তাহলে আর কোন বিপদ

তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

সোনাই দীঘি পালাভিনয়কালে এই দৃশ্যটিতে দর্শকের বারংবার চোখ মুছতে দেখা যেত। আপাত কঠিন আবরণে আবৃত সোনাইয়ের জন্যে মুক্তকেশীর স্নেহ-মমতা এই দৃশ্যে দর্শকের কাছে অনাবৃত হয়ে গেছে।

মুক্তকেশীর ভাই অবতারের মধ্যে দিদির চারিত্রিক গুণাবলীর লেশমাত্র নেই। নিষ্কর্মা, অর্থলোভী, কুমতলবী অবতার অর্থের বিনিময়ে যে কোন হীন কর্ম করতে প্রস্তুত। নিজের দিদির ঘরের মেয়ে সোনাইকে অর্থের লোভে ভাবনা কাজীর হাতে তুলে দিতে তার মনুষ্যত্বে বাধে না। সে যেন শয়তানের অবতার। পালাকার এই চরিত্রের মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। তবে পরিবেশিত হাস্যরস কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থূলতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আগাবাসী ।। বাজে কথা রেখে দাও শালাঠাকুর।

অবতার ।। শালাঠাকুর বলছ কি না মিঞা? বরং বোনাইঠাকুর বলতে পার। শালা আমি এক জনেরই, আর কারও শালা হবার উপায় নেই। বুঝলে হাগা খাঁ? আচ্ছা বড় মিঞা, এত খাবার জিনিষ থাকতে তোমার নাম হাগা খাঁ হোল কেন? রসগোল্লা খাঁ, সন্দেশ খাঁ, চাই কি ছাগী খাঁ ও ত হতে পারত, তা নয়, একেবারে হাগা খাঁ?

আগাবাসী ।। হাগা খাঁ কে বললে? আমার নাম আগাবাসী খাঁ।

অবতার ।। তাই বল, —আগাবাসী খাঁ। খুব চালাক তুমি, — টাটকা না খেয়ে বাসী করে খেলে কেন? ভাবনা কাজীর জন্যে যত মাল নিয়ে যাও, সবারই আগে খাও নাকি তুমি হাগা খাঁ? (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

আগাবাসী খাঁ ও অবতারের সংলাপে নির্মল হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। পরিবেশিত মার্জিত হাস্যরসের ধারায় অবগাহন করে ভারাক্রান্ত দর্শক ধন্য হয়। তবে হাস্যরসে মার্জিত ভাবটি রক্ষিত না হলে আবালবৃদ্ধবনিতাসহ যাত্রাগান শুনতে অস্বস্তি বোধ হয়। নিম্নের উদ্ধৃতিতে পরিবেশিত হাস্যরসে শালীনতাটুকু হারিয়ে স্থূলতায় এবং আদিরসে পর্যবসিত হয়েছে।

অবতার ।। বাড়িতে জরু আছে?

আগাবাসী ।। তা তো আছেই, তবে পাঁচ বছর দেখা হয় নি।

অবতার ।। সে কি আর তোমার আছে মিঞা? তোমার খেয়ে সে এখন হয়ত অপরের গুণ গাইছে।

আগাবাসী ।। অ্যাঁ।

অবতার ।। অ্যাঁ কি? পাঁচবছর ফেলে রাখলে জরু আর গরু ঠিক থাকে? ছেলে পিলে আছে?

আগাবাসী ।। তিন বছেরের একটি ছেলে আছে।

অবতার ।। তিন বছরের ছেলে। আহা, বেঁচে থাক, বাপের নাম উজ্জ্বল করুক, এর নাম রেখো জারজ আলি খাঁ। খুব লাগতাই নাম হবে।

আগাবাসী ।। তা হবে, কিন্তু অর্থটা কি হল?

অবতার ।। সে তুমি বুঝবে না, ছেলের মাকে জিজ্ঞাসা করো। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

এ জাতীয় সংলাপের সঙ্গে নাটকীয় ঘটনার কোনো সম্বন্ধ নেই। শুধুমাত্র হাস্যরস পরিবেশন করে দর্শকদের সাময়িক আনন্দ দানের জন্যই এর অবতারণা। তবে হাস্যরসে এতখানি স্থূলতা অকাম্য।

দীঘলহাটির রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাহসীপুত্র মাধব। রূপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও ঘটনাচক্রে তিনি নিঃস্ব হয়ে যান। প্রতাপরুদ্রের প্রজা ভাটুক ঠাকুরের ভাগ্নী সোনাইকে তিনি ভালোবাসেন। গন্ধর্ব মতে তারা বিবাহ করেন। তবে এই বিবাহবার্তা সকলের কাছে অজ্ঞাত থাকে। মাধবের বিবাহ অন্যত্র ঠিক করলে তিনি পিতাকে স্পষ্টই জানান যে, সোনাইকেই তিনি বিয়ে করবেন। ইতোমধ্যে ভাবনা কাজীর লোকেরা সোনাইকে অপহরণ করেছে শুনে তিনি 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' জ্ঞানে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনাইকে ভাবনার কবলমুক্ত করেছেন। ভাবনা কাজীর অন্যায়ের সুবিচার চাইতে তিনি এরপরে উপনীত হন নবাব হোসেন শার বিশ্রামাগারে। রাজ্যশাসনে নবাবের নির্লিপ্তভাব দেখে তিনি নবাবকে বলেছেন —

মাধব ।। হ্যাঁ। এত বড় রাজ্যটার শাসনভার যার মাথার উপর, তাঁর দশটা চোখ মেলে চেয়ে থাকার কথা। আমাদের নবাবের দুটি চোখ তাও কবিত্বের আবেশে নিমীলিত। জাঁহাপনা, — শাসনকর্তার কবি হওয়া চলে না। (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

ভাবনা কাজীর বিরুদ্ধে নবাবের কাছে অভিযোগ জানিয়ে তিনি বলেন —

মাধব ।। আমি এসেছি ভাবনা কাজীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ নিয়ে। এতবড় হিন্দুদ্বেষী রাজকর্মচারী নবাব সরকারের বোধহয় আর একটিও নেই। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ হলে এই শয়তান চোখ বুজে হিন্দুদের শাস্তি দেয়। (৩য় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

নবাব হোসেন শার কাছে বিচার না পেয়ে মাধব তাঁকে শাসিয়ে আসেন।

মাধব ।। আবার আমরা আসব বঙ্গেশ্বর। বিচার যখন পেলাম না, তখন আমরা আপনাকে টেনে সিংহাসন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব। (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

রাজপ্রাসাদে দাঁড়িয়ে বাংলার নবাব হোসেন শার প্রতি মাধবের এই শাসানি বা চ্যালেঞ্জ তার নির্ভীকতার পরিচায়ক হলেও তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। যাত্রার মেলোড্রামাটিক বৈশিষ্ট্য এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, মাধবের নেতৃত্বে ভাবনা কাজীর বিরুদ্ধে যে একটা গণসংগ্রাম ঘটতে যাচ্ছিল তার ভিত্তিতেই মাধবের এই দুঃসাহসিক উক্তি। পুত্র হিসাবে মাধবের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়। পিতৃস্নেহবঞ্চিত মাধব আপন বন্দীত্বের মূল্যে ভাবনা কাজীর কারাগার থেকে পিতাকে মুক্ত করেছেন। তিনি আদর্শ পুত্র। পতি হিসাবেও তিনি আদর্শ। ভাবনা কাজীর গ্রাস থেকে মহাবিক্রমে সোনাইকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এইজীবনে মাধব আর সোনাইকে লাভ করতে পারে নি। পতিব্রতা সোনাই বিষপানে আত্মহত্যা করে। মাধবের জীবনের ট্রাজেডি এখানেই।

মাধবের পিসির ছেলে যাদব। গীতিকায় তিনি অনুপস্থিত। নাট্যিক প্রয়োজনে পালাকার কাল্পনিক এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। মাধবকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে রাজা প্রতাপরুদ্র

তাকেই সম্পত্তি দান করেছেন। যাদব টিপিক্যাল ভদ্র ছেলে। সম্পত্তি প্রাপ্তিতে তিনি মোটেই খুশি নন। ভাই মাধবের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ভ্রাতৃবধূ সোনাইয়ের প্রতি তিনি স্নেহশীল। ভাইয়ের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা। তিনিই মাধব এবং সোনাইয়ের বিবাহের স্বীকৃতিদান করেন। অপহৃতা সোনাই উদ্ধার হলে তিনিই সোনাইকে ভাতৃবধূর মর্যাদা দিয়ে রাজবধূরূপে রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ, বিলাস-বৈভব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে ভাবনা কাজীর বন্দীশালা থেকে দাদা মাধবকে উদ্ধার করতে গিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে জীবনদান করেন।

ভাটুক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দরিদ্র হলেও তিনি বাপহারা ভাগ্নী সোনাইকে পিতৃস্নেহে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। লম্পট ভাবনা কাজী সোনাইকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে ভাটুকের পিতৃসত্তা জাগ্রত হয়। সোনাইয়ের উপর ভাবনার নিঃশ্বাসমাত্র যাতে না পড়ে সে জন্য তিনি বাহুবল প্রদর্শন করে তাকে সাবধান করে দিয়েছেন।

ভাটুক ।। .... আর আপনি এখানে অপেক্ষা করবেন না দেওয়ান সাহেব। ভাটুক ঠাকুর নিজে নিঃস্ব রিক্ত দুর্ব্বল হতে পারে কিন্তু গাঁয়ের ছেলেরা তার কথায় আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে, তারা নিঃস্ব নয়, দুর্ব্বলও নয়। (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

অসীম সাহসী ভাটুক রাজা প্রতাপরুদ্রের রক্তচক্ষুকেও তুচ্ছজ্ঞান করে। তার ভাগ্নী সোনাইকে মাধব ভালোবাসে জেনে তাদের পরস্পরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টির জন্য প্রতাপরুদ্র তাকে দীঘলহাটি রাজ্য ছেড়ে যাবার আদেশ দিলে নির্ভীক ভাটুক বলে — " আপনি ভাটুক ঠাকুরকে জানেন না, সে দরিদ্র বটে, কিন্তু কারও চোখ রাঙানিকে ভয় করে না " (প্রস্থানোদ্যোগ)। ভাটুককে রাজা ধমক দিলে সে বলে — " ধমকাতে হয়, আপনার ছেলেকে ধমকান, আমি আপনার চাকরীও করি না, টাকাও ধারি না (প্রস্থানোদ্যোগ)। (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

উদ্ধারপ্রাপ্তা সোনাইকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে আনতে মাধবের ভাই যাদব ভাটুকের গৃহে যান। বিদায়ের প্রাক্কালে ভাটুক অপত্যস্নেহে পালিতা ভাগ্নী সোনাইকে যে কথাগুলি বলে, তারমধ্যে আমরা আবহমানকালের মমতাময় পিতাকে দেখতে পাই—

ভাটুক ।। কাঁদিস নি মা। সুখী হ। রাজবাড়িতে হয়ত আমি ঢুকতে পারব না। যাই হোক, প্রতি সপ্তাহের শেষদিন আমি রাজবাড়ির সামনে তেঁতুল গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। তুই দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াস। আচ্ছা যা। আমার জন্য ভাবিস নি, আমার কোন কষ্ট হবে না। তুই সুখে থাকলেই আমি সুখী হব। দুর্গা, দুর্গা। (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

ভাবনা কাজীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভাটুক হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিরূপে দীঘলহাটির মানুষদের সাথে নিয়ে নবাব হোসেন শা-র রাজদরবারে হাজির হয়। কিন্তু নবাবের কোন আশ্বাসবাণী বা অন্যায় প্রতিবিধানের কোন ইঙ্গিত না পেয়ে ক্ষুব্ধ ভাটুক নবাবের উদ্দেশ্যে বলে — 'নিজেদের বিচার তারা নিজেরাই করবে।'

ভাটুক ।। হবে না যুবক, সুবিচার হবে না। এদের বিচারবুদ্ধি নেই, সৌজন্য শালীনতা কিছুই নেই, আছে শুধু স্বধর্মপ্রীতি। ভাবনা কাজী একা যদি গোটা দীঘলহাটির বিরুদ্ধে

অভিযোগ করে, তার কথাই হবে সত্যি, আর সমগ্র হিন্দু সমাজ যদি ভাবনা কাজীর বিরুদ্ধে নালিশ করে, তার একটা কেশও বিচ্ছিন্ন হবে না। আমাদের অভিযোগের বিচার আমাদেরই করতে হবে। চল, ফিরে যাই। (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

মাধবকে বাঁচাতে সোনাই ভাবনা কাজীর হাতে ধরা দিলে ভাটুক দীঘলহাটির সমস্ত সংগ্রামী মানুষদের সংঘবদ্ধ করে এবং সোনাইকে উদ্ধার করতে অস্ত্রহাতে ভাবনা কাজীর প্রাসাদ আক্রমণ করে। কিন্তু ততক্ষণে অমৃতরূপ বিষপান করে সোনাই নারীত্বসহ অমৃতলোকে যাত্রা করেছে। পল্লীগীতিকায় বর্ণিত ভাটুকের কলঙ্ক ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর যাত্রাপালায় মোচন করেছেন। যদিও ভাটুক চরিত্রে কখনও কখনও অতিনাটকীয়তার (Melodramatic) লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তথাপি নাটকে ভাটুকের ভূমিকায় যাত্রামোদী দর্শকেরা বিশেষ আনন্দ উপভোগ করে।

নিশাচর এ পালার বিবেক হলেও সে নাট্যচরিত্র। সে তার পরীর মত সুন্দর, ফুলের মত পবিত্র বোন সোনার প্রতিমাকে খুঁজে বেড়ায়। প্রতিশোধ নিতে সে আর একজনের সন্ধান করে সে দুর্বৃত্ত শয়তান ভাবনা কাজী। ভাবনা কাজীই তার বোনকে অপহরণ করেছিল। এরপর থেকে সোনার প্রতিমা অচিন হয়ে যায়। আজও তার প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি। ভাবনার লোকজন সোনাইকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গেলে সোনাইয়ের স্বামী মাধব উদ্ভ্রান্তের মত আত্মহত্যা করতে অগ্রসর হয়। নিশাচর তাঁকে আত্মহননে নিরস্ত করে ও মাধবের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে আগামী দিনের বৃহত্তর সংগ্রামের আবাহনী মন্ত্র শোনায়।

নিশাচর ।। আয় দেখি সব কোমর বেঁধে এক সাথে দিই হাঁক,
দেখি কেমন অত্যাচারীর হয় না মাথা ফাঁক।
তার দেহ নয় লোহায় গড়া,
আমরা ত নই সবাই মরা,
তার আছে ভাই দু'চার শত, আমরা আছি লাখে লাখ। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

পেলব এই পালার একানে বালক। গান গেয়ে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে সে প্রয়াসী। আজিম খাঁ ভাবনা কাজীর বান্দা। তথাপি আজিমের উপর ভাবনার ছায়া পর্যন্ত পড়ে নি বরং সে ভাবনা কাজীর কঠোর সমালোচক, সে সত্যবক্তা। মুসলমান হয়েও সে হিন্দুবিদ্বেষী নয়।

যাত্রাসমালোচনার ইতিহাসে সোনাই দীঘি পালাভিনয়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। যাত্রাবন্ধু প্রবোধবন্ধু অধিকারী আনন্দবাজার পত্রিকায় 'সোনাই দীঘি' -র অভিনয় সমালোচনা করে যাত্রা শিল্পের দুর্দিনে যাত্রাশিল্পকে তার মুমূর্ষুতা থেকে রক্ষা করেন। তিনি বলেছেন —

" সত্যম্বর অপেরার 'সোনাই দীঘি' -র অভিনয় সমালোচনা দিয়ে সেই প্রথম সংবাদ পত্রে যাত্রা সমালোচনার পত্তন। " ৩০

সত্যম্বর অপেরা প্রযোজিত এ পালা গল্পে, গানে, অভিনয়ে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেছিল। ১৯৬৪ সালে এইচ. এম. ভি. গ্রামোফোন কোম্পানি এই পালার লং প্লে রেকর্ড প্রকাশ করে। আদি, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও করুণরসের প্রকাশ ঘটেছে এ পালায়।

সম্রাট জাহান্দার শাহ্ (১৩৬৯) —এই ঐতিহাসিক যাত্রাপালাখানি ব্রজেন্দ্রকুমার দে কলকাতার স্বনামধন্য যাত্রাপার্টি নট্ট কোম্পানির জন্য রচনা করেন। নট্ট কোম্পানি এই পালাভিনয় করে প্রভূত যশলাভ করেছিল। ডায়মন্ড লাইব্রেরী এই পালা নাটকটি প্রকাশ করেছিল। ১৬৭ পৃষ্ঠার লোমহর্ষক গ্রন্থখানির মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা।

পালাসম্রাট এ নাটকের ভূমিকায় অতি সংক্ষেপে নাটকটির পটভূমিকা এবং নাটকের মূল কথা পাঠকদের জানিয়েছেন —

" 'সম্রাট জাহান্দার শাহ' ঐতিহাসিক নাটক। মাত্র কয়েক মাস তিনি দিল্লীর মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় হোসেন ও আবদুল্লাই তখন প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর ভাগ্যবিধাতা। সরল সংসারানভিজ্ঞ মইজুদ্দীন তাঁহাদেরই খেয়ালে জাহান্দার নামে কয়েক মাস বাদশাহী করেন। বাদশাকে নিয়ে তাঁহারা পুতুলখেলা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জাহান্দার পুতুল সাজিতে চাহেন নাই। সৈয়দ-ভাইয়েরা তখন তাঁহার পিছনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোকশিয়ারকে লেলাইয়া দেন। ফেরোকশিয়ার পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া সিংহাসন লাভ করেন।" ৩১

স্ত্রী - পুরুষসহ এ নাটকে চরিত্রের সংখ্যা উনিশ। এ নাটকের সমগ্র কাহিনী পাঁচটি অঙ্কে পরিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেক অঙ্কে প্রদর্শিত হয়েছে এক বা একাধিক দৃশ্য। প্রথমাঙ্কে প্রদর্শিত হয়েছে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয়াঙ্কে দেখানো হয়েছে তিনটি দৃশ্য, তৃতীয়াঙ্কে রয়েছে চারটি দৃশ্য, চতুর্থাঙ্কে প্রদর্শিত হয়েছে চারটি দৃশ্য এবং একটি দৃশ্য প্রদর্শনান্তে সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চমাঙ্ক।

সংক্ষেপে নাট্যকাহিনী – সম্রাট আলমগীরের পুত্র বাহাদুর শাহের (১৭০৭ খ্রীঃ – ১৭১২ খ্রীঃ) মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদে বসেন তাঁর পুত্র মইজুদ্দিন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় – হোসেন ও আবদুল্লার তৎপরতাতেই মইজুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং জাহান্দার শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অত্যন্ত খেয়ালী স্বভাবের, রাজনীতি অনভিজ্ঞ, সুরাপায়ী অথচ নিপাট ভালোমানুষ সম্রাট জাহান্দার শাহ্-র পক্ষে বেশি দিন রাজত্ব করা সম্ভব হয় নি। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর শাসনদণ্ড কখনোই কারো উপর প্রয়োগ করেন নি। এমনকি, কেউ পরম শত্রুতা করলেও তিনি তাদের ক্ষমাসুন্দর চক্ষেই দেখেছেন। দিল্লীর সিংহাসনে বসার প্রাক্কালেই তিনি তাঁর অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন কিন্তু নসীবের ফেরে 'কাঁটার মুকুট' তাঁকে পরতে হয়। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে তাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করে পরোক্ষে তারাই সম্রাট সাজতে চেয়েছিলেন কিন্তু জুলফিকার, জাহান শা, সোমেশ্বর, জব্বর, দরাজাত প্রভৃতি সম্রাটের হিতাকাঙ্ক্ষীদের সক্রিয়তায় সৈয়দ ভাইদের সে অসদুদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হতে পারছিল না। তখন তারা সম্রাটকে হত্যার পরিকল্পনা করে। লোভী ফেরোকশিয়ার সেই গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে তাঁকে হত্যা করে। মাত্র এগারো মাসের বাদশা ছিলেন সম্রাট জাহান্দার শাহ।

দোষ-গুণে মিশ্রিত এক অসাধারণ চরিত্র সম্রাট জাহান্দার শাহ। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনের প্রশ্নে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে মইজুদ্দীনের বিজয় ঘোষিত হলেও সিংহাসনের প্রতি তাঁর বিরাগ জন্মেছিল। যুদ্ধের বিভীষিকা ও ভ্রাতৃহত্যার দৃশ্য দর্শন করে তাঁর মানবিক সত্তা বিশেষভাবে

আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে সিংহাসন প্রাপ্তিতে তিনি নারাজ। তাঁর হিতৈষী জুলফিকারকে বেদনার্ত হৃদয়ে তিনি বলেন —

মইজুদ্দীন ।। এরই নাম রাজত্ব জুলফিকার ? একসঙ্গে খেলেছি, একই পিতার স্নেহের ছায়ায় বেড়ে উঠেছি চারভাই। আজ আমার বিজয় রথের চাকায় একজন দিলে প্রাণ, আর একজন দিলে চক্ষু, আরও কত আত্মীয় কত বিশ্বস্ত সৈনিক রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে গেল দিল্লীর প্রান্তর। আমি বসবো মসনদে আর তারা থাকবে কবরের তলায়। .....এত আত্মীয়, এত বান্ধব হারিয়ে লাভ করলুম শুধু এই কাঁটার মুকুট। (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

নাটকের প্রারম্ভেই সম্রাটের মুখে এরূপ সংলাপ শুনে আমরা বুঝতে পারি, তাঁর এই প্রকার হৃদয় দৌর্বল্য বাদশাহীর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। চারিত্রিক দৃঢ়তা, কঠোরতা, যথার্থ বিচারশক্তি, কূটনৈতিক জ্ঞান প্রভৃতি রাজনৈতিক গুণাবলী একজন সুশাসকের থাকা একান্ত প্রয়োজন। সম্রাট জাহান্দার শা-র ন্যায় সুরাপায়ী এবং কোমলহৃদয়বৃত্তির বাদশার কাছে তা অপ্রত্যাশিত।

রাজনৈতিক গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিশেষ প্রত্যক্ষ করা না গেলেও মানবিক গুণে সম্রাট জাহান্দার শা ভারতের ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। নারীজাতির প্রতি মর্যাদাবোধে তিনি ছিলেন মহান। সোমেশ্বরের স্ত্রী লালকুমারীকে অসম্মান ও শ্লীলতাহানি থেকে বাঁচাতে তিনি ছুটে যান ছদ্মবেশে। কিন্তু অপরাধীকে শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করেন — " তোমার এ অপরাধের বিনিময়ে আমি দিলুম তোমায় ক্ষমা।" (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য) এই স্নেহই যে তাঁর সর্বনাশ ঘটাতে পারে, একথা জেনেও সম্রাট তাঁর পরম শত্রুদেরও ক্ষমা করে থাকেন।

ধর্ম সম্পর্কে উদারতা জাহান্দার শা-র চরিত্রের অপর একটি মহৎ গুণ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর প্রজাকুলকে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখতেন। সাম্প্রদায়িকতায় তিনি ছিলেন আপোষহীন সম্রাট। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তিনি ধারক ও বাহক ছিলেন। তাঁর শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ছিল না।

জাহান্দার ।। হিন্দুরা আমার প্রজা নয় ? তারা শুধু দিয়েই যাবে, পাবে না কিছু উজীর সাহেব ? আমার আত্মীয় বন্ধু উজীর আমীরের দল যদি মনে করে থাকেন যে, আমি মুসলমান বাদশা বলে কথায় কথায় হিন্দুর মাথা নেবো, হিন্দুনারীর লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করবো, তাহলে তারা দিবালোকে খোয়াব দেখছেন। বাদশাহী যদি আমায় করতে হয়, একা মুছলমানদের নিয়ে করবো না। হিন্দু মুছলমান এহুদী ক্রেস্তান সবাইকে নিয়েই করবো। (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

আকবর বাদশার মতো সুশাসক হতে না পারলেও ধর্মীয় ঔদার্যে সম্রাট জাহান্দার শাহ সম্রাট আকবরের যথার্থ উত্তরসাধক। সম্রাট আকবরের ন্যায় মহৎ গুণাবলীর অধিকারী তিনি হতে পারতেন, কিন্তু 'মাথার ভিতরে তাঁর এক বোধ কাজ করে, যার জন্য তিনি হলেন না। সম্রাট হয়েও তিনি দেশের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষদের একজন হতে চাইলেন।তিনি নিজে রাজ্যের কুলি-মজুরদের দুরবস্থা সরেজমিনে দেখতে গেলেন। কিন্তু সম্রাটের উষ্ণীষ পরিধান করে দানপাত্র হাতে নিয়ে গেলেন না, ভিখারী হয়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তিনি গেলেন।

জাহান্দার ।। ভিখিরী হয়ে ত সবাই জন্মায় নি। আমাদের কুশাসন দেশে অসংখ্য ভিক্ষুক সৃষ্টি করেছে। এরা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে পথচারীর কৃপাভিক্ষা করে, আর বিনিময়ে পায় যত না পয়সা, তার দ্বিগুণ লাথি। সেদিনের কুলিদের বস্তিতে গিয়ে দেখলুম, – আলো নেই, বাতাস নেই, রোগের চিকিৎসা নেই, সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। এরাই তো দেশের অধিকাংশ মানুষ। (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

শাসক শ্রেণীর শোষণ এবং অমানবিক ব্যবহারই যে কুলিদের জীবনে দুরবস্থার কারণ তা জাহান্দার শা স্বীকার করেন। মানবিক চেতনার দিক থেকে তিনি অতি উচ্চ স্তরের মানুষ ছিলেন। শ্রেণী বৈষম্য দূর করতে চাইলে এজন্য যে প্রশাসনিক জ্ঞান, কলা কৌশল, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাঁর ভেতরে তার অভাব ছিল। সম্রাটের বিশ্বাসভাজন এবং হিতাকাঙ্ক্ষী জুলফিকার বাদশার এরূপ ভাবাবেগপূর্ণ আচরণ লক্ষ্য করে অত্যন্ত ক্ষোভে বলেন —

জুলফিকার ।। আপনি যদি এমনিভাবেই চলতে চান, তাহলে আমাকে ত্যাগ করুন জাঁহাপনা এ আমার অনুরোধ, এ আমার ভিক্ষা। (নতজানু হইয়া অঞ্জলি পাতিলেন, জাহান্দার তাহার অঞ্জলির মধ্যে কিছু চানাচুর ঢালিয়া দিলেন, অবশিষ্ট নিজে মুখে দিলেন) একি?

জাহান্দার ।। চানাচুর । বঢ়িয়া চিজ, খা লেও। (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

বাদশার এইরূপ খেয়ালিপনা ও ছেলেমানুষসুলভ আচরণ তাঁর বাদশায়ীর পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। হোসেন যে সমস্ত কারণে সম্রাটের বিরোধিতা করে এটি তার অন্যতম। যুদ্ধে পরাজিত ও আহত জাহান্দার শাহকে বন্দী করতে অগ্রসর হলে হোসেনকে তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেন —

জাহান্দার ।। মরবোই ত, হয় রোগে, না হয় অস্ত্রাঘাতে। গরীব প্রজাদের ঘরে সুখের হাওয়া বইয়ে দিতে চেয়েছিলুম। চেয়েছিলুম, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে। সব কল্পনাই রয়ে গেল। সবাই জেনে রাখলো যে, জাহান্দার শা অকর্মণ্য, অপদার্থ, মাতাল। তার মধ্যে যে প্রাণ ছিল, একথা কেউ জানলো না। অভিশপ্ত দিল্লীর মসনদে যদি কখনও মানুষের স্থান হয়, সে যেন আমার কল্পনায় রূপ দেয় খোদা। (৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

সম্রাট জাহান্দার শা-র কল্পনাপ্রবণতা, ভাবালুতা এবং আবেগপ্রবণতা তাঁর পতনকে তবান্বিত করেছিল।

সৈয়দ হোসেন অত্যন্ত কূটকৌশলী, হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বাদশাকে সামনে রেখে তিনি এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাই রাজ্যশাসন করতে চান। ভাই আবদুল্লাকে তিনি তাঁর অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করেন —

হোসেন ।। সৈয়দ হোসেন খাঁর জামাই যেদিন বাদশার হাতে মরবে, সেদিন দিল্লীর হারেমে একটা প্রাণীও জীবিত থাকবে না। শোন আবদুল্লা, এরা সবাই সমান। এদের একজনের ও চরিত্রের মেরুদণ্ড নেই। এদের সামনে রেখে রাজ্যশাসন আমরাই করবো। সৈয়দ

বংশের কন্যা দিয়ে আমরা জামাই ক্রয় করিনি, ক্রয় করেছি দিল্লীর মসনদ। .....জাহান্দার মরবে। (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

সম্রাট জাহান্দার শাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে হোসেন সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোকশিয়ারকে যুক্ত করলেন। দিল্লীর সিংহাসনের লোভে সে পিতৃব্যকে হত্যার চক্রান্তে যুক্ত হল। সম্রাটের উজীর আসাদ খাঁকে যেভাবে এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত করলেন তাতে হোসেনের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

হোসেন ।। তুমি অমত করো না আসাদ। দিল্লীর পবিত্র মসনদের মর্যাদা – উজীর তুমি, তুমি না রাখলে কে রাখবে? চক্ষুলজ্জা ত্যাগ কর, অসার প্রভুভক্তি ভুলে যাও, শুধু মনে কর আসাদ খাঁ, সম্রাট আলমগীরের মসনদের পবিত্রতা রক্ষা করা তোমার আমার সকলেরই ধর্ম। সৈন্যসামন্ত ত জুলফিকারের হাতেই আছে। তার সঙ্গে যোগ দেবে সেলিম, ফেরোকশিয়ার আর এই সৈয়দ ভাইয়েরা। (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

ধর্মের আড়ালে শয়তানিটা যে ভাল জমে, হোসেন তার প্রমাণ দিলেন। হোসেন অত্যন্ত ক্রুর, নিষ্ঠুর। মায়ামমতা, প্রেমপ্রীতি, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি সুকুমার মানবিক হৃদয়বৃত্তি কোনদিন তার কঠিন হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নি। নিজ কন্যা জহরৎ চায় না তার স্বামী ফেরোকশিয়ার দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়। স্বামীকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে সাধারণের মতো সংসার করতে চায় সে। সেই অপরাধে তাঁর পিতা হোসেন নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে তাকে পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করেন। দিল্লীর বাদশাহী রাজত্ব তারই মর্জিতে নিয়ন্ত্রিত হয় – সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র তথা জামাতা ফেরোকশিয়ার হয়ে যান দিল্লীশ্বর। এ প্রসঙ্গে যাত্রা বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য –

" হোসেন কূট কৌশলী ও হৃদয়হীন। তাহারই চক্রান্তে হিংস্র, ক্রূর, উদ্ধত, অকৃতজ্ঞ ও সিংহাসনলোভী জামাতা ফেরোকশিয়ার ময়ূর সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। হোসেন 'King maker' রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। " ৩২

সৈয়দ ভাতৃদ্বয়ের অপর ভাই আবদুল্লা। ভাই হোসেনের ক্রূর রাজনীতিতে তিনি যোগ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু হিংস্রতায় হোসেনের অনেক পরে তার অবস্থান। তবে একটি ব্যাপারে হোসেনের অনেক উচ্চে তার অবস্থান, সেটি নারীলোলুপতা। নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাঁর অপর নারীর প্রতি ভোগলালসা। হোসেনের সমস্ত প্রস্তাব তিনি মেনে নেয় একটি প্রলোভনে যে জাহান্দারের মৃত্যুর পর সোমেশ্বরের স্ত্রী লালকুমারীকে তিনি নিকে করতে পারবেন।

আবদুল্লা ।। শোন দাদা, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে তুমি আমায় যা করতে বলবে, তাই করবো। আমার যা কিছু আছে, সব তুমি ধার নাও, মোদ্দা জাহান্দার যদি নাও মরে, ঐ সোমেশ্বর ব্যাটাকে খতম করা চাই। তারপর ওর বিবির ব্যবস্থা আমি করবো'খন।

(২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

এ নাটকে জুলফিকার আদর্শ বীর চরিত্র। সে উজীর আসাদ খাঁর পুত্র। সম্রাটের ভাল

মন্দের দিকে তার তীক্ষ্ণ নজর। সে বুদ্ধিমান। হোসেনের হীন, কূট কৌশলে সে ধরা দেয় নি। সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধে সে উজ্জ্বল। পিতার নির্দেশেও সম্রাটের বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না বলে সে আত্মহত্যায় অগ্রসর হয়। তার ঔচিত্যবোধে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

জুলফিকার ।। পালাও হতভাগ্য বাদশা। জুলফিকার বিশ্বাসঘাতক – নেমকহারাম – শয়তান। একটা বাজ পড়ে না, একটা কামানের গোলা ছুটে আসে না? ঐ তো নীচে পাথরের রাজ পথ। বেইমানের কি হবে বেঁচে? আমি এক লাফ দেবো – (অগ্রসর হইল)।

(৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

কিন্তু আত্মহত্যা করা তার হল না, উন্মাদিনী জহরৎ পিছন থেকে এসে তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু পিতা আসাদ খাঁর অতিরিক্ত অর্থ লিপ্সা ও ভুল সিদ্ধান্তের বলি হল সে। ফেরোক শিয়ারের চাবুকের ঘায়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও সে তার পিতার নেমকহারামির জন্য অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে। প্রখর ধর্মজ্ঞানী ও প্রভুভক্ত জুলফিকারের মৃত্যুকালে তার কাতর বাণীতে আমরা দর্শকেরা অশ্রুসিক্ত হই।

জুলফিকার ।। ধর্মের যে নিক্তিধরা বিচার! মনিবের সঙ্গে এতবড় নেমকহারামি ধর্ম কখনও সয় না। উঃ – নিজের কথা ভাবছি না পিতা, ভাবছি শুধু আমার সেই চিরশিশু মনিবের কথা। (৫ম অঙ্ক, শেষ দৃশ্য)

সম্রাট জাহান্দার শা-র স্ত্রী হাসিনা বেগম ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। দিল্লীর সম্রাটের মহিষী হয়ে তিনি অবশ্য মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করে আমীর ওমরাহদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত অশালীন আচরণ করেছেন। তাঁর একটি দুর্বলতা ছিল। তিনি ছিলেন ফেরিওয়ালার মেয়ে। আমীর-ওমরাহ থেকে শুরু করে হারেমের দাসদাসী পর্যন্ত সকলে তাঁর সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে, তাকে বেগমের মর্যাদা দেয় না – এরকম একটা সন্দেহ সর্বদা তাঁর মনে হত। মনের এই স্বকপোলকল্পিত আগুনে তিনি সর্বদা দগ্ধ হতেন। তাঁর এই আত্মদহন ও সন্দেহ প্রবণতার জন্য তিনি সঠিক বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। জুলফিকার বাদশাকে হত্যা করতে চায় – এই মিথ্যা কথাটি বাদশার পরম শত্রু সেলিম এসে বললেও তিনি সহজেই তা বিশ্বাস করে নেন। সেলিমের দুরভিসন্ধি বুঝতে না পেরে তার পরামর্শ মত জুলফিকারকে হত্যার জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। বলাবাহুল্য, বেগমের এই প্রকার হঠকারী ও ভুল সিদ্ধান্ত সম্রাটের সিংহাসনচ্যুতি ও মৃত্যুর জন্য 'অনেকটাই দায়ী।

হাসিনা।। কত টাকা চাই? এই নাও পঞ্চাশ হাজার। (হাতের গহনা খুলিয়া দিল) আরো লাগে, আরো দেব। ঐ কশবীর বাচ্চাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও। সব যাক, তবু জাঁহাপনাকে রক্ষা করা চাই। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

সম্রাট জাহান্দার শাহ-র ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোকশিয়ার। সে অকৃতজ্ঞ, লোভী, দর্পী ও নিষ্ঠুর। ক্ষমতা লাভের জন্য সে সর্বপ্রকার হীনকর্ম ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে। যে পিতৃব্য তার সকল অপরাধ ক্ষমা করে আপন হস্তে তার শৃঙ্খলমোচন করেছিলেন, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন ফেরোকশিয়ার সেই দেবতুল্য পিতৃব্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনে বসেন।

জহরৎ ফেরোকশিয়ারের সহধর্মিনী হলেও তার সহকর্মী নন। স্বামীর মুক্তিপ্রাপ্তিতে তিনি সম্রাট জাহান্দার শাহ-র প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। সামান্য তার চাহিদা। পতিগতপ্রাণা নারী স্বামীকে নিয়ে সাধারণের মতো সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে চান। দিল্লীর মসনদ নিয়ে হানাহানির রাজনীতিতে জড়াতে দিতে চান না তাঁর স্বামী ফেরোকশিয়ারকে। পরিব্রতা বাঙালী নারীর মতো তাঁর আকৃতি।

জহরৎ।। না, না শাহশাদা, কাজ নেই আর মসনদে, আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই। তারজন্য দু'বেলা দু'খানা মোটা রুটিই যথেষ্ট। আমাকে তুমি মূল্যবান শাড়ি দিও না, গহনা দিও না, পাকা ইমারতও দিও না। তুমি চাষ করবে, মাঠে সোনার ফসল ফলাবে, আমি তাই মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করবো।

(১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

কিন্তু তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত শান্তির রাজ্যে অশান্তিরূপে অনুপ্রবেশ করে তাঁরই জন্মদাতা পিতা হোসেন। হোসেন তার স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার লক্ষ্যে তার জামাতা ফেরোকশিয়ারকে মসনদের প্রলোভন দেখায়। জহরৎ কিন্তু পিতার দুরভিসন্ধি ধরতে পারে। পিতা হলেও এই কুমতলববাজ হোসেনকে তিনি জানিয়ে দেন---

জহরৎ।। শোন বাবা। মরতে হয়, তুমি একাই মরো, তোমার জামাইকে সঙ্গে নেবার চেষ্টা করো না। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটু পথে নিয়ে আসি, তুমি অমনি সব ভেঙ্গে দাও। আমি তোমায় দিতে এস না। মহান দিল্লীশ্বর নিজের গুণে তাকে ক্ষমা করেছেন, সম্মান ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি কিছুই কেড়ে নেন নি। তাঁর সঙ্গে বেইমানি করতে তুমি যদি তাঁকে লেলিয়ে দাও, তাহলে তোমার কলিজার রক্ত আমি শুষে খাব।

(২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

পিতার প্রতি জহরৎ-এর এই সাবধান বাণীতে আবেগ আছে ঠিকই, তবে যাত্রার সংলাপ হিসাবে এ ডায়লগ অসাধারণ। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে জহরৎ-কে ধর্মপ্রাণা, পতিগতপ্রাণা এবং আদর্শ নারী হিসাবে এ নাটকে উপস্থাপিত করেছেন।

মনসবদার সোমেশ্বরের পত্নী লালকুমারী অপরূপা সুন্দরী সতীসাধ্বী পতিব্রতা নারী। মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুনারীর মর্যাদা ও সম্মান বিপন্ন, এ অভিজ্ঞতা তাঁর একাধিকবার হয়েছে। তাঁর স্বামী সোমেশ্বর সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, সেই অপরাধে তিনি কিভাবে অপরাধী-হন তা তিনি বুঝতে পারেন না। তেজীয়সী লালকুমারী অবশ্য নিজেকে অন্যায়ের কাছে সাঁপ দেন নি। সম্রাটের সাক্ষাতেই নারীলোলুপ সেলিমকে তিনি সাবধান করে বলেছেন –

লালকুমারী ।।খুন করিনি এই তোমার পরম সৌভাগ্য। যদি এর পরও কটূকথা বল, তাহলে বাদশার সামনেই তোমার পশুলীলার অবসান করবো। হিন্দুরা বানের জলে ভেসে এসেছে? তারা খাজনা দিয়ে বাস করে না? তবে কেন আমরা যার তার হাতে এ লাঞ্ছনা সইবো? কত মুছলমান ত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাদের ক'জনের সামনে তাদের স্ত্রীদের তোমরা হাত ধরেছ, নিকে করতে চেয়েছ?

(২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

এখানে লালকুমারীর ভেতরে আমরা আর একবার চিতোরের রানী পদ্মিনীকে প্রত্যক্ষ করি। যাই হোক, সম্রাট জাহান্দারশা তাঁর ন্যায়বিচারের দ্বারা দেখিয়ে দেন যে, সম্রাট সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কতখানি ভ্রান্ত। সম্রাট তাঁকে বহিনের মর্যাদা দেন। সোমেশ্বর এবং লালকুমারী সম্রাটের ব্যবহারে অভিভূত হয়ে যান। কৃতজ্ঞতায় তাদের প্রাণ ভরে ওঠে। এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে লালকুমারী একদিন সম্রাটের অসুস্থতার জন্য রাজপ্রাসাদ থেকে বাড়ি ফিরতে পারেন নি। সেদিন পুরোহিত সিদ্ধেশ্বরের কথায় সোমেশ্বর লালকুমারীর উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। এরপর থেকে সোমেশ্বর তাঁকে বাইরে যেতে নিষেধ করে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জব্বরের কথা শুনে স্বামীর মঙ্গলের জন্য এবং সম্রাটকে বাঁচাতে তিনি ছুটে যান রাজপ্রাসাদে। এতে সোমেশ্বরের সন্দেহপ্রবণ মন আরও হিংস্র হয়ে ওঠে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি লালকুমারীকে হত্যা করেন। কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে দগ্ধ হন।

শোভন মইজুদ্দিনের বাল্যবন্ধু। শোভনের বন্ধুপ্রীতির কথা মইজুদ্দিন তথা জাহান্দার শা আজও ভুলতে পারেন নি। সেই বন্ধুত্ব অদ্যাপি অটুট আছে। শোভন খুব সুন্দর গান গায়। সম্রাট হবার প্রাক্কালে মইজুদ্দিনকে সম্রাট হতে তিনি নিষেধ করেছেন। সংগীতের ভেতর দিয়ে শোভন তাঁকে পরামর্শ দেয় —

শোভন ।। কাঁটার মুকুট পরলি কেন, দূর করে দে ফেলে।
হাজার ফুটো করবে মাথায় দুদিন সময় পেলে
ঝঞ্ঝা দিয়ে গড়া ও যে সোনার সিংহাসন,
গাঁটে গাঁটে ফোঁস করে ওর মরণ প্রভঞ্জন,
যে খেয়েছে বিষের বড়ি,
মাঝ গাঙে তার ডুবল তরী,
সাপ নিয়ে তুই খেলিস নারে, নয় ও ঢোড়া হেলে। (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর বন্ধু জাহান্দারকে গান শুনিয়ে সাবধান করে গেছেন। বন্ধুর মঙ্গল চিন্তায় তিনি অবিরত মগ্ন থেকেছেন। বন্ধুপ্রীতিতে উজ্জ্বল শোভন চরিত্র।

নাটকটিতে আদি, বীর, বীভৎস, বাৎসল্য ও করুণ রসের ধারা প্রবহমান। বিয়োগান্তক এই ঐতিহাসিক নাটকের বহু স্থলে ঐতিহাসিক সত্যতা লঙ্ঘিত হয়েছে। নাট্যকার তৎস্থলে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকারের এই স্বাধীনতা সাহিত্যে স্বীকৃত।

গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, খনি অঞ্চলে এই পালাভিনয় জয় জয়কার ফেলে দিয়েছিল। নট্টকোম্পানি এই পালা প্রযোজনা করে আশাতীত ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছিল। ইদানীংকালে ঐতিহাসিক পালার অভিনয় হতে বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। ঐতিহাসিক নাটক করার মতো শিল্পীর এখন বড় অভাব। এবিষয়ে অভিনেতা এবং পালাকার তপনকুমারের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

" ঐতিহাসিক পালা উঠে যাওয়ার পেছনে রয়েছেন কিছু নির্দেশক আর শিল্পী। এখন উচ্চগ্রামে অভিনয়ের চল নেই। দর্শক চান সহজ অভিনয়। নির্দেশকেরা বুঝতেন না যে রাজা মহারাজারাও মানুষ। অনর্থক তাঁরা চেঁচাতে যাবেন কেন?" ৩৩

ঐতিহাসিক পালাভিনয় কালে বিশিষ্ট যাত্রাভিনেতা, যাত্রাকার তথা নির্দেশক ও প্রযোজক তপনকুমারের অভিমত ভেবে দেখা দরকার। কেননা যাত্রায় স্বাভাবিক অভিনয় রীতি প্রচলিত হয়েছে। যাই হোক, ব্রজেন্দ্র কুমারের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক যাত্রাপালা সম্রাট জাহান্দার শা গল্পে, গানে, অভিনয়ে যাত্রামোদী মানুষের প্রশংসা লাভ করেছে।

যাদের দেখে না কেউ (১৯৬২) —ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত অন্যতম বিখ্যাত কাল্পনিক যাত্রাপালা। কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী প্রকাশিত পালাখানি কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ নবরঞ্জন অপেরা প্রথম অভিনয় করে। ডবল ক্রাউন ৭ইঞ্চি—৫ ইঞ্চি মাপের ১৬৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানির বাণিজ্যিক মূল্য নিরূপিত হয়েছে পঁয়ত্রিশ টাকা। পঞ্চাঙ্ক নাটকটিতে ষোলটি চরিত্র আছে। একটি রবীন্দ্রসংগীত সহ এ নাটকে মোট চোদ্দটি গান পরিবেশিত হয়েছে।

এ নাটকের কাহিনী সংক্ষেপে এরূপ —খঞ্জনপুরের রাজার ভগিনী শ্যামলী রাজমাতা হবার অভিলাষে অন্তঃসত্ত্বা রাজমহিষীকে গলা টিপে হত্যা করেন। শুধু তাই নয়, বিশ সহস্র টাকা মূল্যের রানীর কণ্ঠহার ও রানীর সঞ্চিত দশ হাজার মোহর তিনিই অপহরণ করেন। কিন্তু এ ঘটনা কেউ জানে না। কদমতলীর ব্রাহ্মণ গোকুল আচার্যের উপর হারচুরির অপরাধ অর্পিত হয়। এই অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু নিরপরাধ ব্রাহ্মণ গোকুলাচার্যকে গোপনে কারামুক্ত করেন শ্যামলীর পুত্র গৌতম। নারীলোলুপ লম্পট সেনাপতি বজ্রসেন গৌতমের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। কেননা মুক্তিপ্রাপ্ত গোকুল আচার্য দুষ্কৃতি বজ্রসেনের প্রধান শত্রু।

পুত্রহীন মকরকেতু আঠারো বছর আগে কদমতলীর এক নিরন্ন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে নকুল নামে এক শিশুকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেই শিশু নকুলই যুবরাজ অশোক। অশোক তার পূর্ব পরিচয় জানতে পেরে কদমতলীতে নিজের দাদার কাছে ফিরে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় রাজা কদমতলী গ্রামখানি নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হন। সহজ পথে মহাল যাওযার জন্য খালখনন অজুহাতমাত্র। কদমতলীর অবহেলিত জনগণের নেতা গোকুল এবং তার অনুগামীরা রাজার এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদে সোচ্চার হন। রাজার ভাগ্নে গৌতম নিরস্ত্র গোকুলকে গোপনে অস্ত্র এবং অর্থ সাহায্য করেন। যুদ্ধে রাজা মকরকেতু পরাজিত হন। কদমতলী গ্রাম ও তার অধিবাসীরা রক্ষা পায়। এদিকে শত্রুকে অস্ত্রদান, মাতা কর্তৃক হার ও মোহর চুরির অপরাধ নিজ-মস্তকে তুলে নেবার জন্য গৌতমের মৃত্যুদণ্ড হয়। এরপরে পরিত্যক্ত শ্যামলীর স্বামী এবং বীরনগরের রাজা রত্নসেন সম্মিলিতভাবে খঞ্জনপুর আক্রমণ করে। বজ্রসেন মকরকেতনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে রত্নসেনের দলে যোগ দেন এবং মকরকেতনকে হত্যা করেন। কিন্তু গোকুলের সহযোগিতায় অশোক রত্নসেনকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। এরপরে গোকুল প্রজাগণের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের দাবি জানান। এই প্রস্তাবে অশোক অসম্মত হয়। ফলে অনিবার্যভাবে অশোকের সঙ্গে গোকুলের যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে গোকুল নিহত হন। মৃত্যুর পূর্বে অশোকের সঙ্গে গোকুলের ভাতৃত্বের সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়ে যায়। —এখানেই পালার সমাপ্তি ঘটে।

দেশের অগণিত খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের শ্রমে সভ্যতার গতি অব্যাহত থাকলেও এই মানুষগুলির বেঁচে থাকার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর কোন মাথা ব্যথা থাকে না। শাসক সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশিতে এদের মাথা গোঁজার সামান্য ঠাঁইটুকু আগুনে ভস্মীভূত করা হয় অথবা ভেঙে ধ্বংস করা হয়। এই পালার ভূমিকায় পালাসম্রাট বলেছেন —

" দেশের যারা অধিকাংশ, যাদের কাঁধের উপর সভ্যতার ইমারত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই রামামুচি ও হাসিম শেখের জন্যে কারও মাথাব্যথা নেই। যে সুয়েজ খালের বুকের উপর দিয়া দেশবিদেশের জাহাজ চলে, যে সারার পুল কতকাল ধরিয়া বাস্পীয় যান বহিয়া চলিয়াছে, তাহাদের এঞ্জিনিয়ারেরা ইতিহাসের পাতায় অমর হইয়া আছেন, কিন্তু খালের তলায় পুলের নীচে যে মজুরের দল প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্যে কেউ নিঃশ্বাস ফেলে না। দেশবরেণ্য নেতাদের নিশান উড়াইয়া উড়িয়া যায়, তার তলায় কোন কুলী চাপা পড়িল, কে তার হিসাব রাখে? মাঝে মাঝে দুই একটা পাগল ক্ষীণ কণ্ঠে এদের জন্যে দাবি জানায়, অমনি 'শাসন ছুটিয়া আসে ঝটিকা তুলি'। " ৩৪

এ পালার ভূমিকায় পালাকার পালার প্রতিপাদ্য বিষয় স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। আমাদের সমাজে দেখা যায়, সভ্যতার ধারক-বাহক রামা মুচি হাসিম শেখদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে না। তারা পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, বর্তমানেও সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। আমাদের দেশের এটি একটি মৌলিক সমস্যা। পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে 'যাদের দেখে না কেউ' নাটকের মধ্য দিয়ে আরও একবার উক্ত সমস্যা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু সর্বকালীন সমস্যা সমাধানের কোন প্রচেষ্টা এখানে নেই।

এ পালার প্রধান চরিত্র গোকুল। গরীব হলেও তিনি নির্লোভ। অন্নাভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে ছোট ভাইকে ধনীর হাতে তুলে দিয়েছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ গোকুল আচার্য অবহেলিত গরীব মানুষের একান্ত আপনজন। গোকুল প্রতিবাদী। রাজার সৈন্যাধ্যক্ষ বজ্রসেনের নারীবিলাসে তিনি বাধা দেন। সেই আক্রোশে রানীর হারচুরির মিথ্যা অভিযোগে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু রাজার ভাগ্নে গৌতম মিথ্যা অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত গোকুলকে গোপনে কারামুক্ত করেন। সোজাপথে মহাল যাবার জন্য রাজা কদমতলী গ্রামের মধ্য দিয়ে খাল খনন করতে চাইলে গোকুল বাধা দেন। রাজার বিরুদ্ধাচরণের অর্থ নিশ্চিত পঞ্চত্বপ্রাপ্তি জেনেও নিরন্ন জনগণকে বাঁচাতে তিনি এগিয়ে যান। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত ও উৎসাহিত করে। নিম্নে প্রদত্ত গানটি সোচ্চার কণ্ঠে গেয়ে রাজার ঐ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রতিবাদী মানুষদের তিনি আহ্বান জানান।

গোকুল ।। উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

রাজার বিরুদ্ধে গোকুলের এই সংগ্রামে সহায়তা প্রদান করতে এগিয়ে আসেন বীরনগরের রাজা

রত্নসেন। কিন্তু উপযাজক হয়ে আসা রত্নসেনের অভিসন্ধি বুঝতে গোকুলের মতো নেতৃত্বের এতটুকু বিলম্ব হয় না। তিনি মুকুন্দকে বলেন ——

গোকুল ।। রাজা আমাদের বুকে মই দিয়েছে, আমরা হয় তাকে টেনে পথের ধুলোয় নামিয়ে আনব, না হয় দলে দলে মরব, তাবলে বিদেশীর হাতে রাজ্যটাকে তুলে দেব না! যেতে হয় দেশী বাঘের মুখেই যাব, তবু বিদেশী অজগরের মুখে মাথা গলিয়ে দেব না। (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

গোকুল শুধু রাজনীতি সচেতন, দেশপ্রেমী, স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাই নন, তিনি বীর। শ্রেণীশত্রু পলায়মান বজ্রসেনকে ক্ষমা করে তিনি বীরের মহত্ত্বই দেখিয়েছেন।

গোকুল ।। গয়ারাম, মহামান্য সৈন্যাধ্যক্ষকে অন্দরের পথ দিয়ে কদমতলীর সীমানা পার করে দিয়ে এস। সঙ্গে মুকুন্দকে নিয়ে যাও। (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

অকৃতজ্ঞ বজ্রসেন গোকুলের মহত্ত্বের মূল্য দেয় নি। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, বজ্রসেনই গোকুলকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে।

রাজনীতির মতো গোকুল সমাজ সচেতনও। সমাজে ধনীর ভূমিকাও তাঁর অজ্ঞাত নয়। সভ্যতার অগ্রগতি তাঁর চোখে স্পষ্ট। তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট সমাজের আপামর খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের করুণ অবস্থা। তাই তিনি ক্ষোভের সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে খেটে খাওয়া মানুষের তুলনা করে বলেন ——

গোকুল ।। ঘোড়া গেল, গাড়ী এল, বাষ্পীয় যানের জায়গায় উড়োজাহাজ এল, কবিগায়কের কণ্ঠ অমর হয়ে রইল, -- কিন্তু 'রামা মুচি আর হাসিম সেখ' যেখানে ছিল, সেইখানেই রয়ে গেল। ধনিকেরা কুকুরকে আদর করে, কিন্তু গরীব মানুষকে নয়। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

রামা মুচি ও হাসিম শেখদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যেই গোকুলের রাজনীতিতে আগমন। 'যাদের দেখে না কেউ' তাদের অর্থাৎ মেহনতী বঞ্চিত শোষিত তথা শ্রমজীবি মানুষদের কোন প্রতিনিধির হাতে শাসনদণ্ড তুলে দিয়ে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান ঘুঁচিয়ে দেওয়াই গোকুলের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। অত্যন্ত পরাক্রমশীল বীর নেতা গোকুল কিসের বিনিময়ে যুদ্ধস্থল ত্যাগ করবে – একথা বীরনগরের রাজা গোকুলকে জিজ্ঞাসা করলে দরিদ্র শোষিত,অবহেলিত মানুষের নেতা গোকুল স্পষ্টতঃই বলেন –

গোকুল ।। যাদের দেখে না কেউ, যারা দুর্ভিক্ষ মহামারীতে উজাড় হয়ে গেলেও কেউ নিঃশ্বাস ফেলে না, যারা বেঁচে মরে, আর মরে বাঁচে, তারা যেদিন হবে দেশের মালিক, ভাগ্যের বরপুত্রেরা যেদিন তাদের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না, তাদের স্ত্রী-কন্যারা যেদিন রাজরাণীর সঙ্গে সমান আসনে বসতে পাবে, সেইদিনই আমি নিঃশব্দে একবস্ত্রে চলে যাব, তার আগে আমি কোথাও যাব না। (৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

মৃত্যুকালে গোকুল তাঁর ভাই অশোককেও দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদেরই একজন হয়ে রাজ্যশাসন করতে বলেছেন ——

গোকুল ।। তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার কাজ শোষণ নয়, পোষণ। মনে রেখো, এ দেশ সকলের দেশ,

তুমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করো। তুমি প্রজাদের রক্ষক, তাদের দাসানুদাস।
যাদের দেখে না কেউ, তুমি তাদের দেখো। (৫ম অঙ্ক, শেষ দৃশ্য)

মকরকেতুর সৈন্যাধ্যক্ষ বজ্রসেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। অকৃতজ্ঞ, ঘাতকও। দেশদ্রোহী বজ্রসেন সিংহাসনের লোভে দেশের শত্রু বিদেশী রত্নসেনের দলে যোগ দেয় এবং জীবনদাতা গোকুলকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু সুমতির অস্ত্রাঘাতে রণস্থলেই তার মৃত্যু হয়। দুষ্টের দমনের মধ্য দিয়ে লোকনাট্যের বিশিষ্টতা রক্ষিত হয়।

মকরকেতুর ভগিনী শ্যামলী স্বামী-পরিত্যক্তা। তিনি ভ্রাতৃগৃহে থাকেন। নিজ পুত্র গৌতমকে রাজা করবেন বলে রানীকেই গলা টিপে হত্যা করেন এবং তার কণ্ঠহার চুরি করেন। ভবিষ্যতে প্রতিবাদী প্রজাদের মুখ বন্ধ করতে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে চিন্তা করে রানীর গচ্ছিত দশ সহস্র মোহর আত্মস্যাৎ করেন। রানীহত্যায় রাজপুত্রের জন্মের সম্ভাবনা দূরীভূত হলেও রাজার পালিত পুত্র অশোক রাজসিংহাসনে বসতে পারে, এই আশঙকায় তাকেও হত্যা করতে তৎপর হন। রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে পুত্রহীন রাজার একমাত্র কন্যা চন্দনাকেও রাজবাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে নানা প্রকার ফন্দী এঁটেছিলেন তিনি। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। অনুতপ্ত শ্যামলী তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই পালার শ্যামলী চরিত্রটি ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'সোনাই দীঘি' (১৯৫৯ খ্রীঃ) পালার মল্লিকা চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। দীঘলহাটির রাজা প্রতাপরুদ্রের বিধবা ভগ্নী মল্লিকাও রাজমাতা হবার বাসনায় আত্মজ্ঞান হারিয়ে রাজপুত্র মাধবের জীবনাবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। জ্বালা গঞ্জনা দিয়ে সোনাইকেও তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করতে তৎপর হয়েছিলেন। তবে শ্যামলী মল্লিকা অপেক্ষা নিষ্ঠুরতর।

মাতা শ্যামলীর সঙ্গে গৌতমের রক্তের সম্পর্ক ছিল সত্য, কিন্তু হৃদয়ের সম্বন্ধ ছিল না। মায়ের দুরভিসন্ধি তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তাই নিজের জীবন দান করে তিনি মায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। গৌতম পুঁথিগত বিদ্যা বিশেষ অর্জন করেন নি, কিন্তু ধর্মজ্ঞানে অনেক ধার্মিক ব্যক্তির উপরে তাঁর স্থান হতে পারত। পরার্থে আত্মবলিদান করে তিনি জীবনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

রামেশ্বর এ নাটকে বিশেষ ঘৃণ্য চরিত্র। অর্থলোভী রামেশ্বর লম্পট বজ্রসেনকে অর্থের বিনিময়ে নারী সরবরাহ করে। মুটে মহাকালকে সে মজুরীর পয়সা ফাঁকি দেয়। বৃদ্ধ হয়েও সুমতিকে বিয়ের জন্য সে লালায়িত হয়, সে-ই নির্দোষ গোকুলকে মিথ্যা চুরির দায়ে ধরিয়ে দেয়। প্রতিটি কর্মই তার অত্যন্ত ঘৃণিত। পালাকার এই চরিত্রটির মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশন করে দর্শকদের মানসিক বিরামের (Mental relief) ব্যবস্থা করেছেন।

রামেশ্বর ।। .... তুই আমার মাল তাকে দিয়ে এলি?

মহাকাল ।। তোমার মাল কি রকম? তোমার নাম তো সবাই বলে বিভীষণ ঘোষাল।

রামেশ্বর ।। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব ব্যাটা। আমার বর্তমান নাম রামেশ্বর ঘোষাল, উপনয়ণের আগে নাম ছিল গোকুল আচার্য্য।

মহাকাল ।। তোমার বাপ ঘোষাল না আচায্যি? না দুই-ই? তা তোমাকে ত সবাই থুথু দেয়, মোহর দিলে কে?

রামেশ্বর ।। মস্করা করিস নি ব্যাটা। মোহর পাঠিয়েছে আমার শ্বশুর।

মহাকাল ।। কখ্খনো নয়। সে হচ্ছে ছোকরা, আর তুমি বুড়ো।

রামেশ্বর ।। বুড়ো বুড়ো করবি নি বলে দিচ্ছি। যা, নিয়ে আয় আমার মাল। (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

খঞ্জনপুরের রাজা মকরকেতুর কন্যা চন্দনা যেমন সাহসিনী, তেমন স্পষ্টবাদিনী। সিংহাসন নিয়ে সৃষ্ট হানাহানি তিনি কিছুতেই মানতে পারেন না। তিনি বুঝেছিলেন, পিতার অপশাসনের জন্যই প্রজাদের অন্তহীন দুর্দশা। রাজকর্তব্যহীন পিতাকে তিনি স্পষ্টভাষায় প্রজাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী করেছেন এবং তাঁকে রাজধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন —

চন্দনা ।। রাজ্যরশ্মি হাতে নিয়েছ, আর প্রজাদের মুখে ভাত দেবে না? কেন তারা না খেয়ে মরে? কেন তাদের পুকুরে জল নেই? মাথার উপর ছাউনি নেই, রোগে ওষুধ জোটে না? একবারও কি সিংহাসন থেকে তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছ? (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

শুধুমাত্র কৈফিয়ৎ চেয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, সমস্ত রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে নিরাভরণা চন্দনা কন্যার হাত ধরে রাজপুরীর বিষময় পরিবেশ ছেড়ে কদমতলীতে দরিদ্র গোকুলের গৃহে আশ্রয় নিতে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। চন্দনা নির্ভীক, স্পষ্টবাদী এবং মানবদরদী। মানুষের দুঃখে তাঁর অশ্রুপাত তাঁকে মহীয়সী করেছে।

সুমতি গোকুলের যোগ্য কন্যা। পিতার সঙ্গে সেও রাজার অন্যায়ভাবে খালখননে বাধা দিয়েছে। রাজার ভাগ্নে গৌতমকে সে ভালবাসত। কিন্তু গৌতমকে বাঁচাতে ব্যর্থ সুমতি পাগল হয়ে যায়। গৌতমঘাতক বজ্রসেনের বক্ষে চুরিকাঘাত করে সুমতি তার প্রেমিক হত্যার প্রতিশোধ নেয়।

এ নাটকের কাহিনী, সংলাপ এবং ভাষার সরলতা নাটকটিকে জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে দেয়। সহজ গদ্যে রচিত এ পালার সংলাপ যাত্রার পালাবদলে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। প্রসঙ্গত লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি স্মর্তব্য —

> " এ কালের পালার সংলাপও কেবল সহজ গদ্যেই রচিত হচ্ছে। যেমন ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র 'যাদের দেখে না কেউ' নাটকে মৃত্যুর আগে অশোককে গোকুল আচার্য বলেন -- তোমার কাজ শোষণ নয়, পোষণ। মনে রেখো, এ দেশ সকলের দেশ, তুমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করো। তুমি প্রজাদের রক্ষক, তাদের দাসানুদাস। যাদের দেখে না কেউ, তুমি তাদের দেখো। " ৩৫

পঞ্চাশের দশক থেকে যাত্রায় স্বাভাবিক অভিনয় শুরু হতে দেখা যায়। প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা এবং প্রযোজক স্বপনকুমারের সাক্ষাৎকারে জানা যায়, তিনি ব্রজেনবাবুর 'যাদের দেখে না কেউ' পালা নাটকে গৌতমের ভূমিকায় রূপদান করেন এবং স্বাভাবিক অভিনয়েই তিনি দর্শকমন আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বপনকুমারের ন্যায় যশস্বী অভিনেতাদের মাধ্যমেই যাত্রায় স্বাভাবিক অভিনয়

ধারা প্রচলিত হয়। তিনি একথাও বলেন, যাত্রার তৎকালীন ঢঙের জন্য যদিও পঞ্চু সেনের অভিনয়ে একটু সুরেলা ভাব লক্ষিত হত, তবু পঞ্চু সেন যাত্রায় স্বাভাবিক অভিনয়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পঞ্চুবাবু যাত্রাজগতের দু'জন দিকপালকে 'পিক আপ' করেছিলেন — অভিনয়ের দিক থেকে স্বপনকুমারকে এবং নাটকের দিক থেকে ব্রজেন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে। স্বাভাবিক অভিনয়ের লক্ষ্যে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'যাদের দেখে না কেউ' পালাটি এদিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যবহ।

নটী বিনোদিনী (১৯৭৩ খ্রীঃ) —ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত জনপ্রিয় ভক্তিরসাশ্রিত জীবনীমূলক যাত্রাপালা। ১৯৭৩ সালে নির্মল বুক এজেন্সী থেকে পালাখানি প্রকাশিত হলে নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি এবং সাঁঝের আসর যাত্রা সংস্থা পর্যায়ক্রমে এই পালাভিনয় করে। তৎকালেও যাত্রাদলগুলি প্রতি বছর নতুন নতুন পালা আসরস্থ করত। ব্যতিক্রম নটী বিনোদিনী যাত্রাপালা। দর্শক চাহিদা মেটাতে নট্ট কোম্পানীকে দীর্ঘ পাঁচ বছর একটানা এই পালাভিনয় করতে হয়েছিল। এ থেকে পালার অসাধারণ জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত যাত্রা প্রতিযোগিতায় ১৯৭৩ সালে পালাখানি শ্রেষ্ঠ যাত্রাপালার পুরস্কার লাভ করে। নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে এই বছরেই ব্রজেন্দ্র কুমার দে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে 'বিশ্বরূপা পুরস্কার' এ সম্মানিত হন। এ পালার গৌরব রথ এখানেই থেমে থাকে নি, কলিকাতা দূরদর্শনে এ পালা সাদরে গৃহীত হয়েছিল। অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে এই পালা সম্প্রচারিত হয়েছিল। হিজ মাস্টারস্ ভয়েস সংক্ষেপে এইচ. এম ভি. মেগাফোন কোম্পানী পালাখানির লং প্লে রেকর্ড প্রকাশ করে গ্রাম বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে দিয়েছিল। মাইকে এই পালার রেকর্ডিং শ্রবণ করে যাত্রামোদী মানুষেরা মোহিত হয়ে যেতেন।

পাঁচ জন নারী চরিত্রসহ এ পালার চরিত্র সংখ্যা ষোল। তিন পর্বে বিভক্ত এ পালায় একাধিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম পর্বে পরিবেশিত হয়েছে ছয়টি দৃশ্য -- (১) গিরিশের বাড়ি, (২) আমোদিনীর বাড়ি, (৩) থিয়েটার কক্ষ, (৪) বলরাম বসুর বাড়ি, (৫) আমোদিনীর বাড়ির বহিঃকক্ষ ও (৬) গিরিশের বাড়ি। দ্বিতীয় পর্বেও প্রদর্শিত হয়েছে ছয়টি দৃশ্য- (১) পান্নার ঘরের বারান্দা, আমোদিনীর বাড়ির সদর ঘর, (২) থিয়েটারের অভ্যন্তর, (৩) রঙ্গ মঞ্চ, (৪) গিরিশের বৈঠকখানা, (৫) ষ্টার থিয়েটার ও (৬) গিরিশের বাড়ি। নাটকটির তৃতীয় তথা শেষ পর্বে চারটি দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছে —(১) বিনোদিনীর বাড়ির দরদালান, (২) কাশীপুর উদ্যানবাটী, (৩) বিনোদের বাড়ি ও (৪) গিরিশের বাড়ি।

বিনোদিনীর আত্মজীবনী 'আমার কথা' থেকে ব্রজেন্দ্রকুমার দে 'নটী বিনোদিনী' পালার কাহিনী সঞ্চয়ন করেছেন। রঙ্গমঞ্চের স্বনামধন্য প্রতিভাময়ী মহীয়সী অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর (১৮৬৩ খ্রীঃ – ১৯৪১ খ্রীঃ) জীবন কাহিনী ব্রজেন্দ্রকুমার পালায় রূপদান করেছেন। বারাঙ্গনা জন্মপরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে আগতা অভিনেত্রী বিনোদিনী কিভাবে বাঙালীর একান্ত নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিবেদন করেছেন, কী সীমাহীন বেদনা নিয়ে রঙ্গালয় থেকে বিদায় (১লা জানুয়ারী, ১৮৮৮ খ্রীঃ) নিয়ে সংসার জীবনে ফিরে গেছেন – এই নাটকে তা সবই প্রকাশিত

হয়েছে। সেই লাঞ্ছনা গঞ্জনার কথা বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন —-

" ইহা কেবল অভাগিনীর হৃদয় জ্বালার ছায়া। পৃথিবীতে কিছুই নাই, শুধু অনন্ত নিরাশা, শুধুই দুঃখময় প্রাণের কাতরতা। কিন্তু তাহা শুনিবার লোক নাই। মনের ব্যথা জানাইবার লোক জগতে নাই – কেননা, আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিনী, পতিতা। আমার আত্মীয় নাই, সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, এই পৃথিবীতে আমার বলিতে কেহই নাই। " ৩৬

বিনোদিনী দাসীর বেদনাসিক্ত জীবনের কাহিনী এ পালায় পরিবেশিত হলেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র এবং বিনোদিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে পালাকার এ পালায় ভক্তিরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্রকুমার দে দর্শক সমাজকে অভিভূত করতে প্রেমময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভক্তিমূলক পালা 'নটী বিনোদিনী' রচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে 'নটী বিনোদিনী' পালার চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করে নবরূপে আরেকবার যাত্রাপ্রেমী দর্শকদের তিনি প্রেমভক্তির অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকুমার দে ষোল আনাই সফল হয়েছেন। এ পালায় গিরিশচন্দ্র, সুরৎকুমার, বিনোদিনী, আমোদিনী, পান্নাবাঈ প্রভৃতি সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিসাগরে ডুব দিয়েছেন। এমন কি, অবাঙালী মারাঠী যুবক গুর্মুখ রায় পর্যন্ত ঠাকুরের দর্শন লাভ করে ধন্য হয়েছেন এবং পার্থিব লাভ লোকসানের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব 'রুক্মিনীহরণ' যাত্রাপালা অভিনয় করে যাত্রাপালাগানকে ধন্য করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে প্রেমময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব থিয়েটারের মাটিতে পদার্পণ করে রঙ্গালয়কে পবিত্র করেছেন।

হৃদয় ।। কি বাজে কথা বলছ? তুমি যাবে থিয়েটারে? মদো মাতাল গিরিশ ঘোষ এত পুণ্যি করেছে?

রামকৃষ্ণ ।। তো— শালাকে হাজারবার বলেছি, পাপকে ঘেন্না করবি, পাপীকে ঘেন্না করবি নি। কি গান শুনে এলি, গা দেখি শুনি। (সূচনা পর্ব)

একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণদের গিরিশের থিয়েটার দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না, সত্য সত্যই গিরিশ ঘোষের 'চৈতন্যলীলা' দেখতে রঙ্গালয়ে এলেন। তাঁর পদস্পর্শে বাংলার নাট্যশালা পবিত্র হল। সমাজের অবজ্ঞাত নট-নটীরা কৃতার্থ হোল। চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে তিনি চৈতন্য দান করলেন। শুধু তাই নয়, গুরুদ্রোহী গিরিশ ঘোষকে তিনি গুরু ভজিয়ে ছাড়লেন।

বিনোদিনী এই পালার কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। ভাগ্যের পরিহাসে পতিতালয়ে তার জন্ম হলেও পতিতাবৃত্তি তার ভালো লাগে না। তার মনে রয়েছে উত্তরণের স্বপ্ন। তার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে সে গিরিশ ঘোষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয় —

বিনোদ ।। আমাকে থিয়েটারে আশ্রয় দিন। এ জীবন আমি আর বইতে পাচ্ছি না। আমি কিছুই

জানি না। আপনি পাখীপড়া করে আমায় গড়ে তুলুন। আপনি যা বলবেন, আমি তাই শুনব। (১ম পর্ব, ১ম দৃশ্য)

গিরিশ ঘোষের আনুকূল্যে গণিকা বিনোদিনী হয়ে যায় নটী বিনোদিনী। কিন্তু পুরানো বৃত্তিতে ফিরে যাবার প্রলোভন আসে গুর্মুখ রায়ের কাছ থেকে। যেহেতু পূর্বেই তার মানসিক উত্তরণ হয়েছে, সেহেতু গুর্মুখ রায়ের দু'দু' হাজার টাকার টোপ সহজেই সে অগ্রাহ্য করতে পারে এবং সেইজন্য সানন্দে সে গ্রহণ করে থিয়েটারের মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরী। কাকুতি মিনতি করে সে অমৃতলালকে বলে —

বিনোদ ।। আমার অতীতকে আমি মুছে ফেলতে চাই। আপনারা আমায় সাহায্য করুন রসরাজ। আপনাদের এই সাধনার পীঠস্থানে আমাকে চিরদিন এমনি করে আশ্রয় দিন। দোহাই আপনাদের, আমার অতীতের পঙ্কে আর আমায় ঠেলে দেবেন না। মানুষ যে হতে চায়, তাকে মানুষ হতে দিন রসরাজ, মানুষ হতে দিন। (১ম পর্ব, ২য় দৃশ্য)

শত প্রলোভন, মানসিক পীড়ন ও অত্যাচারের মধ্যে অবস্থান করেও মানুষ হবার আদর্শে তার অবিচল থাকার প্রয়াস দর্শককে মুগ্ধ করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস। থিয়েটারের জন্য নিবেদিত প্রাণ বিনোদিনীর থিয়েটারের স্বার্থেই ধরা দিতে হয় গুর্মুখ রায়ের বাহুবন্ধনে। গিরিশ ঘোষের ইচ্ছানুসারে থিয়েটার গড়ার মহাযজ্ঞে সে নিজের জীবন আহুতি দেয়। অথচ থিয়েটারের নামকরণ "বিনোদিনী থিয়েটার" নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বিনোদিনীর নামে থিয়েটারের নাম রাখা হোক্ — এটা প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না গিরিশ ঘোষ। বলা যেতে পারে, গিরিশ ঘোষ তা করলেন না। বিনোদিনীর ক্ষোভ এভাবে শ্লেষোক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে —

বিনোদ ।। রহস্য করিনি রসরাজ। আমি গণিকার মেয়ে নাচলে দোষ হয় না, গাইলে লোকে শুনবে, অভিনয় করলে লোকে বাহবা দেবে। তাই বলে আমার নামে থিয়েটার আর তাতে কাজ করবেন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা, এ বড় লজ্জার কথা। (১ম পর্ব, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ধিক্কার বাণীতে সে মুখর। কেননা, এই অকৃতজ্ঞ ভদ্রলোকেরা থিয়েটারের স্বার্থে তার আত্মোৎসর্গের স্বীকৃতি দিলেন না।

বিনোদিনী কিন্তু তাদের সব ব্যাপার নীরবে সহ্য করে নি। শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত বিনোদিনীই সেদিন গুরুদ্রোহী হয়ে উঠেছে, যেদিন রঙ্গালয়ের মহান অতিথি রামকৃষ্ণদেবকে গিরিশ ঘোষ নেশার ঘোরে অপমান করে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন।

বিনোদ ।। থিয়েটার কি আপনার একার ? এ আমাদের সকলের পূজামন্দির। ঠাকুর আমাদের সকলেরই অতিথি। তাঁকে অপমান করে আপনি আমাদের সবাইকেই অপমান কচ্ছেন। (২য় পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ধন্য বিনোদিনীকে রামকৃষ্ণের সম্মুখেই তার ঘৃণ্য জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মদমত্ত গিরিশ ঘোষ তাকে মর্মান্তিক আঘাত হেনেছেন — 'অপমান। হারামজাদি বেশ্যা, তোর আবার অপমান।' (২য় পর্ব, ৫ম দৃশ্য) আহত বিনোদিনী গুরুদেব গিরিশ ঘোষের অশ্রাব্য কটূক্তির প্রত্যুত্তর না দিয়ে তার অন্তরের কথা অভিমানভরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করেছেন।

বিনোদ ।। উনি ঠিকই বলেছেন। সত্যই তো, আমার কিসের মান-অপমান? কাউকে কিছু বলবার অধিকারও আমার নেই। আমি অস্পৃশ্য নরকের কীট। (শ্রীরামকৃষ্ণকে) তুমি আমায় জাতে তুলতে চেয়েছিলে ঠাকুর। যাদের জন্য জীবনপাত করলুম, তারাই আমায় নিলে না। (২য় পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

এরপরে বিনোদিনী আর থিয়েটারের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি, বধূ বিনোদিনীরূপে রাঙাবাবুর হাত ধরে সংসার জীবনে প্রবেশ করেছে। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে সাহসিকতার সঙ্গে বিনোদিনীর সামাজিক স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে যাত্রাজগতে বিপ্লব ঘটালেন। নটী বিনোদিনীর জীবনের মিলনাত্মক পরিণতি তার বধূ বিনোদিনী রূপ —পালাকারের বলিষ্ঠ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কঠোর বাণিজ্যিক প্রযোজক নট্ট কোম্পানি 'নটী বিনোদিনী' পালা অভিনয়কালে বিনোদিনীর বধূ বিনোদিনী রূপটি দর্শকের সামনে প্রদর্শন করার সাহসিকতা দেখাতে পারে নি। " দেবতা দেয় তো পুরুতে খায় "—বিনোদিনীর ক্ষেত্রে সেটাই সত্য হোল। সামাজিক রক্ষণশীলতার জগদ্দল পাথর ভেঙে ফেলার কারিগরী কৌশল অবলম্বনের পথ পালাকার দেখালেও শঙ্কিত নট্ট কোম্পানি বিনোদিনীর বধূ বিনোদিনী রূপটি প্রদর্শন করা থেকে বিরত হয়েছিল।

এই পালায় গিরিশ ঘোষকে জাতীয় রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালীর নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অনিচ্ছুক বিনোদিনীকে তিনিই গুর্মুখ রায়ের কাছে আত্মসমর্পন করতে এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চতুর্দিকে অবস্থিত লোকজনের রামকৃষ্ণ ভক্তি তাঁর অসহ্য। তিনি নাস্তিক। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শিক্ষিত যুবকের ক্ষেত্রে অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। গিরিশচন্দ্র জীবনীকার অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তৎকালীন শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতের কথা জানিয়ে বলেছেন —

" সে সময়ে শিক্ষিত সমাজে একটা ধর্ম-বিপ্লবের দিন আসিয়াছিল। সনাতন ধর্মে অনাস্থা, চতুর্দিকে নব-নব মত উত্থিত। কি সত্য কি মিথ্যা স্থির করিতে না পারিয়া গিরিশচন্দ্রেরও তাদৃশ্য শ্রদ্ধা ছিল না। ক্রমে তিনি নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন।" ৩৭

এইরূপ সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই গিরিশচন্দ্র নাস্তিকতার কথা বলেন।

গিরিশ ।। ঠাকুর দেবতার কথা বলছ? আমার জীবনে ঠাকুর দেবতার স্থান নেই। আমিও তাদের বিশ্বাস করি না, তারাও আমায় বিশ্বাস করে না। (১ম পর্ব, ১ম দৃশ্য)

গিরিশকে আনতে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে পাঠালে গিরিশচন্দ্র যে কথা বলেছেন তাতে সেকালের গুরুবাদের বিরুদ্ধে জেহাদই ঘোষণা করা হয়েছে।

গিরিশ ।। Why? Why do I care for those ঠাকুরস? মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এরা তাদের পকেট কাটে, মুখের উচ্ছিষ্ট খাওয়ায়, পা টেপায়।
(১ম পর্ব, ১ম দৃশ্য)

এমন ঠাকুর সমালোচক নাস্তিকদের মনে হয় ঠাকুরেরা বেশি পছন্দ করে থাকেন। আমরা জানি,

নরেন্দ্রনাথও বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। পরে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাধন্য বিবেকানন্দ হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য এবং পয়লা নম্বর ভক্ত ছিলেন তিনি। এ নাটকেও আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর বিদ্বেষী নাস্তিক গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণস্নেহ লাভ করে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছেন। এই পর্যায়ে ঐতিহ্য প্রদর্শন করতে একাধিক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের ষোল আনা করুণাই আকাঙ্ক্ষা করেছেন —

গিরিশ ।। (নতজানু) তাই দাও ঠাকুর, ষোল আনাই আমাকে দাও। আমি গুণহীন ভক্তিহীন চরিত্রহীন মাতাল, নিজের সাধনায় তোমার কাছে কোনদিন পৌঁছুতে পারব না। তুমি নিজে আমায় টেনে নাও ঠাকুর। (২য় পর্ব, ২য় দৃশ্য)

পরিপূর্ণ ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্তের এ আত্মসমর্পণ। ঠাকুর এইরূপ একনিষ্ঠ সমর্পিত ভক্তের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা, তার পাপ তাপ সবই নিজে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন —

রামকৃষ্ণ ।। আমাকে বকল্‌মা দে।

গিরিশ ।। তাই নাও ঠাকুর (নতজানু হইলেন)। (২য় পর্ব, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

নটী বিনোদিনী যাত্রাপালার পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র রসরাজ অমৃতলাল বসু। পালাকার এই চরিত্রটিকে যথার্থই রসরাজ করে সৃষ্টি করেছেন। বিনোদিনীকে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে এলে গিরিশ ঘোষ এবং অমৃতলালের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তাতে হিউমার ফুটে উঠেছে।

গিরিশ ।। কার মেয়ে?

অমৃত ।। সরকারী মেয়ে।

গিরিশ ।। তুমি কি না-রসিয়ে কথা বলতে পার না অমৃত?

অমৃত ।। রসিয়ে না বলতে পারলে ত বসিয়ে দেবেন। ওই একটা গুণেই করে খাচ্ছি। রাজা সাজলে মানায় না, সাহেব সাজলে লোকে কুকুর লেলিয়ে দেয়, প্রেমিক সাজলে প্রেমিকা মূর্চ্ছা যায়। কাজেই প্রেমিকদের ভাঁড় সাজি, আর বস্তিতে ঘুরে আপনাদের নায়িকা কুড়িয়ে আনি। ওরে, বিনি এ দিকে আয়। (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

রসরাজ অমৃতলালের এইরূপ হিউমারের অন্তরালে মাঝে মাঝে অশ্রুর ফল্গুধারা প্রবহমান দেখা যায়।

অমৃত ।। আমরা যমের অরুচি বাংলা রঙ্গমঞ্চের বাপে-তাড়ানো মায়ে খেদানো অভিনেতা। বাড়িওয়ালা আমাদের বাড়িভাড়া দেয় না, দোকানী আমাদের ধার দিতে চায় না, মেয়ের বাপেরা আমাদের শ্বশুর হতে নারাজ। যম আমাদের ধারে কাছেও ঘেঁষবে না গুরু, আপনার বিষ্ঠা মাখবার দরকার নেই। (১ম পর্ব, ৩য় দৃশ্য)

অথবা তিনি যখন বলেন — " পাঁচ হাজার টাকা পেলে আমি আমার স্ত্রীর আবার বিয়ে দিতে রাজী আছি " (ঐ, ৬ষ্ঠ দৃশ্য) তখন হাস্যরসের পশ্চাতে দারিদ্র্যরূপ করুণ রসের সন্ধান মেলে।

বিনোদিনীর বঞ্চনা-লাঞ্ছনায় অমৃতলালের মর্মবেদনা বা অভিনেতা হিসাবে তাঁকে অবহেলার মনোবেদনা এতটুকুও অপ্রকাশ্য থাকে নি।

এ পালার পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে দাশু নিয়োগী ভিন্নতর ব্যক্তিত্ব। প্রায় সকল চরিত্র রামকৃষ্ণ ভক্তিসাগরে অবগাহন করে ধন্য হয়েছে। কিন্তু দাশু নিয়োগী তার ব্যতিক্রম। তিনি ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার। ব্যবসাটা তিনি ভালোই বোঝেন। লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ তাঁর নখদর্পণে। ষ্টারে 'প্রহ্লাদ চরিত্র (২২ শে নভেম্বর ১৮৮৪)-র যে সময় অভিনয় চলছিল, সে সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারেও রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনা 'প্রহ্লাদ চরিত্র' মঞ্চস্থ হচ্ছিল। সেখানে দর্শক-সমাগম তুলনামূলকভবে অধিক হওয়ার জন্য মূলতঃ বিনোদিনীকেই দায়ী করা হয়। বিনোদিনীর অপরাধ, রামকৃষ্ণ ভক্তিতে সে সময়ে সে মগ্ন ছিলো। দাশু নিয়োগী ম্যানেজারী উষ্মার সঙ্গে বিনোদিনীকে তার অমনোযোগিতা ও নিষ্ঠাহীনতার কথা জানিয়ে বলেন —

দাশু ।। আসল কথা, যে উদ্যম নিয়ে তুমি নিমাই করেছিলে. সে উদ্যম তোমার আর নেই।

বিনোদ ।। তখনও আপনি বলেছিলেন — যে উদ্যম নিয়ে তুমি সতী করেছিলে আজ আর তা নেই। আপনার চোখে আমি কখনও ভাল হতে পারব না।

দাশু ।। তোমাদের এই শ্রেণীর মাগীদের সোজা কথা বলার অভ্যাস নেই।

বিনোদ ।। শ্রেণীর কথা তো রোজই বলেন। পুরানো কাসুন্দী না ঘেঁটে আপনি সোজা করে বলুন কি করতে চান।

দাশু ।। বলতে চাই, চাকরী আর বৈরাগ্য একসঙ্গে চলে না। ঠাকুরের আশীর্বাদে চৈতন্য বড় বেশী হয়েছে তোমার। আজ যেন আরও চৈতন্য উনি চাপিয়ে না দেন। বুঝেছ?

(২য় পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

বিনোদিনীর নামে থিয়েটারের নামকরণের প্রস্তাবে তিনি তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর অসম্মতির কারণ হিসাবে তিনি যে যুক্তি স্থাপন করেছেন তা একজন ম্যানেজারেরই সাজে —" কিন্তু দর্শক ত চাই। বেশ্যার নামে থিয়েটার হলে কোন দর্শক আসবে না।" (১ম পর্ব, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

বিনোদিনীর মাতা আমোদিনী বিগতা-যৌবনা বারাঙ্গনা। স্বভাবতই সে চায় তার কন্যা তার বৃত্তিই গ্রহণ করে মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করুক। কিন্তু বিনোদিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে। শিল্পীর সম্মান নিয়ে সে থিয়েটারে অভিনয়ের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়। সে কারণে গুমূর্খ রায়ের হাজার প্রলোভন ত্যাগ করতে তাকে চিন্তা করতে হয় না। মেয়ের পাগলামী এবং একগুঁয়েমী মনোভাবে আমোদিনী মেয়ের ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে কাঁটা হয়ে যায়। যৌবন থাকতে থাকতে ভালোভাবে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে সে মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করে —

আমোদ ।। হারামজাদি, এত বড় মানুষটাকে তোর গেরাহ্যি হোল না? তোর কোন্ বাপ তোকে বাড়ি গাড়ি দেবে লা? কে তোকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে রাখবে? থিয়েটারের ঐ সওয়া ছ'গণ্ডা টাকায়ই তোর জীবন কাটবে? রূপ-যৌবনে কি ভাঁটা পড়বে না? মুখের কথা বল, ভদ্রলোককে ডেকে আনি।

বিনোদ ।। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমায় আর এ পথে টেনে নিও না। কুমার বাহাদুর চলে গেছে, এবার আমায় ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে দাও। (পদধারণ)

আমোদ ।।ভদ্রভাবে জীবন কাটাবি? মা দিদিমা যে পথে চলেছে, সে পথে চলবি না তুই? দূর দূর, বেরো আমার চোখের সামনে থেকে। (বিনোদকে পা দিয়ে ঠেলিয়া প্রস্থান)

(১ম পর্ব, ২য় দৃশ্য)

চরিত্রানুযায়ী গ্রাম বাংলার মুখের বুলিতে এ সংলাপ অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমোদিনী যৌনকর্মী হলেও মমতাময়ী মা। রাজাবাবুর হাত ধরে বধূ বিনোদিনী রূপে যখন বিনোদিনী তার জন্মদাত্রী মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীর ঘরে চলে যাচ্ছে, তখন আমোদিনী কল্যাণময়ী মায়ের ন্যায় আশীর্বাদ করে বিনোদিনীকে বলেছে —" কত বকেছি, কত হেনস্থা করেছি, কিন্তু কিছু মনে রাখিস না মা। আমার ঘরে কোনদিন শান্তি পাস নি। এবার তুই সুখী হ। " (৩য় পর্ব, ৩য় দৃশ্য) চিরকালীন মাতৃমূর্তিতে আমোদিনী চরিত্র এখানে সার্থক হয়ে উঠেছে। একাকিনী মায়ের কষ্টকর অবস্থার কথা চিন্তা করে প্রতিবাৎসল্যরূপী বিনোদিনী মাকে জিজ্ঞাসা করেছে —

বিনোদ ।। আমাকে ছেড়ে তুমি কি নিয়ে থাকবে মা?

আমোদ ।।ঠাকুরের ছবিখানা রইল, ওই নিয়েই থাকব।

সুকৌশলে পালাকার আমোদিনীকে শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ ভক্তিতে অবগাহন করিয়েছেন তাই নয়, বিনোদিনীর পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে এই দৃশ্যে মাতা ও কন্যার এই সংলাপে বাঙালী পরিবারের আবহমানকালের বিচ্ছেদকালীন চিত্রও তিনি অতি যত্নে চিত্রিত করেছেন।

রাখাল মহারাজ এ পালার বিবেক চরিত্র। ষাটের দশকে যাত্রায় বিবেকের ভূমিকার পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে কেবলমাত্র গান গেয়ে নাটকের পাত্রপাত্রীদের বিবেক জাগ্রত করে না, অন্যান্য চরিত্রের ন্যায় সংলাপের মাধ্যমেও তাদের শুভবুদ্ধি জাগাতে চেষ্টা করে। এ পালায় রাখাল মহারাজ এইরূপ পরিবর্তিত আধুনিক বিবেক চরিত্র।

ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর অন্যান্য যাত্রাপালার ন্যায় এই পালানাটকেও মার্জিত রুচিবোধের ছাপ রেখেছেন। গণিকার জীবনকাহিনী আশ্রিত এই নাটকে পতিতালয়ের দৃশ্য একাধিকবার প্রদর্শিত হলেও কোথাও নগ্ন নৃত্য বা কুৎসিত দৃশ্য পরিবেশিত হয় নি। ব্রজেন্দ্রকুমার স্বরচিত একটি প্রবন্ধে এই নাটক রচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন —

> " আমি চেয়েছিলাম, আদিরসের পরিবেশকদের দেখাতে যে গণিকাপল্লীর পটভূমিকাতেও আদিরস ও অশ্লীল সংলাপবর্জিত দৃশ্য রচনা করা যায়। বিনোদিনীর মধ্যে জন্মগত ও সমাজের আরোপিত ক্লেদ থেকে উদ্ধার পাবার যে কামনা তাই আমার পালায় সোচ্চার হয়েছে। " ৩৮

এ নাটকে গানের সংখ্যা বারো। প্রখ্যাত যাত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্তার মধুর কণ্ঠে এ পালার " হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় " গানটি যখন আসরে ধ্বনিত হোত, তখন দেখতাম দর্শকেরা ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে অশ্রুসিক্ত হতেন এবং এইরূপ ভক্তিরসের প্লাবনে গ্রাম-

গঞ্জের আসর উদ্বেলিত হয়ে উঠত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ করে দর্শকভক্তেরা ধন্য হতেন। ইদানীংকালেও সখের যাত্রাদলগুলি এ পালাভিনয় করে দর্শকদের আনন্দ দান করে থাকেন।

'নটী বিনোদিনী' পালা রচিত হলে নটসূর্য সূর্যকুমার দত্ত মহাশয় পালাখানি পাঠ করেন। পালাকারপুত্র তরুণকুমার দে একদিন সূর্য দত্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "নটী বিনোদিনী কেমন লাগল?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "এ পালা যদি চার আনা অভিনয় হয়, ষোল আনা যশ হবে।"

এই পালাভিনয়ে সূর্যদত্তের অভিমত অক্ষরে অক্ষরে মিলেছিল। এই পালার কাহিনী, সংগীত এবং উপস্থাপনা পালাটিকে জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। মিলনান্তক পালাখানি ভক্তিরস, করুণরস ও হাস্যরসের সমন্বয়ে রসসার্থক হয়েছে।

ভরত বিদায় (মহীয়সী কৈকেয়ী) (১৯৬৬) — ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক যাত্রাপালা। নির্মল সাহিত্য মন্দির ১৯৬৬ সালে পালাখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। ১৫৯ পৃষ্ঠার পুস্তকখানির বিক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ টাকা। নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি এই পালা প্রথম প্রযোজনা করে।

এই যাত্রাপালায় মোট আঠারোটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, যার মধ্যে স্ত্রী চরিত্রের সংখ্যা পাঁচ। দুটি পর্বে বিভক্ত পালানাটকটিতে একাধিক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পালার সূচনাতে 'বনপথ' নামে একটি পৃথক দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে এই পৌরাণিক যাত্রাপালাটির কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণের 'অযোধ্যাকাণ্ড' থেকে সঞ্চয়ন করেছেন। তবে পালাকার 'ভরত বিদায় বা মহীয়সী কৈকেয়ী' পালা রচনার ভাবাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পূর্বসূরী বিখ্যাত যাত্রাপালাকার ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী বিরচিত 'কৈকেয়ী' যাত্রাপালা থেকে।

বাল্মীকি রামায়ণে চিত্রিত কৈকেয়ী আমাদের সকলের মানসপটে ধরা আছে — তিনি বহুনিন্দিত, তিনি পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর, লোভী এবং হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির নারী। তিনি সমগ্র মানবকুলের ঘৃণার পাত্রী। ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিশীলতায় বাল্মীকি রামায়ণের বহুনিন্দিত কৈকেয়ী চরিত্রের নবমূল্যায়ন করে তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন। তাঁর নাটকে কৈকেয়ী সমগ্র মানবজাতির সহানুভূতি লাভ করেছেন। ব্রজেন্দ্রকুমার এ পালার ভূমিকায় বলেছেন —

> " যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া এই নাটকে বহুনিন্দিত রাক্ষসী কৈকেয়ীকে রূপ দেওয়া হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ দর্শক, শিল্পী, সাহিত্যিক, গৃহী ও সন্ন্যাসী তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। " ৩৯

বাল্মীকি রামায়ণে আছে, নিজ মনোবাসনা চরিতার্থ করতে কৈকেয়ী তাঁর অঙ্গীকারবদ্ধ স্বামী দশরথের কাছ থেকে দুটি বর সময় বুঝে চেয়ে নিয়েছিলেন। প্রথম বরে, কৈকেয়ী আপন পুত্র ভরতকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজমাতা হয়েছিলেন এবং ভরতের সিংহাসন

নিষ্কণ্টক করতে দ্বিতীয় বরে রামচন্দ্রকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। 'ভরত বিদায়' নাটকেও রানী কৈকেয়ী দশরথের নিকট দুটি বর প্রার্থনা করেছেন, তবে ভিন্ন অভিপ্রায়ে। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৈকেয়ীকে বর প্রার্থনা করতে হয়েছে। নিজের জন্য নয়, এমনকি, আত্মজ ভরতের জন্যেও নয় — দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুরোধে তিনি প্রাণাধিক প্রিয় রামকে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। পালায় দেখা যায়, রামচন্দ্রকে আশ্রমে নিয়ে যাবার জন্য বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট গেছেন কিন্তু তাঁকে রাজা দশরথের কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। আর্যভূমি ভারতবর্ষ থেকে অনার্যশক্তি নির্মূল করতে এবং তাদের নেতা রাবণকে নিধন করার জন্য একজন শক্তিশালী বীরের আবশ্যক। রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট কোনো রাজা বা ব্যক্তির দ্বারা সে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বনে বাস করে, রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, বজ্রপাত-অগ্ন্যুৎপাতের বিভীষিকাময় রূপ প্রত্যক্ষ করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা লৌহমানবই একমাত্র আর্যশক্তিকে অনার্য রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে — বিশ্বামিত্রের এই রকমই বিশ্বাস।

সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিশ্বামিত্র অতঃপর মাতা কৈকেয়ীর শরণাপন্ন হন এবং তাঁকে রাজা দশরথের নিকট তাঁর প্রাপ্য বর দুটি গ্রহণের পরামর্শ দেন। এমনকি, ভরতের রাজা হওয়ার কথা ও রামচন্দ্রের চোদ্দ বছরের জন্য নির্বাসনের কথাও তিনি মাতা কৈকেয়ীকে বলে দেন। বিশ্বামিত্রের অভিপ্রায় শুনে কৈকেয়ীর মাথায় যেন আকাশটা ভেঙে পড়ে। নয়নের মণি, হৃদয়ের ধন, প্রিয় রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ এবং পতিব্রতা স্ত্রী হয়ে স্বামীর হৃদয় বিদীর্ণ করা কৈকেয়ীর পক্ষে দুঃসাধ্য কাজই নয়, সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য কাজ।

কৈকেয়ী ।। ওরে, পৃথিবীতে কি আগুন ধরে গেল। আকাশটা কি ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কি যোগনিদ্রায় অভিভূত? মহর্ষি, দুটি পায়ে পড়ি আপনার, কন্যাকে দয়া করুন। এমন কথা আমি উচ্চারণ করতে পারব না। পৃথিবী কলঙ্কে ভরে যাবে।

(১ম পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

কৈকেয়ীর মধ্যে আর্যসত্তা জাগ্রত করতে, জাতিপ্রেম ও দেশপ্রেমে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে পৃথিবীতে যে অনার্য-অত্যাচারের আগুন জ্বলছে সে কথা কৈকেয়ীকে স্মরণ করিয়ে দিতে মহর্ষি ভোলেন না।

বিশ্বামিত্র ।। মানবজাতির আজ চরম দুর্দিন। নারীরা আর স্বামীর ঘর করতে পারবে না, মুনি ঋষিদের যাগযজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাবে, সমগ্র পৃথিবী বর্ণ সংকরে পরিপূর্ণ হবে।

(১ম পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

অবশেষে, বিশ্বামিত্রের অনুরোধ এবং তাঁর যুক্তির কাছে হার মানলেন কৈকেয়ী। অনার্য-শক্তির কবল থেকে আর্যজাতিকে, আর্যকৃষ্টি সংস্কৃতি ও আর্য সভ্যতাকে রক্ষা করতে কৈকেয়ী কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নিলেন। স্নেহ-মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক হৃদয়বৃত্তিগুলি জলাঞ্জলি দিয়ে জগতের বৃহত্তর স্বার্থে কৈকেয়ী নিজেকে সঁপে দিলেন —

কৈকেয়ী ।। ....যান মহর্ষি, যত কলঙ্কই আমার গায়ে ছাপ মারা থাক, তবু পৃথিবীর মঙ্গল হোক, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হোক। এতদিন মা ছিলাম, আজ হব রাক্ষসী।

(১ম পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

কৈকেয়ী বিশ্বামিত্রকে কথা দিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই রাজা দশরথের নিকট তাঁর পক্ষে শেলস্বরূপ অনভিপ্রেত বর দুটি চাইতে পারছিলেন না। অবশেষে হৃদয় পাষাণ করে তাঁকে আঘাত হানলেন বটে, কিন্তু রামচন্দ্রের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলেন না। অস্ফুট ব্যথা-বেদনাহীন, নির্বিকার রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে মাতা কৈকেয়ীর মনুষ্যত্ব তাঁর আপন হৃদয়ের গভীরতম স্থানে আঘাত হানে, বেদনাহত কৈকেয়ী পুত্রাধিক রামচন্দ্রকে বলেন —" তুমি কিছু বলবে না রাম? বল, বল, না হয় তীর-ধনুক নিয়ে এস, তাড়কা রাক্ষসীর মত আমাকে হত্যা কর। " (১ম পর্ব, ৭ম দৃশ্য) স্নেহের তীব্রতায় এরপর কৈকেয়ী কালস্রোতকে স্তব্ধ হয়ে যেতে প্রার্থনা করেছেন —

কৈকেয়ী ।। কালরাত্রি, তুমি আর ভোর হয়ো না, সূর্যদেব, তুমি ঘুমিয়ে থাক। রাত্রি প্রভাত হলে রাম বনে চলে যাবে, অযোধ্যা অন্ধকার হয়ে যাবে। সে দুর্দিন যেন না আসে ঠাকুর, সে দুর্দিন যেন না আসে। (১ম পর্ব, ৭ম দৃশ্য)

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মনে পড়ে যায়, মধুসূদনের বিখ্যাত পংক্তি – " যেও না রজনী আজি লয়ে তারা দলে। " কন্যাকে বিদায় দিতে অনিচ্ছুক মাতা মেনকাও স্নেহের আতিশয্যে নবমীর নিশিকে পোয়াতে নিষেধ করেছেন। নিশি পোয়ালেই দশমীর সকালে ভোলানাথ এসে হাজির হবে উমাকে নিয়ে যেতে। এক বছরের জন্য পিত্রালয় ছেড়ে উমার অধিষ্ঠান হবে কৈলাশে। যাই হোক, ভরতের রাজ্যাভিষেকের দিনেই শুরু হল রামচন্দ্রের সানন্দে বনবাস জীবন — রামচন্দ্রের লৌহমানবে পরিণত হবার কৃচ্ছ্র সাধনা। কিন্তু অন্তরালের সত্য ঘটনাটি কেউ-ই জানল না। দশরথ-শত্রুঘ্ন থেকে শুরু করে রাজবাড়ির সকলেই দেখতে পেল কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতা, তাঁর রাক্ষসীপনা। দেশ ও জাতির স্বার্থেই এবং রামচন্দ্রের কল্যাণার্থেই যে রামের বনবাস-নির্বাসন, সে সত্য সকলের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল। কেবলমাত্র জানতেন বিশ্বামিত্র, আর জানতেন মাতা কৈকেয়ী। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিয়োগান্তক এই নাটকের নেপথ্য কাহিনী রহস্যাবৃত রেখে বহু নিন্দিত, বহু ধিকৃত কৈকেয়ীর প্রতি আসরে সমবেত দর্শক-শ্রোতাদের সমবেদনা সুকৌশলে লাভ করাতে প্রয়াসী হয়েছেন। বলাবাহুল্য, সেক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন।

সকলের চোখে কৈকেয়ী রাক্ষসী, কলঙ্কিনী হলেও অন্তরে তিনি বাৎসল্যময়ী মা। তিনি যেমন ভরতের মা, তেমনই রামচন্দ্রেরও মা। এক নিষ্ঠুর নিয়তির অঙ্গুলি হেলনে তিনি তাঁর মাতৃত্বের, স্নেহময়তার পরিচয় দিতে অসমর্থ হলেন। এক স্নেহশীলা সন্তানবৎসলা জননী সকলের অগোচরে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে কেঁদে কেঁদে তাঁর হৃদয়বেদনা প্রকাশ করেছেন, বিলাপ করেছেন তাঁর কৃতকর্মের জন্য। মঙ্গলময়ী মাতা কৈকেয়ী সদাই রামচন্দ্রের বিপদের আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে নিজের মৃত্যুকামনা করেছেন।

কৈকেয়ী ।। এমন ছেলে কার ছিল? আমার জন্যে যে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারত। আর আমি তাকে —

বিশ্বামিত্র ।। তুমি তাকে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছ মা।

কৈকেয়ী ।। বিদ্যালয়। সিংহ বাঘ রাক্ষসে ঘেরা সে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সে ফিরে আসবে, এই আপনি আশা করেন?

বিশ্বামিত্র ।। শুধু আশা কচ্ছি না মা। সে শুভদিন আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কৈকেয়ী ।। আশীর্বাদ করুন ঋষি, সেদিনের আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

বিশ্বামিত্র ।। মরবে কেন মা? সেদিনের জন্যে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। রাম ফিরে এসে প্রথমে তোমাকেই প্রণাম করবে মা।

কৈকেয়ী ।। আমাকে।

বিশ্বামিত্র ।। হ্যাঁ মা, সেদিন জগদ্বাসী জানবে, কৈকেয়ী তাকে নির্বাসনে পাঠায় নি, পাঠিয়েছিল পাঠশালায়, পাঠিয়েছিল জগতের কল্যাণে অনার্যমেধ যজ্ঞ করতে।

(২য় পর্ব, ৩য় দৃশ্য)

কৈকেয়ীর অন্তর্বেদনা সহস্র গুণ বৃদ্ধি পায় যখন জানকী এসে তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

সীতা ।। কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব মা? তুমি জন্ম জন্ম আমার মা হও। (কৈকেয়ীর পদতলে পতন)

কৈকেয়ী ।। ওঃ — মহর্ষি, এই তোমার চরম আঘাত। ওঠ সীতা, ওঠ, আমার সিঁথির সিঁদুর তুলে নিয়ে তোমার ললাট আমি রাঙিয়ে দিলাম। আমার শঙ্খবলয় আমি তোমার হাতে পরিয়ে দিলাম। এ সিঁদুর কখনও মুছে যাবে না, এ বলয় কোনদিন ভাঙবে না।

(২য় পর্ব, ৩য় দৃশ্য)

রাম-সীতা ও লক্ষ্মণ তিনজনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বনবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে কৈকেয়ী শাখাপ্রশাখাহীন বৃক্ষের ন্যায় আহত এবং পঙ্গু হয়ে পড়েন এবং স্বামী দশরথের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর পদতলে কান্নায় ভেঙে পড়েন —

দশরথ ।। (উঠিয়া) কে? অন্ধক মুনির অভিশাপ কি মূর্তি ধরে এসেছে?

কৈকেয়ী ।। শান্ত হও রাজা। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু তোমায় বলবার উপায় নেই। ওগো, রামকে আমি দণ্ড দিই নি, দিয়েছে আমার নিয়তি। কেমন করে বোঝাব, তোমার চেয়ে আমার ব্যথা একটুও কম নয়। দাসীকে ভুল বুঝো না রাজা। (পদধারণ)

দশরথ ।। দাসী-দাসী, রাক্ষসী-দাসী। (পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া প্রস্থান) (২য় পর্ব, ৪র্থ দৃশ্য)

বহির্জগৎ থেকে পাওয়া লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক কৈকেয়ীর মর্মজ্বালা। তাঁর চোখে জল দেখে বিশ্বামিত্র প্রশ্ন করলে তিনি বলেন —

কৈকেয়ী ।। এ আনন্দাশ্রু মহর্ষি, শোকাশ্রু নয়। সপত্নীপুত্র রাম, তার জন্যে কিসের মমতা? তবে কি জানেন? বোকা ছেলেটা একবার প্রতিবাদ করলে না? এত বড় দণ্ড মাথায় করে নিঃশব্দে চলে গেল? যাবার সময়ও আমায় প্রণাম করতে ভোলে নি।

কৈকেয়ী ।। আর এই বউটাই বা কি? তোর স্বামীকে আমি বজ্রাঘাত করলাম — বজ্রাঘাত নয় তো কি? আর তুই আমাকে একটা কটূ কথা বলতে পারলি না?

বিশ্বামিত্র ।। সে যে ধরিত্রীর মেয়ে মা। ধরিত্রীর মতোই সে সহিষ্ণু।

কৈকেয়ী ।। সবাই সহিষ্ণু, আর আমিই কি শুধুই চুরির দায়ে বাঁধা পড়েছি। প্রজারাও কি একবার

ছুটে এসে আমার মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারতে পারে না? আমি বাঁচব কি নিয়ে? স্বামী কাছে যেতে দেয় না, দিদি উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, সুমিত্রা বুকে হাত বুলিয়ে দেয় — যেন আমারই সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি কি পাগল হয়ে যাব? আপনি বলুন।

(২য় পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

স্তোকবাক্য ছাড়া সেদিন বিশ্বামিত্রের কিছুই দেবার ছিল না। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং প্রিয়জনদের আচরণে কৈকেয়ী কিন্তু মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর বিরাট সর্বনাশ হয়ে গেছে। কেননা, রামচন্দ্র যে তাঁর গর্ভজাত সন্তান ভরতের চেয়ে অধিকতর ভালোবাসে ক্রুদ্ধ ভরতের আচরণে কৈকেয়ী তা উপলব্ধি করেন।

ভরত ।। গঞ্জনা জননি? তোমারে বধিলে হায়
রাম মোর দেখিবে না মুখ।
নহে এই দণ্ডে শিরশ্ছেদ করি তব
জুড়াতাম হৃদয়ের জ্বালা। (২য় পর্ব, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

দশরথ, ভরত প্রভৃতির কাছ থেকে যখন কৈকেয়ীর উপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, নিন্দা ও ধিক্কার বর্ষিত হচ্ছে তখন পালাকার বিশ্বামিত্রসহ কৈকেয়ীকে চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্রের পর্ণকুটিরে রামচন্দ্রের সামনে উপস্থিত করলেন এবং রামচন্দ্রের হাত দিয়েই ব্রজেন্দ্রকুমার কৈকেয়ীর কলঙ্ক মোচন করলেন।

কৈকেয়ী ।। রাম, আমার উপর রাগ হচ্ছে না তোমার?

রাম ।। না মা, না। আমি জানি, মা যখন পুত্রকে কশাঘাত করে, সে তার মঙ্গলের জন্য, আর সে কশাঘাতের যন্ত্রণায় মায়ের বুকটাও রক্তাক্ত হয়ে যায়। তোমার চোখে শ্রাবণের ধারা আর কেউ না দেখলেও আমি ঠিক দেখেছি মা। (২য় পর্ব, ৭ম দৃশ্য)

কৈকেয়ী সম্পর্কে রামচন্দ্রের এইরূপ উচ্চ মনোভাবেই কৈকেয়ীর ব্যথিত হৃদয় সকলের সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে যায় এবং তিনি ভূষিতা হন মহীয়সীরূপে, মহত্ত্বে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেন কৈকেয়ী চরিত্র। ব্রজেন্দ্রকুমারের রচনায় বাল্মীকি রামায়ণের কলঙ্কী কৈকেয়ী রূপান্তরিত হয়েছেন গরীয়সী মহীয়সীরূপে। এইরূপ নব ব্যাখ্যা লাভ করে কৈকেয়ী দর্শক সহানুভূতি অর্জন করেছেন এবং পালাখানি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। ব্রজেন্দ্রকুমারের মতে, "ভরতবিদায় বা মহীয়সী কৈকেয়ী' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর পালাখানির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলেছেন —

" এই নাটকে কৈকেয়ী চরিত্রের নবমূল্যায়ন করা হয়েছে। কৈকেয়ীর দ্বৈতচরিত্র এই নাটকটিকে দর্শকের চোখে দীর্ঘকাল আকর্ষণীয় করে রেখেছিল। এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, কৈকেয়ী নির্মম ছিলেন না। রামকে তিনি চিরকালই স্নেহ করতেন। তাঁকে তিনি বনবাসে পাঠান নি, পাঠিয়েছিলেন পাঠশালায়। আগুনে পুড়িয়ে জলে ভিজিয়ে খাঁটি মানুষ করবার জন্য। 'সি ইজ দি সিম্বল অব কনসাস উইল অ্যাণ্ড সোসাল নেসেসিটি'। একাধারে কৈকেয়ী রামের কল্যাণের নিমিত্ত এবং অপরপক্ষে দেশ ও মানুষের মঙ্গলের জন্য সংকল্পে অটল"। ৪০

স্বনামধন্য নাট্যকার মন্মথ রায় এই পালানাটকের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এখানে তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য —

" নট্ট কোম্পানিতে অভিনীত ব্রজেন্দ্রকুমারের 'ভরত বিদায় বা মহীয়সী কৈকেয়ী' নাটকটি পড়ে মনে হয় রামায়ণী কাহিনীর মূল কাঠামোটি ঠিক রেখে কৈকেয়ীর এই চরিত্র চিত্রণের কল্পনা-কুশলতা সত্যই অভিনব"। ৪১

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে কেবলমাত্র কৈকেয়ী চরিত্রেরই নবমূল্যায়ন করেছেন তা নয়, তাঁর রচনাধারায় বিভিন্ন যাত্রাপালার একাধিক চরিত্র যেমন শকুনি, দুর্যোধন, মেঘনাদ, জাহান্দার শাহ, কায়কোবাদ, রিজিয়া প্রভৃতি চরিত্রেরও নবমূল্যায়ন করে চরিত্রগুলিতে একটা অভিনব মাত্রা যুক্ত করেছেন।

নাটকখানির সংলাপ নির্মিতিতেও বিশেষ মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর প্রতিভাত। ব্রজেন্দ্র-পূর্বযুগে যাত্রাপালায় সুদীর্ঘ সংলাপ প্রচলিত ছিল। অন্যান্য একাধিক যাত্রাপালার ন্যায় এ পালাতেও ব্রজেন্দ্রকুমারের হাতে সংলাপ সংক্ষিপ্ত হয়েছে অথচ এ নাটকের সংলাপ অত্যন্ত সাবলীল ও আন্তরিক। এ বিষয়ে থিয়েটারী সংলাপরীতি তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে আমাদের মনে হয়। প্রথিতযশা যাত্রানাট্যকার মন্মথ রায় পালাকারের সংলাপ রীতির সাফল্য সম্বন্ধে বলেছেন —

" ব্রজেন্দ্রকুমার কর্তৃক যাত্রাগানে বহুল ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত সংলাপরীতি ব্যর্থ হয় নি এই জন্য যে, তিনি যাত্রাগানে ঘটনা সংস্থাপনে প্রথম থেকেই নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করে শ্রোতাদের মনোযোগ দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে যান, যাতে সংক্ষিপ্ত সংলাপও শ্রোতা অবহেলা করার সুযোগ না পান। কাজেই দেখা যাচ্ছে, থিয়েটারের সংলাপরীতি যাত্রাগানেও জয়যুক্ত হতে পারে ব্রজেন্দ্রকুমারের সংলাপ তার নিদর্শন।" ৪২

পরিশেষে বলা যায়, করুণ, রৌদ্র ও বীর রসের সমন্বয়ে রচিত 'ভরত বিদায় বা মহীয়সী কৈকেয়ী' বিয়োগান্তক যাত্রাপালাটি বিশিষ্ট অর্থে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পালারচনার ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই পালাটি যেন একটি নূতন ভাবনার 'চ্যালেঞ্জ', যা একটি দুঃসাহসিক প্রয়াস। রামায়ণের অন্যতম প্রধান নিন্দিত চরিত্র কৈকেয়ীকে মহীয়সীরূপে প্রতিষ্ঠা করা এক দুরূহ কাজ। বলাবাহুল্য, পালাকার সুকৌশলে (বিশ্বামিত্র চরিত্রের ব্যবহারে) কৈকেয়ীকে শুধুমাত্র ভরতের জননী বা রামচন্দ্রের বিমাতা করেন নি, তিনি কৈকেয়ীকে করে তুলেছেন রাজা দশরথের অন্যতমা পত্নী, যিনি রাজ্যের রানী হিসাবে দেশ ও প্রজাকুলের মঙ্গল কামনায় সুকৌশলে অশুভ শক্তির প্রতীক রাবণের ধ্বংসকে অনিবার্য করে তুলেছেন। নাটকের শেষাংশে রামচন্দ্রের সংলাপের মাধ্যমে কলঙ্কিনী কৈকেয়ী চরিত্রটি মহত্ত্বে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কৈকেয়ী চরিত্রের এই নবমূল্যায়ন, কাহিনীর বিন্যাস, সংলাপ এবং চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যাত্রাপালাটি সার্থক নবরূপ লাভ করেছে।

পরাজিত মেঘনাদ (মেঘনাদ বধ) (১৯৭৬) — পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র জীবনের সর্বশেষ এবং তাঁর রচিত যাত্রাপালাগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রাপালা 'পরাজিত

মেঘনাদ' বা 'মেঘনাদ বধ'। সাহিত্যমালা প্রকাশনী সংস্থা পৌরাণিক এই নাটকটি প্রকাশ করে। ১৫৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানির মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা। মোহন অপেরা এই পালাভিনয় করে অশেষ জনসমাদর লাভ করেছিল। জনপ্রিয় এই যাত্রাপালাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত যাত্রা উৎসবে পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পরিবারের পক্ষ থেকে সে পুরস্কার গ্রহণ করা হয় নি। এই পালানাটকের ভূমিকায় পালাকার পুত্র শ্রীতরুণ কুমার দে সেই কথা জানিয়েছেন -

> " পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রা উৎসবে এই পালার জন্য পালাকারকে শ্রেষ্ঠ পালাকারের পুরস্কার দেওয়া হয়। সঙ্গত কারণেই সে পুরস্কার গ্রহণ করা হয় নি।" ৪৩

পরাজিত মেঘনাদ যাত্রাপালার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষিত পুরস্কার কোন্ সঙ্গত কারণে ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল একটি সাক্ষাৎকারে ব্রজেন্দ্রকুমারের পুত্র শ্রীতরুণ কুমার দে -র নিকট এ বিষয়ে জানতে আগ্রহী হলে তিনি বলেন —

> " পশ্চিমবঙ্গ সরকার একদা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, যে সকল যাত্রাপালাকারদের পশ্চিমবঙ্গ সবকারের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে, তাদেরকে সরকারের তরফে কোনো পুরস্কার প্রদান করা হবে না। ব্রজেন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে সরকার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। তথাপি সম্ভবত ভুলবশতঃ ব্রজেন্দ্রকুমারকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। সে কারণেই পালাকার পত্নী শ্রীমতী নীহারকণা দে সে পুরস্কার গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিলেন "। ৪৪

চারজন স্ত্রী-চরিত্রসহ এ পালায় মোট ষোলটি চরিত্র আছে। যাত্রাপালার প্রারম্ভে 'সূচনা' এবং পরিশেষে 'পার্শ্বপট' নামে দুটি দৃশ্যসমেত নাটকটি দুটি পর্বে বিভক্ত। নাটকটির 'পূর্বকথা' নামে একটি পর্ব আছে। দুই পর্বে বিভক্ত পালাটির প্রত্যেক পর্বে একাধিক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" (১৮৬১) কাব্য ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'পরাজিত মেঘনাদ' (১৯৭৬) পালার দিশারী। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে বাল্মীকি রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণ, রাবণ-মেঘনাদ প্রভৃতি চরিত্র সকলের নব ব্যাখ্যা করেছেন। সধুসূদনের কাব্যে চারিত্রিক গুণাবলীতে রাবণ-মেঘনাদ, রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। ব্রজেন্দ্রকুমারের 'পরাজিত মেঘনাদ' পালার পরিকল্পনা দেখে আমাদের একথা মনে হয় যে, তিনি মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর এই পালা আধুনিক চিন্তাধারা এবং নতুন মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।

ব্রজেন্দ্রকুমার কেবল 'পরজিত মেঘনাদ' পালাতেই নয়, তাঁর রচিত একাধিক পৌরাণিক নাটকেই আমাদের অতি পরিচিত চরিত্রকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে নবরূপ প্রদান করেছেন। ফলে নবব্যাখ্যায় চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে। তাঁর 'কৃষ্ণ-শকুনি' (১৯৭১) পালায় দেখা যায়, পিতৃহন্তা বা ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ নেবার জন্য শকুনি কৌরব বংশের ধ্বংস কামনা করেন নি — দুর্যোধনের অত্যাচারে সমগ্র দেশে নারীধর্ষণ, গুপ্তহত্যা বৃদ্ধি পায় এবং তা রোধ করতেই শকুনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত করেছিলেন এবং কূটকৌশলে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত

রাজশক্তিকে যুদ্ধে সামিল করে দুর্যোধনের বিনাশ সাধন করেছিলেন। 'পুরুষোত্তম' (১৯৫৪ খ্রীঃ) -র রাবণ সর্বগুণসম্পন্ন। তাঁর জাতি আর্য জাতির সমতুল মর্যাদা লাভ করতে পারে না বলেই তিনি আর্যজাতির উপর ক্রোধান্বিত হন। 'পরাজিত মেঘনাদ' (১৯৭৬)-র রাবণ সীতাহরণ নিজের লালসা চরিতার্থ করবার জন্য আদৌ করেন নি, দেশের এবং প্রজাগণের কল্যাণের জন্য তাঁকে সীতাহরণের ন্যায় হীন কর্ম করতে হয়েছিল।

এ পালার কাহিনীতে দেখা যায়, রাবণের দেশ লঙ্কায় তাল তাল সোনা কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের একান্তই অভাব। কৃষিক্ষেত্রে ফসল ফলে না একেবারেই। নিজের দেশবাসীর জন্য রাবণ প্রতিবেশী দেশগুলির কাছ থেকে সোনার বিনিময়ে খাদ্যসামগ্রী কিনতে চান। কিন্তু প্রতিবেশী দেশগুলি আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাবণের নিকট খাদ্যসামগ্রী বিক্রী বন্ধ করে দেয়। রাবণের অপরাধ তিনি জাতিতে অনার্য এবং কয়েকজন দেবতাকে তিনি বন্দী করে রেখেছেন। এজন্য আর্যশক্তিগুলি মহাজোট তৈরী করে অনার্যজাতির নেতা রাবণকে ধনেপ্রাণে শেষ করে দিতে চায়। সীতা ধরিত্রীর কন্যা, তিনি ভূমিলক্ষ্মী, তিনি কৃষিলক্ষ্মী। তাঁকে যেন তেন প্রকারেণ লঙ্কায় স্থাপন করতে পারলে স্বর্ণলঙ্কা সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা হয়ে উঠবে। তখন প্রজাদের আহার্যের কোনো অভাব থাকবে না। রাজধর্ম প্রজাপালনে রাবণের তখন কোনো ত্রুটি থাকবে না। সীতাদেবীকে লঙ্কায় স্থাপনের বাসনা তাঁর দীর্ঘকালের। একবার সীতাকে আনতে তিনি মিথিলায় গিয়েছিলেনও, কিন্তু আর্যরা কৌশলে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিল। ফলে রাবণের মনোবাসনা কিছুতেই বাস্তবায়িত হচ্ছিল না। অতপরঃ একদিন রাবণের সামনে একটা উপলক্ষ এসে পড়ল। লক্ষ্মণ রাবণের ভগিনী সূর্পনখার নাসিকা-কর্ণ ছেদন করে তাকে মর্মান্তিক আঘাত হানেন। —এই অছিলায় রাবণ সন্ন্যাসীবেশে সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে আসেন। প্রায় সমস্ত লঙ্কাবাসী রাবণের সীতাহরণের উদ্দেশ্য অনুধাবণ করতে না পেরে তাঁকে ধিক্কার দেয়। বিভীষণের সহাতায় রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে উদ্ধার করতে লঙ্কা আক্রমন করেন। আন্তর্জাতিকতাবাদী মেঘনাদও অন্যান্য লঙ্কাবাসীদের ন্যায় যুদ্ধ চান না। রাবণ তখন তাঁর সীতাহরণের উদ্দেশ্য দেশবাসীর সম্মুখে ব্যক্ত করেন। সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে অবস্থান করে আর্য-অনার্যের মিলনসেতু রচনা করা যার ঐকান্তিক বাসনা, সেই রাবণপুত্র মেঘনাদকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে যেতে হয়। কিন্তু কাউকে তিনি অস্ত্রাঘাত করেন নি, শুধুমাত্র যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিতে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে অচেতন করে রেখে এসেছিলেন। মেঘনাদের এরূপ মহত্ত্বের মূল্য ব্রজেন্দ্রকুমারের লক্ষ্মণও দেন নি, তিনিও মধুসূদনের লক্ষ্মণের ন্যায় 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' -র নীতিতে নিরস্ত্র অবস্থায় মেঘনাদকে হত্যা করেন। লক্ষ্মণের নিকট মেঘনাদের পরাজয় ঘটে বটে, কিন্তু যাত্রাপ্রেমী অগণিত দর্শকের হৃদয়ে তিনি চিরবিজয়ী হয়ে রইলেন।

ব্রজেন্দ্রকুমারের 'পরাজিত মেঘনাদ' -র রাবণ বাল্মীকির রাবণের ন্যায় নারীলোলুপ দুর্বত্ত রাক্ষস নন, প্রজাকল্যাণে ব্রতী একজন যথার্থ রাজা তিনি। পরস্ত্রী সীতাকে তিনি অপহরণ করেছেন, একথা সত্য, কিন্তু সীতাকে তিনি নারীরূপে দেখেননি, তাঁকে মূর্তিমতী কৃষিলক্ষ্মী রূপেই দেখেছেন। সীতাহরণের পশ্চাতে রাবণের মহৎ উদ্দেশ্য হল প্রজাকল্যাণসাধন।

রাবণ ।। সম্পত্তি আর নারী এক নয় মাতুল। (স্বগত) তবে সীতা ঠিক নারী নয়। সে মূর্তিমতী কৃষিলক্ষ্মী। আর কৃষিকেই আমার দেশের বেশী প্রয়োজন। (পূর্ব কথা, ১ম দৃশ্য)

রাবণের লঙ্কাপুরী সোনায় ভরা কিন্তু সেখানে ফলমূলশস্য নেই। প্রতিবেশী দেশগুলিতে সবুজের সমারোহ প্রত্যক্ষ করে স্বর্ণ-লঙ্কাধিপতি রাবণ আক্ষেপ করে বলেন —

রাবণ ।। সোনা, শুধু সোনা। সোনার রাজপুত্র, সোনার প্রাসাদ, সোনার পাহাড় চারদিকে। সোনা খেয়েই কি রাক্ষস জাতির বেঁচে থাকতে হবে? মাঠে মাঠে রাশি রাশি বীজ ফেললেও সবুজ শস্যের দেখা মেলে না, বাগানে ফুলের গাছগুলো সব পত্রপুষ্পহীন, আর ঐ দিগন্তপ্রসারী অশোকবন, কোথাও তাতে একটাও ফলন্ত গাছ নেই। সাগরের ওপারে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মদ্র দেশে দেখে এলাম সবুজের সমারোহ, আর এপারে শুধু রাশি রাশি নীরস কঠিন সোনা। সোনা আমারও চাই — এই রূপসর্বস্ব সোনা নয়, আসল সোনা, বসুমতীর অজস্র দান ফলমূলশস্য।

(পূর্ব কথা, ১ম দৃশ্য)

রাবণকে খাদ্যশস্যের জন্য এতখানি চিন্তা করতে হোত না। সোনার বিনিময়ে তিনি খাদ্য শস্য কিনতে পারতেন। কিন্তু আর্যরা একজোট হয়ে স্থির করেছে — লঙ্কেশ্বর দশাননের কাছে আর শস্য বিক্রি করবে না, যেহেতু তিনি দেবতাদের বন্দী করে রেখেছেন। কিন্তু আর্যরা রাবণকে বুঝতে ভুল করেছে। রাবণ সকল দেবতাকে বন্দী করেন নি। তিনি কেবলমাত্র অলস দেবতাদেরই বন্দী করে রেখেছেন। তাঁদের দিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান ঘুঁচিয়ে ফেলাই রাবণের উদ্দেশ্য।

রাবণ ।। আর্যগণ ভ্রান্ত। মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পৃথিবীটাকে ফলে ফুলে সাজাবে আর তার সব গৌরব নেবে দেবতারা, এ আমি সহ্য করিনি, করবও না কোনদিন। দেবতা, মহাদেব, রাশি রাশি অমৃত সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে নিজে পান করেছেন তীব্র হলাহল। আর যেসব কোটি কোটি দেবতা যারা কিছুই না করে সবই পেতে চায়, এই নিষ্ক্রিয় অধমগুলোকে দিয়ে আমি স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করাব। (পূর্বকথা, ১ম দৃশ্য)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেবতাদের বন্দী করে রেখে দেবার পেছনে রাবণের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা মহৎ। রাবণ আর্যদের করুণার দিকে তাকিয়ে থাকতে চান না। নিজের দেশ লঙ্কাতে তিনি ফলে ফুলে ফসলে ভরিয়ে তুলতে চান । সে কারণে তিনি বলেন ——

রাবণ ।। তাই ত কৃষিলক্ষ্মীকে আনতে মিথিলায় গিয়েছিলাম, হেরে গেলাম! দিগ্বিজয়ী দশানন হেরে গেল তুচ্ছ এক যুবক রামচন্দ্রের কাছে। (পূর্ব কথা, ১ম দৃশ্য)

আক্ষেপ করে মাতুল কালনেমিকে তিনি বলেন ——

রাবণ ।। .... জনকরাজার লাঙ্গলের ফালে উঠেছে ধরণীর দুহিতা ওই ভূমিলক্ষ্মী। সে যেখানে গেছে, সেখানেই শুকনো গাছে ফুল ফুটেছে। আমার দেশে সোনা আছে, শস্য নেই। তাকে যদি আমি লঙ্কায় নিয়ে আসতে পারতুম, তাহলে সবুজ শস্যে মাঠ ভরে যেত।

(পূর্বকথা, ১ম দৃশ্য)

সীতাকে লঙ্কায় প্রতিষ্ঠা করার ঐকান্তিক বাসনা চরিতার্থ করার একটা সুযোগ আসল সেদিন, যেদিন তিনি শুনলেন যে লক্ষ্মণ তাঁর ভগিনী শূর্পনখার নাক-কান ছেদন করেছে। এইরূপ বীভৎস

ও মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনে তিনি খুশি হলেন কিনা তা অজ্ঞাত, তবে তিনি নিজের মনে বলতে লাগলেন —

রাবণ ।। (স্বগত) পেয়েছি, উপলক্ষ্য পেয়েছি। হ'ক অন্যায়, পৃথিবী ধিক্কার দিক, তবু আমার নিরানন্দ দেশে জীবনের জোয়ার বয়ে যাক্। (পূর্বকথা, ১ম দৃশ্য)

রাবণ স্থির করলেন — দেশের এবং জাতির কল্যাণের জন্য তিনি নিজের মুখে কালি মাখবেন, সীতাহরণ করে তাঁকে নিজের দেশে প্রতিষ্ঠা করবেন। সেজন্যই মারীচের সহায়তায় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাবণ কৃষিলক্ষ্মী সীতাদেবীকে রথে তুলে নিলেন।

রাবণ ।। ভূমিলক্ষ্মী মোর। স্বর্গ মোরে হানিবে আঘাত, শতকণ্ঠে মর্ত্যবাসী ধিক্কারিবে মোরে। তবু আমি ফিরিব না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। এস।

(১ম পর্ব, ৩য় দৃশ্য)

প্রজাদের অন্নের সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় দুরপনেয় কলঙ্ক হাসিমুখে মুখে মাখলেন প্রজাবৎসল রাবণ। আর্যজাতির হাত থেকে কৃষিলক্ষ্মী সীতাকে তিনি ছিনিয়ে নিলেন। সমস্ত লঙ্কাপুরীতে দেখা গেল সবুজের সমারোহ। রাবণ খুশিতে ভরে উঠলেন।

রাবণ ।। (স্বগত) যে অশোকবনে শুষ্কতরু আর কণ্টক বৃক্ষ ছাড়া আর কিছু কখনও দেখিনি, আজ সেখানে কি বিচিত্র সবুজের সমারোহ। তবু জগৎ জুড়ে রব উঠেছে, দশানন মহাপাপ করেছে। কাঁদো নারী, অঝোর ঝরে কাঁদো, লঙ্কার উষর মাটি সরস হোক।

(১ম পর্ব, ৮ম দৃশ্য)

রাম - লক্ষ্মণ বিশ হাজার বানর সৈন্যসহ লঙ্কা আক্রমণ করতে আসছে — এ সংবাদে রাবণ এতটুকু বিচলিত হলেন না, বরং তাঁদের আগমন বার্তায় তিনি খুশি হলেন। তাঁরা লঙ্কাভূমিতে পদার্পণ করলে রাবণ তাঁদের ধরে রেখে তাঁদের দ্বারা বহুবিধ সৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদন করবেন।

রাবণ ।। বা বা বা। একজনের চোখের জলে নিরেট সোনা গলে সবুজ সোনার বান ডাকবে, আর একজনের হাতের ছোঁয়ায় সাগরে শিলা ভাসবে। মেঘনাদের সঙ্গে যদি একে মেলাতে পারি, তাহলে — আসুক, আসতে দে। আমি তাদের বেঁধে রাখব। সীতা সমগ্র লঙ্কা প্রদক্ষিণ করে চোখের জলে নদী বইয়ে দেবে। রাম পাথুরে মাটির বুকে জাগাবে প্রাণের স্পন্দন। আর নল মেঘনাদের সঙ্গে মিলে — হাঃ হাঃ ..... (১ম পর্ব, ৮ম দৃশ্য)।

বিভীষণ রামচন্দ্রের হাতে সীতাকে ফিরিয়ে দিতে রাবণকে অনুরোধ করলে রাবণ যেকথা বিভীষণকে বলেছেন তা থেকে তাঁর স্বাজাত্যপ্রীতি, প্রজানুরঞ্জনী এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় —

রাবণ ।। যখন আমি রাজ্যভার হাতে নিয়েছিলাম, তখন শপথ করেছিলাম প্রজাদের জান - মান রক্ষার দায়িত্ব আমার। এতদিন পরে আজ আমার প্রজারা পেটভরে দুটি খেতে পাচ্ছে। যে রাজা প্রজাদের পেট ভরে খেতে দিতে পারে না, সে রাজার রাজ্য ত্যাগ করা উচিত। হবে না, তোমাদের কোন কথা আমি শুনব না।

(১ম পর্ব , ৮ম দৃশ্য)

রাবণের পুত্র মেঘনাদ আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। কার্যতঃ তিনি আর্য - অনার্যের যুদ্ধকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। আর্য - অনার্যের বিরোধের অবসান ঘটানোই তার সাধনা। রাবণের সীতাহরণের ফলে তার সেই সাধনা ব্যর্থ হতে চলেছে। পিতাই তার সাধনার অন্তরায় বলে রাবণকে অভিযুক্ত করলে রাবণ পুত্রকে বলেন —

রাবণ ।। মেঘনাদ, তোমার পিতা তোমার মত আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী নয়। তাই বলে আর্য জাতিকে ধ্বংস করতেও আমি চাই নি। যখন আমি সিংহাসনে বসেছিলাম, তখন শপথ করেছিলাম প্রজাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করাই হবে আমার প্রধান কর্তব্য। বস্ত্রের অভাব লঙ্কায় কখনও হয় নি। কিন্তু লঙ্কার অনুর্বর মাটিতে কোনদিন শস্য জন্মাত না। যে রাজা প্রজাদের মুখে অন্ন দিতে পারে না, আমার মতে সে রাজার রাজ্য ত্যাগ করা উচিত। (২য় পর্ব ৩য় দৃশ্য)

পালাকার এই নাটকে প্রথমে সীতাহরণ ও তার প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, মধ্যবর্তীকালে সীতাহরণের কারণ জানিয়েছেন এবং পরিশেষে সীতাহরণের প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে নাট্যঘটনার সমাপ্তি টেনেছেন। অর্থাৎ Flash back এ কার্য দেখিয়ে পরে কারণ দেখিয়েছেন। রাবণের দুঃখ সে কথা জানার পরেও সকলে সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বলছে।

রাবণ ।। সবারই মুখে এক কথা, সীতাকে ফিরিয়ে দাও। কেউ বলছে না যে সীতার সঙ্গে রামকেও বেঁধে রাখ, নলকে শৃঙ্খলিত কর। (২য় পর্ব , ৫ম দৃশ্য)

সীতা যখন রাবণকে ' পুরুষের প্রতি আক্রোশের বশে নারীহরণ করেছ' এবং 'সন্ন্যাসীর পবিত্র বসনকে কলঙ্কিত করেছ', বলে তিরস্কার করেন, তখন রাবণ প্রত্যুত্তরে যে কথা বলেছেন, তাতে সন্ন্যাসীর পবিত্রতা এবং মানুষের মনুষ্যত্ব দুইই প্রকাশ পেয়েছে —

রাবণ ।। তুমি যে ধরার দুহিতা, তুমি যে ভূমিলক্ষ্মী। নিষ্কাম না হয়ে তোমার হাত ত ধরা যায় না। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই একমাত্র তোমার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে, আর কেউ পারে না। আমি আমার সোনার দেশে সবুজ শস্যের প্লাবন আনতে চেয়েছিলাম। সন্ন্যাসীই তোমাকে এনে অশোক বনে প্রতিষ্ঠা করেছে, রাজা তোমাকে স্পর্শ করে নি, প্রাসাদেও নিয়ে আসে নি। (২য় পর্ব, ৫ম দৃশ্য)

এ রাবণ ত নারীলোলুপ দুর্বৃত্ত নয়, এ রাবণ নিষ্কাম সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্তি ।

রামায়ণী কথা অবলম্বনে রচিত ব্রজেন্দ্রকুমারের বিভিন্ন যাত্রাপালায় রাবণকে চরিত্র রূপে দেখা গেছে। কালানুক্রমিকভাবে পালাগুলি বিশ্লেষণ করলে রাবণ চরিত্রের বিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। লক্ষ্য করা যাবে, রাবণ চরিত্রের উত্তরণ। ১৯২৫সালে ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত সর্বপ্রথম যাত্রাপালা 'স্বর্ণলঙ্কা'র রাবণ একদিকে মহান, আর একদিকে নিষ্ঠুর । সেখানে রাবণ লঙ্কাপ্রেমী হয়েও কিয়দংশে নারীলোলুপ। ১৯৫৪ সালে বিরচিত 'পুরুষোত্তম' এর রাবণ যদিও কিছুটা নারীলোলুপ তথাপি তিনি বহুবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী — তিনি পুরুষোত্তম। বিশ্বের দরবারে তাঁর জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন, এই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। ১৯৭৬ সালে প্রণীত 'পরাজিত মেঘনাদ'এর রাবণ 'জাতীয়তাবাদী প্রজাদরদী কর্মযোগী সন্ন্যাসী'।

পালাকার এই পালার মেঘনাদ চরিত্রেরও নবায়ন ঘটিয়েছেন। তিনি বীরযোদ্ধা কিন্তু যুদ্ধপ্রেমিক নন, তিনি যুদ্ধবিমুখ। সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ ঘটিয়ে আর্য-অনার্যের মধ্যে মিলনসেতু গড়ে তোলাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর তিনি চূর্ণ করতে চান। তিনি উপলব্ধি করেছেন, মন্দির বিগ্রহ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাই মন্দিরের দেওয়াল তিনি ভেঙে দিতে চান।

মেঘনাদ ।। মন্দির বিগ্রহ আর পূজা-উপচার দিনে দিনে দৃঢ় করে বিভেদের সীমা। এখনই করিব চূর্ণ এই পূজাগৃহ। মানুষের অধিকারে ভবিষ্যতে কোনদিন বঞ্চিত হবে না কোন অনার্য্য সন্তান। (সূচনা, পৃষ্ঠা ৯)

সাম্যবাদী মনোভাবাপন্ন মেঘনাদ রক্তপাত চান না। তাঁর অস্ত্রের প্রয়োজনও নেই। কিন্তু —

মেঘনাদ ।। মানবসমাজের কিছু কিছু শত্রু অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত করে পৃথিবীর সব সম্পদ নিজেরাই ভোগ করতে চায়। এই দস্যুদের দমন করার জন্যেই অস্ত্র প্রয়োজন।

(১ম পর্ব, ৪র্থ দৃশ্য)

সাম্যবাদী মেঘনাদ চান না পৃথিবীটা একটা জাতির হাতে চলে যাক্। তিনি চান পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জাতি ধর্ম সব ভুলে এক হোক এবং পৃথিবীর সুখ-সম্পদ-শস্য মিলেমিশে ভাগ করে ভোগ করুক। কিন্তু পিতার সীতাহরণে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তার বাস্তবায়ন হয়ত সম্ভব হবে না। সীতাহরণ কে তাই কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারেন না। আর্য-অনার্য এর মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা তাঁর চিন্তা-চেতনার স্তরেই রয়ে গেল। কেননা পিতৃভক্ত মেঘনাদের পক্ষে পিতার বিরুদ্ধাচরণ অসম্ভব। একদিকে পিতৃভক্তি, অপরদিকে আদর্শ — এই দুয়ের মানসদ্বন্দ্বে তিনি জর্জরিত। মাতৃভূমি যেহেতু বিদেশী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত, সেহেতু তাঁকে সাম্যবাদী চেতনাকে অবদমন করে দেশপ্রেমকে অগ্রাধিকার দিতে হয় এবং যুদ্ধে যেতে হয় —

মেঘনাদ।। তাই ত সৃষ্টি ছেড়ে ধ্বংসের খেলায় যোগ দিতে চলেছি। যা করতে চাই অবস্থা তা করতে দেয় না। উদ্দেশ্য কি সফল হবে না? মানুষ কি মানুষ হবে না। সাম্প্রদায়িকতা ভুলে সবাই কি এক হয়ে মানব সমাজের কল্যাণে ব্রতী হবে না। (২য় পর্ব , ১ম দৃশ্য)

মেঘনাদ কোন প্রকারেই এই ধ্বংসের খেলায় সায় দিতে পারেন না। যাঁকে কেন্দ্র করে রাম রাবণের যুদ্ধ সেই মা জানকীকে রামচন্দ্রের কাছে প্রত্যর্পণ করার অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেন।

মেঘনাদ ।। চল্ মা জানকী। আমি তোরে
রেখে আসি দয়িতের পাশে। (২য় পর্ব, ১ম দৃশ্য)

কিন্তু কোনক্রমেই যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হল না। মা ভবানী মেঘনাদকে যুদ্ধে নাগপাশ অস্ত্র প্রয়োগ করতে নিষেধ করলে তিনি ভবানীকে রাম-লক্ষ্মণের জন্য ভীত না হতে বলেছেন —

মেঘনাদ ।। ভয় কি মা? আমি অনার্য্য, কিন্তু আর্য্যজাতির শত্রু নই। আমার কাছে মানুষের পরিচয় শুধু মানুষ। আমি রাম-লক্ষ্মণকে মারতে চাই না মা! (২য় পর্ব, ২য় দৃশ্য)

রক্তপাতে অনীহা, জীবনহানির ঘোর বিরোধী মেঘনাদ মা ভবানীকে নাগপাশ অস্ত্র ব্যর্থ করার কৌশলও তাই তিনি নিজেই বলে দেন —

মেঘনাদ ।। তোমার ছেলের ত ময়ূর পোষার সখ । আমি সাপ ছাড়ি , তুমি তাদের ডাক দাও। সাপ পালাতে পথ পাবে না। (২য় পর্ব, ২য় দৃশ্য)

মেঘনাদের স্ত্রী প্রমীলা এবং মাতা মন্দোদরী রাবণকে যেভাবে সীতাহরণকারী মহাপাপী বলে অভিযুক্ত করেছেন, মেঘনাদ সেই ভাবে পিতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করালেও তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদ ব্যর্থ হবার জন্য রাবণই যে মূলতঃ দায়ী সে কথা নরম সুরে ক্ষোভসহ জানিয়েছেন —

মেঘনাদ ।। পিতা । আর্য্য -অনার্য্যের বিরোধের অবসান ঘটানোর জন্য আমার চেষ্টার বিরাম ছিল না। আমি সাম্প্রদায়িকতার বিষ পৃথিবী থেকে নির্মূল করতে চেয়েছিলাম। আপনার পরস্ত্রী হরণ তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ....রাম আর দশাননের যুদ্ধে আমিই পরাজিত, নিষ্পেষিত, সর্বহারা। (২য় পর্ব , ৩য় দৃশ্য)

আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে মেঘনাদ সীতাকে বন্দী করে রাখার প্রয়াসের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে পিতা দশাননকে বলেন—

মেঘনাদ ।। শুধুমাত্র অনার্য জাতিকে নিয়ে পৃথিবী নয় পিতা। আমার মনে হয়, সীতাকে কারোরই বন্দী করে রাখার অধিকার নেই। সে রামই হ'ক, আর অনার্য শিরোমণি দশাননই হন। (২য় পর্ব, ২য় দৃশ্য)

মেঘনাদের এ উক্তি সাম্যবাদের গভীর তল থেকে উত্থিত । সাম্যবাদের মূল কথাই হল সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ সাধন। মেঘনাদ কৃষিলক্ষ্মী ভূমিলক্ষ্মী সীতার অধিকার সর্বসাধারণের বলে মনে করেন।

মেঘনাদের কাছে আর্য-অনার্য সকলেই সমান। দেব-নর-রাক্ষসের দলকে তিনি মনে করেন বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই নর রক্তে তাঁর এত বিতৃষ্ণা । তথাপি, পিতার মতাদর্শের কাছে হার মেনে তাঁকে যুদ্ধে যেতে হয়। কিন্তু তিনি কাউকে হত্যা করেন নি, কারো রক্তপাত তিনি ঘটান নি। আপন খুল্লতাত শত্রু শিবিরে আশ্রিত বিভীষণ তাঁর মানবপ্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি আঘাত পান।

মেঘনাদ ।। তাদের হত্যা কি আমি করতে পারতাম না ? নাগপাশে বেঁধে রেখে এলাম যাদের তাদের বুকে দুটো তীর নিক্ষেপ করে আসতে কি আমি অক্ষম ছিলাম? অসংখ্য বানরকে আমি অচেতন করে রেখে এসেছি, আমার কি অস্ত্রের অভাব হয়েছিল? তাদের কি যমালয়ে পাঠাতে পারতাম না? (পার্শ্বপট, পৃ১৫৭)

লুক্কায়িত অবস্থায় কুয়াশার দুর্গ থেকে নাগপাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল বলে লক্ষ্মণ তাকে চোর অভিধা আরোপ করলে মেঘনাদ তাকে বলেন —

মেঘনাদ ।। সেই সঙ্গে জলদায়ুধ ও নিক্ষেপ করেছিলাম । অসংখ্য সাপ যেমন তোমাদের ঘিরে ধরেছিল তেমনি ঘন মেঘ তোমাদের আচ্ছন্ন করেছিল, সেই মেঘের আকর্ষণেই এসেছিল অসংখ্য ময়ূর। কেউ বিশ্বাস করবে না, কারও মৃত্যু আমি চাই নি, আমি চেয়েছিলাম

আর্য্য -অনার্য্যের মিলন সেতু গড়ে তুলতে। (পার্শ্ব পট, পৃঃ ১৫৮)

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার সময়ে মেঘনাদ জানিয়ে গেলেন তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা —"দূর হ'ক ভেদাভেদ, ধ্বংস হ'ক সাম্প্রদায়িকতার বিষ।" বলাবাহুল্য, এই বাসনা পালাকারেরও বটে। রাম লক্ষ্মণের কাছে মেঘনাদ পরাজিত হন নি, পরাজিত হয়েছেন রাবণের জাতীয়তাবাদের কাছে। দেশাত্মবোধের কাছে আন্তর্জাতিকতাবাদের পরাজয়েই পরাজিত মেঘনাদ।

এ পালার রামচন্দ্র কৃত্তিবাসের রামের মতোই স্ত্রীগতপ্রাণ। পঞ্চবটী বনে ফিরে এসে সীতাকে না পেয়ে তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করেছেন এবং অনুজ লক্ষ্মণের কাছে বিলাপ করেছেন। এমন কি, সীতার চিন্তায় ক্লিষ্ট রামচন্দ্র নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছেন—" আর ভাবতে পারি না লক্ষ্মণ। মা ভবানী, কূল দাও মা"। (১ম পর্ব, ৩য় দৃশ্য)

প্রমীলা সীতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ এবং মহাকায় পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে রামচন্দ্রকে পুষ্পক রথ দিতে এসেছেন, যাতে ঐ রথে করে সীতাকে তিনি উদ্ধার করতে পারেন। শুধু তাই নয়, তারা স্বেচ্ছায় রামচন্দ্রের নিকট বন্দীত্ব বরণ করতে চেয়েছেন। তবে রামচন্দ্র তাদের কাছ থেকে পুষ্পক রথও নেননি, তাদের বন্দীও করেন নি। তিনি যে কথা বলেছেন তাতে তাঁর উদার মানসিকতা, মহত্ত্ব এবং বীর্য প্রকাশ পেয়েছে।

রাম।। না মহাকায়, আমরা নির্বোধ আর্য সন্তান, সম্মুখ যুদ্ধে শত্রু সংহার করতে জানি, কিন্তু অতিথিকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তার বক্ষোরক্ত পান করতে শিখি নি।

(১ম পর্ব, ৭ম দৃশ্য)

মা ভবানী তাঁর ভক্ত সন্তানের মঙ্গলার্থে রাবণের মামা কালনেমীর সহায়তায় রাবণের প্রাসাদ থেকে তার শক্তিশেল অপহরণ করেন কিন্তু তিনি রামকে সেটি দিতে চাইলে রাম তা প্রত্যাখ্যান করেন। —এখানেও রামচন্দ্রের বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বিভীষণের সাহচর্যে লুক্কায়িত মেঘনাদকে হত্যা করতে চাইলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছেন— "থাক জানকী অশোকবনে, তবু এতবড় একটা গুপ্ত হত্যা আমি করতে দেব না।" (২য় পর্ব, ৪র্থ দৃশ্য) রামের মহত্ত্ব এবং বীরত্ব এখানেও উদ্ভাসিত হয়েছে।

রাবণ - মেঘনাদের তুলনায় লক্ষ্মণ অনেকটাই নিষ্প্রভ। তিনি ভ্রাতৃভক্ত। সীতাকে তিনি মাতৃরূপেই দেখেন, কিন্তু শত্রুর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতে তাঁর বাধে না।

সীতা কূলবধূ হলেও ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল। স্বামীর বীরত্বে তাঁর অগাধ আস্থা। মারুতি তাঁকে অশোকবন থেকে পঞ্চবটী বনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি মারুতিকে বলেন--

সীতা ।। না বাবা, গোপনে এসেছি, গোপনে চলে যাব, এত ক্ষুদ্র আমি নই। আমার স্বামী আমায় রাজপথ দিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন,— তোমার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে তাঁর গৌরবহানি আমি করব না। (১ ম পর্ব, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

প্রমীলা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহবধূর মতো স্বামীর মঙ্গল কামনা করে থাকেন। তাঁর

চোখে রাম- লক্ষ্মণ দোষী নয়, — দোষী তাঁর শ্বশুর রাবণ। মহাকায় ন্যায়বান। পিতার রক্তচক্ষুকে সে ভয় করে না। পিতার কঠোর সমালোচনা করতে তার বাধে না। পিতার অপরাধের প্রতিকার করতে পুষ্পক রথ প্রদান করতে ছুটে যায় রামচন্দ্রের কাছে এবং স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। মারীচ দুষ্ট নয়। সোনার হরিণের বেশে রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে ছলনা করতে সে অসম্মত হয়। মাতা তাড়কা রাক্ষসীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে সে এই হীন কাজ করেনি। দুর্বৃত্ত রাবণের হাতে মৃত্যুর চেয়ে রামচন্দ্রের হাতে প্রাণ দেওয়া অধিক শ্রেয় মনে করে সে এই রূপ ঘৃণ্য কর্মে অগ্রসর হয়। বিভীষণ ন্যায়বান হলেও বিদেশী শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'ঘরভেদী' অভিধা প্রাপ্ত হয়েছেন। মন্দোদরী সন্তান বৎসলা মা। সন্তান হারানোর বেদনায় তিনি কাতর। কালনেমী অতি কুটিল। প্রতিশোধ নিতে তিনি স্বর্ণলঙ্কায় আগুন জ্বালিয়েছেন।

এ নাটকে মোট আটটি গান আছে। এর মধ্যে দুটি গান ব্রজেন্দ্র কুমারের অভিন্নহৃদয় বন্ধু যাত্রাপালাকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এর রচনা। তরুণ কুমার দে এই পালার ভূমিকায় সে কথা জানিয়েছেন—

> "এই পালার দুটি গান পালাকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। উনিই এ পালার পদ্যাংশের রচয়িতা।" ৪৫

বিয়োগান্তক এই যাত্রাপালা বাৎসল্য, বীর, করুণ ও বীভৎস রসের সমন্বয়ে অসাধারণ রূপ লাভ করেছে।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার ' পরাজিত মেঘনাদ' পালায় মূল রামায়ণের কাহিনীকে বিশেষ অভিনব ভাবনায় রূপদান করেছেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকগণ এই তথ্য জানেন যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত উনিশ শতকের নবজাগরণের পটভূমিকায় যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের সূত্রে' মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করেছিলেন নূতন তাৎপর্যে। মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। তার ১১৫ বছর পরে নূতন যুগ পারিপার্শ্বিকের চেতনায় ব্রজেন্দ্রকুমার ঐ কাহিনীকে নবরূপে রূপদান করেছেন। গবেষণা অনুসন্ধানে বোঝা যায় যে, পালাসম্রাটের এই কাহিনী রচনার পেছনে বিশেষভাবে সক্রিয় থেকেছে রামায়ণ সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্লেষণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য। তবে আমরা একথা বলতে পারি যে, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে পরাজিত মেঘনাদ পালাটিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করলেও আধুনিক আন্তর্জাতিকতাবোধের উদ্বোধনে মেঘনাদ চরিত্রের মাধ্যমে কাহিনীটিকে নূতন তাৎপর্য প্রদান করেছেন।

স্বর্ণলঙ্কা (১৯২৫) — পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত যাত্রাপালা। পৌরাণিক নাটকটি কলকাতার ডায়মণ্ড লাইব্রেরী প্রকাশ করেছিল। বাণী নাট্যসমাজ নামে অপেশাদারী একটি যাত্রাদল ১৯২৬ সালে এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটি অভিনয় করেছিল। বাণী নাট্যসমাজ এই পালাখানি প্রযোজনা করে এত খ্যাতি লাভ করেছিল যে, এরপরেই তারা পেশাদার যাত্রাদলে পরিণত হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রকুমারের এই পালাখানিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ' মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকের পটভূমি রাম-রাবণের যুদ্ধকালীন লঙ্কাপুরী। লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাহরণ করলে রাম-লক্ষণ তাঁদের বানরসেনা সহযোগে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা আক্রমণ করেন। রাম- রাবণের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লঙ্কার হাজার হাজার বীরসেনানীসহ একে একে তরণীসেন, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ এবং পরিশেষে রাক্ষসপতি রাবণ নিহত হন। তারপর রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু প্রজানুরাগী রামচন্দ্র অপাপবিদ্ধ সীতাদেবীকে রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠানের পূর্বে প্রজানুরঞ্জনের জন্য তাঁকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলেন। সীতাদেবীকে দুর্বত্ত রাবণের লঙ্কাপুরীতে কিছুকাল অতিবাহিত করতে হয়েছিল বলে রামচন্দ্র তাঁকে এই রূপ অমানবিক আদেশ দিয়েছিলেন। যাইহোক, অগ্নিপরীক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে সীতা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা দানের সাথেই এই পালার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত সর্বশেষ যাত্রাপালা 'পরাজিত মেঘনাদ'(১৯৭৬)এ যে সন্ন্যাসী বেশী রাবণকে দেখা যায়, তাঁর সর্ব প্রথম যাত্রাপালা 'স্বর্ণলঙ্কা'য় সেই রাবণের প্রাথমিক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পালাতেও রাবণের মধ্যে স্নেহসিক্ত হৃদয়বৃত্তির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। ব্রজেন্দ্রকুমার এই পালায় প্রমীলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রমীলা অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন যুদ্ধ মানেই হত্যা এবং হাহাকার। যুদ্ধের নাম শুনলেই তাই তিনি ভয়ে আঁৎকে ওঠেন। তথাপি যুদ্ধ এড়ানো যায় নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের যাত্রার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এই পালায় সংগীতের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পালায় গানের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। ভক্তি, বীর ও করুণ রসের সমন্বয়ে রচিত ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাজীবনের প্রথম যাত্রাপালাখানি দর্শকসমাদর লাভ করেছিল।

বজ্রনাভ (১৯৩১) —এই পালাখানি ব্রজেন্দ্রকুমারের 'স্বর্ণলঙ্কা' (১৯২৫) যাত্রাপালার পথ অনুসরণেই সৃষ্টি। স্বর্ণলতা লাইব্রেরী পালাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিল। 'বজ্রনাভ' পালাখানি পেশাদার যাত্রাদলে অভিনীত ব্রজেন্দ্রকুমারের সর্বপ্রথম পালানাটক। ১৯৩২ সালে বিখ্যাত গণেশ অপেরা পালাটি প্রযোজনা করে। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট পৌরাণিক এই যাত্রাপালাভিনয় করে গণেশ অপেরা অভাবনীয় খ্যাতি লাভ করে।

এই পালার কাহিনীতে দেখা যায়, ক্ষুদ্র অহিচ্ছত্রের উপর প্রবল দানবশক্তি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে রাজা অরিন্দম পরাজিত হন। নিজের বীর সৈন্যসামন্তের স্তূপীকৃত শবদেহের দিকে তাকিয়ে রাজা অশ্রু সম্বরণ করতে পারেন না। দানবশক্তিকে পরাভূত করতে হাজার হাজার অনুগত প্রজাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন বলে তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হন। তাঁর শস্যশ্যামলা জন্মভূমি সাম্রাজ্যবাদী দানবের নিষ্ঠুরতা এবং পৈশাচিকতায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হতে দেখে তিনি বেদনাহত হন। শুধু তাই নয়, দানবসেনারা নগরীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আত্মরক্ষার্থে পলায়নী নারীদের দিকেও তারা ধাবিত হয় এবং হস্ত প্রসারিত করে ও সম্মানহানি করে। পরাজিত রাজা অরিন্দমকে রাজপথে দাঁড়িয়ে আধপোড়া মানুষের গলিত মাংস, তাদের ঝলসানো মুখ দেখতে হয়। রাজার কাছে এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না। শেষাবধি দেখা যায়,দানব সেনা সুনাভ বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

দানবসেনাদের অমানবিক অত্যাচার যাদবসেনারা নীরবে সহ্য করে নি। এর প্রতিবাদে তারা দানবরাজ্য বজ্রপুর আক্রমন করে। তবে পালার দ্বিতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়, যুদ্ধে যোগদানে অনিচ্ছুক নাগরিকবৃন্দ দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে। যাদবসেনানী প্রদ্যুম্নও যুদ্ধ করতে চাইছেন না। কেননা, নতুন করে ধ্বংস স্তুপ তৈরী করতে তাঁদের অনীহা। তাঁর ভাই ও সঙ্গী শাম্ব যুদ্ধের নামে আর্তনাদ করে ওঠেন। অহিচ্ছত্রের বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের ছবি তাঁদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অবশেষে তাঁরা যুদ্ধ বন্ধ করেন।

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে ব্রজেন্দ্রকুমার এই পালায় সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা এবং যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য প্রচার করেছেন।

প্রবীরার্জুন (১৯৩২) — এই পৌরাণিক পালাটি ডায়মণ্ড লাইব্রেরী প্রকাশ করে। স্বনামধন্য গণেশ অপেরা পার্টি ১৯৩৩ সালে এই পালাভিনয় করে। এই পালায় পাণ্ডবদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। পঞ্চপাণ্ডব - প্রেরিত অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া মাহিষ্মতীপুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে রাজকুমার প্রবীর পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বের গতিরোধ করেন। প্রবীর যজ্ঞের ঘোড়ার গতিরোধ করলে রাজা নীলধ্বজ পুত্রের জীবন হানির আশঙ্কায় পুত্রকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রবীর রাজার সমালোচনায় মুখর হন—"রাজসিংহাসনে আজ পিতার স্থান হয়েছে, রাজার স্থান হয়নি" (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)। যাই হোক, বীরের ধর্ম রক্ষার্থে বীরবল, প্রবীর প্রভৃতির তৎপরতায় শেষপর্যন্ত পিতা হয়েও নীলধ্বজের পক্ষে যুদ্ধ পরিহার করা সম্ভব হয় নি।

বীরবল এ পালার অসাধারণ চরিত্র। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে পাণ্ডবদের চিহ্নিত করতে তাঁর ভুল হয় নি। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেন—

নিষ্ঠুর পাণ্ডব।
ভাবিয়াছ মনে, তোমাদের অনন্ত পিপাসা
রক্ত দিয়ে নিতি মেটাবে সংসার,
শত শত ক্ষুধিতের কাড়িয়া মুখের গ্রাস
তোমাদের রাজভোগ জোগাবে জগৎ?
তিষ্ঠ তিষ্ঠ, নিষ্পাণ্ডবা হবে ধরাতল। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মহাভারতের পাণ্ডবকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞের এই জাতীয় বিশ্লেষণে পালাকারের গণতান্ত্রিক চেতনা এবং সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পালাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পালাখানি 'মাতৃপূজা'নামে বেতারে সম্প্রচারিত হয়েছিল।

বঙ্গবীর (১৯৩৬) — যাত্রাপালাটি কলকাতার ডায়মণ্ড লাইব্রেরী প্রকাশ করেছিল। গণেশ অপেরা পার্টি ৩১ শে আশ্বিন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রথম এই পালাভিনয় করে। সৌখিন সম্প্রদায়েও এই পালা একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল এবং তারা জনসমাদর লাভ করেছিল। এই পালাখানির দ্বাদশাধিক মুদ্রণ পালাটির জনপ্রিয়তার অনুকূলেই সাক্ষ্যদান করে।

এই পালার জনপ্রিয়তা অর্জন করার লক্ষ্যে বাঙালী চরিত্রত্রয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিজয়, ভারতী এবং অজয়কে দেখে বাঙালী জাতি নিজেদের চরিত্র গঠনের উপাদান খুঁজে পায়। চরিত্রত্রয়ের জীবন-দর্শন থেকে শোতৃসমাজ সমাজ জীবনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা লাভ করে।

পালাকার এ পালার বিবেক সুধাকণ্ঠের কণ্ঠে সংগীত এবং সংলাপ— দুই-ই প্রদান করে তাকে নাটকের অন্তর্গত চরিত্রে রূপদান করেছেন। এ পালার গানগুলি যাত্রানুরাগী দর্শকদের মনের গভীরে স্থান লাভ করেছিল। আজও এ পালার গানগুলি গ্রামবাংলার চাষীমাঝিদের মুখে মুখে ফিরতে দেখা যায়। জনৈক মাঝির কণ্ঠে এ পালার বিখ্যাত সংগীত —
"এ আঁধার ঘরে জ্বলিবে আলোক, রবে না অন্ধকার /ফুটিবে ফুল, বাজিবে গান, কোকিল চন্দনার" শুনে ব্রজেন্দ্রকুমারের অগ্রজ মহেন্দ্র চন্দ্র দে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। গানটি কোথায় শিখেছো?—মাঝিকে এই প্রশ্ন করা হলে উত্তরে মাঝি বলেছিল—

> "আমাগো দ্যাশে বঙ্গবীর পালাগান হইছিল। হেই সময় হিখ্ছি। বড় ভালো পালা। চমৎকার ল্যাখছে। করছেও চমৎকার।" ৪৬

পালাখানি সম্বন্ধে মাঝির এইরূপ অভিমত শুনে আমরা পালাটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারি। এই পালার মধ্য দিয়ে পালাকার প্রকারান্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাঙালী জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজর্ষি (১৯৩৭) — এই পৌরাণিক যাত্রাপালাটি মুদ্রিত করে ডায়মণ্ড লাইব্রেরী। ভোলানাথ অপেরা ১৯৩৭ সালেই তিন অঙ্কের এই পালাখানি প্রযোজনা করে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে যাত্রাভিনয় চলত সারারাত্রি ধরে, সেইসময়ে তিনঘন্টার যাত্রাপালা রাজর্ষির সংক্ষিপ্ত সময়ের যাত্রাপালা হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই পালার কাহিনীর সুঠাম বাঁধুনি, অপরূপ চরিত্রচিত্রণ এবং বক্তব্যের অভিনব উপস্থাপনা পালাটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছিল। তবে স্বল্প দৈর্ঘের পালা বলে কিছু কিছু দর্শক -মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে। সেকারণে পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্র কুমার রাজর্ষি পালাখানির কলেবর কিছুটা বর্ধিত করেন। পরিবর্ধিত রাজর্ষি 'দানবীর' নামে প্রকাশিত হয়। দানবীরের ভূমিকায় পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার বলেছেন—

> "ক্ষত্রিয় যদি তপস্যার বলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে, ব্রাহ্মণই বা অপকর্মের ফলে চণ্ডাল হইবে না কেন?" ৪৭

ব্রজেন্দ্রকুমারের মতে জন্মস্থলের উপরে মানুষের পরিচয় নির্ভর করে না, মানুষের কর্মধারার উপরই তার পরিচয় চিহ্নিত হওয়া উচিত। এই পালায় আমরা দেখতে পাই, ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া বিশ্বামিত্র নিজের সীমাহীন ক্রোধ এবং বারম্বার ভুলকর্মের জন্য তিনি ব্রাহ্মণত্ব হারিয়েছেন। আবার ক্রোধ সম্বরণ করে আত্মকৃত ভুল সংশোধনের প্রচেষ্টাতেই তাঁর উত্তরণ ঘটেছে।

এ পালার অনন্য সাধারণ চরিত্র সমরসিংহ। আমাদের মনে হয়, তিনি পালাকারের মানসচরিত্র। পালাকার এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের উচ্চ বর্ণের মানুষদের বংশানুক্রমিক

আধিপত্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। ব্রজেন্দ্রকুমার সমরসিংহ চরিত্রের দ্বারাই বিশ্বামিত্রের রূঢ় এবং অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং প্রকাশ করেছেন মানবতাবাদী এক শাশ্বত বাণী। সব মিলিয়ে এই পালাখানি সার্থক রূপ লাভ করেছে।

রাজলক্ষ্মী (১৯৩৭) —ব্রজেন্দ্র কুমারের এই পৌরাণিক পালাটিও ডায়মণ্ড লাইব্রেরী প্রকাশ করেছিল। তৎকালীন যাত্রাদলগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রাদল গণেশ অপেরা পার্টিতে এই পালাখানি সুদীর্ঘ কাল ধরে অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। এই পালার অভাবনীয় জনপ্রিয়তার সুবাদে এক দশকেই পালাটির পাঁচটি সংস্করণ অতি দ্রুততার সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এ পালার ভূমিকায় ব্রজেন্দ্র কুমার দে এ পালারচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন—

> "নারী জাতির মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগাইয়া তুলিতে রাজলক্ষ্মী একটু সাহায্য করুক।" ৪৮

আমাদের মনে হয়, পালাকার এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতেই লক্ষ্মণের পত্নী উর্মিলাকে এ পালায় বিশেষ তেজস্বিনীরূপে প্রতিভাত করেছেন। রামায়ণের মূল কাহিনী প্রায় অবিকৃত রূপে গ্রহণ করলেও ব্রজেন্দ্রকুমার এ পালায় উর্মিলা চরিত্রের ব্যক্তিত্বে একটি বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছেন। সীতাকে কলঙ্কিনী বলে ঘোষণা করলে,সকলে নীরব থাকলেও উর্মিলার নারী ব্যক্তিত্বে তা বিশেষভাবে আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই অপমানজনক কথার প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন এবং অযোধ্যার প্রজাবৃন্দের শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হন।

উর্মিলা ।। যোগ্য শাস্তি দিব অযোধ্যার
এই অগ্নিবাণে শ্মশান করিব পুরী।
................যেই হোক্
অযোধ্যার অধিবাসী কাহারেও
করিব না ক্ষমা। (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)

পুরুষের দেওয়া নির্বাসন দণ্ড মেনে নিতে সীতাদেবীকে নিষেধ করেছেন তিনি। পুরুষ সমাজের অনৈতিকভাবে আরোপিত নির্বাসনে যেতে তিনি বাধাদান করেছেন সীতাদেবীকে। এই ঘটনার জন্য উর্মিলা পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন এবং তাঁর স্বামী লক্ষ্মণকে তীব্রভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন। মোটের উপর, নারীত্বের অবমাননা নীরবে সহ্য করেন নি উর্মিলা। পুরুষের এই রূপ একতরফা সিদ্ধান্তের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রতিকারের জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। এ পালায় উর্মিলা পালাকারের অভিপ্রায় অনেকখানিই সিদ্ধ করেছেন, — এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

সমাজের বলি (১৯৪২) —ব্রজেন্দ্রকুমারের অধিকাংশ যাত্রাপালার ন্যায় এই পালাখানিও কলিকাতা ডায়মণ্ড লাইব্রেরী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিল। মাটির সূর্য, সূর্য দত্তের পরিচালনায় নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি এই পালা প্রযোজনা করে। পালাকার মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত 'কাঞ্চনকন্যা' বা 'ধোপার পাট' আখ্যায়িকা থেকে এই পালার কাহিনী সঞ্চয়ন করেছেন। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী কিংবা চরিত্র অথবা দেবতা আশ্রয়ে রচিত যাত্রাপালা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালাও যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছতে পারে, ঐতিহাসিক

পালা রচনার যুগে ব্রজেন্দ্রকুমারের পল্লীগাথানির্ভর যাত্রাপালা 'সমাজের বলি'-র প্রযোজনা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এ পালার কাহিনী অতি সরল। ধোপার মেয়ে কাঞ্চনের প্রেমে পড়ে রাজকুমার রূপ। কিছু দিন বাদে রাজা এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন। রূপের সঙ্গে কাঞ্চনের বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য রাজা অনন্তদেব প্রৌঢ় নটবরকে প্রেরণ করেন কাঞ্চনকে বিবাহ করার জন্য। কিন্তু কাঞ্চন নটবরকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর রাজার অত্যাচারে কাঞ্চন আত্মহননে উদ্যত হয়। কিন্তু রাজকুমার রূপ তাকে উদ্ধার করেন। ভবঘুরে পরাশর এরপর কাঞ্চন এবং রূপকুমারের বিবাহ দেয়। বিবাহের পরে নবদম্পতি রাজ্যত্যাগ করে পালিয়ে যায়। পলায়িত রূপ-কাঞ্চন বংশী রজকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে কাহিনী অন্যদিকে মোড় নেয়। ঐ রাজ্যের রাজকন্যা এদিকে রূপকুমারের রূপে মুগ্ধ হয়। অনন্ত রায়ের চক্রান্তে রূপকুমার রুক্মিনীকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে কালক্রমে কাঞ্চন পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে মা হয়। তুচ্ছ কারণে রূপকুমার কাঞ্চনকে ভুল বুঝলে অভিমানে কাঞ্চন খোয়াই নদীতে আত্মহত্যা করে।

এ পালার সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র ধনাই মাঝি। সে-ই- রূপকুমার এবং কাঞ্চনকে নদী পার করে দিয়ে তাঁদের পলায়নে সহায়তা করেছিল। রাজার পাশবিক অত্যাচার, পীড়ন সহ্য করেও সে রূপ-কাঞ্চনের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে মুখ খোলে নি। নির্ভীক ধনাই মাঝি ভয়কে জয় করে বলেছিল— 'ভয় করবে ভদ্দরলোকেরা, ছোটলোকের আবার কিসের ভয়?'

(২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য)

মৃত্যুকালে ধনাই মাঝির কণ্ঠের গানটি স্বাভাবিকভাবে দর্শকমনে গভীর বেদনা ও সহানুভূতি সঞ্চার করে।

ধনাই ।। "বিদায় আমার পান্‌সী রে, শেষ হল মোর বাওয়া।
মিটলো আজি এই দুনিয়ায়, আমার দাবিদাওয়া" (৪র্থ অঙ্ক , ১ম দৃশ্য)

অভিজাত ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি অনন্ত রায় জাত্যাভিমানী, দাম্ভিক এবং অত্যাচারী। পুরন্দর কামন্দক লম্পট। রুক্মিনীর ভাই চিত্রসেন ব্যক্তিত্বহীন যুবক। অন্যদিকে,রুক্মিনীর দাদা বজ্রবাহু, অনন্ত রায়ের সেনাপতি হলায়ুধ এবং রুক্মিনীর মা করুণাময়ী মহত্ত্বে সমুজ্জ্বল।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এই পালায়, নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি উচ্চবর্ণের তথা অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের ঘৃণা, মানসিক নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নশ্রেণীর মানুষ ধনাই মাঝির নির্ভীকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশংসনীয়।

রাজনন্দিনী (১৯৪২) —— ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রকুমারের এই যাত্রাপালাটি ১৯৪২ সালেই রঞ্জন অপেরা পার্টি আসরস্থ করে। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকে সাধারণ মানুষের ভূমিকা বিশেষ থাকে না। ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর যাত্রাপালায় সাধারণ মানুষের কথা বলার সুযোগ করে দিতে কাল্পনিক পালারচনা শুরু করেন। সেই সূত্রেই পৌরাণিক পালারচনার পথ ছেড়ে ব্রজেন্দ্রকুমার কাল্পনিক যাত্রাপালা 'রাজনন্দিনী '-রচনা করেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং শ্রেণীচেতনার আভাস ফুটে উঠেছে এই পালায়। একটি সাক্ষাৎকারে ব্রজেন্দ্রকুমার এই পালা রচনার প্রেরণা সম্পর্কে বলেছেন —

"দুর্ভিক্ষের সময় এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, তিনি মরবেন, তবু 'ছোটলোকের' ছোঁয়া খাবেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত মরেছিলেন, আমিও তখনই পরিকল্পনা করেছিলাম জাতিভেদ নিয়ে লিখবো।" ৪৯

ব্রজেন্দ্রকুমারের উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে আমরা 'রাজনন্দিনী' নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবগত হই এবং একথা বলতে পারি, রাজনন্দিনী কাল্পনিক নাটক হলেও বাস্তব ঘটনা আশ্রয়ী পালানাটক।

এ পালায় দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ্ব সরাসরি দেখানো হয়েছে — (১) অভিজাত শ্রেণী, (২) বঞ্চিত ব্যাধজাতি শ্রেণী। ব্যাধজাতির আবার দুটি সত্তা। একদিকে, রাজারাম, বসুমতী এবং বাঘা অভিজাত শ্রেণীর কবল থেকে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়। কিন্তু অপরদিকে রাজারামের পিতা সহজ সরল দয়ারাম দীর্ঘকালীন সংস্কারের বশে মনে করে অভিজাতদের পায়ের নিচে থাকবার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে। যাই হোক, রাজারামের নেতৃত্বে ব্যাধজাতি অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি রাজা হংসধ্বজের রাজ্য আক্রমণ করে। রাজারামদের হাতে রাজা হংসধ্বজ পরাজিত এবং বন্দী হন। কিন্তু দয়ালু রাজারাম তাঁকে মুক্তি দেন। — এখানেই ব্যাধজাতির মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এই পালাভিনয় করে রঞ্জন অপেরা অশেষ দর্শকসমাদর লাভ করেছিল।

দেবতার গ্রাস (১৯৪৪) —— পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক যাত্রাপালা। ১৯৪৬ সালে ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে নাটকটি প্রকাশিত হয়। সূর্যকুমার দত্তের নির্দেশনায় নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি কেবলমাত্র গদ্য সংলাপে রচিত এই পালাখানি সর্বপ্রথম আসরে রূপদান করেছিল।

বিদিশার রাজা ধর্মধ্বজের কন্যা তুলসীর স্বয়ম্বর সভায় শঙ্খচূড় নিমন্ত্রিত না হওয়ায় শঙ্খচূড় ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হন। অপমানিত শঙ্খচূড় আসুরিক নিয়মানুযায়ী স্বয়ম্বর সভা থেকে তুলসীকে অপহরণ করে বিবাহ করেন। এরপর মহাদেব স্বর্গজয়ী দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়কে স্বর্গত্যাগ করতে বললে শঙ্খচূড় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। স্বভাবতঃই দেবগণ দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে বিদিশাধিপতি ধর্মধ্বজ দেবতাদের পক্ষ নেন। তুলসীর আরাধনায় বিষ্ণু শঙ্খচূড় রূপে তুলসীকে প্রতারণা করে। কিন্তু তুলসী এ সত্য জানত না যে, শঙ্খচূড় এবং বিষ্ণু অভিন্ন। তুলসীর মৃত্যুর পর বিষ্ণুর বাণে শঙ্খচূড় নিহত হন এবং বিষ্ণুদেহে লীন হয়ে যান। — এ নাটকের এখানেই পরিসমাপ্তি হয়েছে।

এ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হোল, মর্ত্যবাসীদের প্রতি দেবতাদের অন্যায় দমন-পীড়ন ও শক্তি প্রয়োগের সমালোচনা। পৃথিবীতে মর্ত্যবাসীরা যখন মাথা তুলতে চেয়েছে, তখনই দেবতার গ্রাস তাদের নিঃশেষ করেছে। এই নাটকে দৈত্যদের মর্ত্যপ্রীতি এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। আদি, বীর ও করুণ রসের সমাহারে পালাখানি সফলতা লাভ করেছে।

মায়ের ডাক (১৯৪৫) —রূপকাকারে জীবনীমূলক নাটক। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে ব্রজেন্দ্রকুমার এই যাত্রাপালাখানি রচনা করেন। কলকাতার ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে নাটকটি প্রকাশিত হয়। এই পালার আরেকটি নাম 'নাটক নয়'। 'নাটক নয়' নামেই নট্ট কোম্পানীর কর্ণধার সূর্য দত্ত ১৯৪৫ সালে পূর্ববঙ্গে নাটকটি প্রযোজনা করেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনী রূপকাকারে

এই পালায় প্রকাশিত হয়েছে। ইংরাজ বিতাড়নে এবং স্বাধীনতা অর্জনে নারীদেরও যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, এ পালায় তা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই পালানাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গানখানি ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু গান নয়, রবীন্দ্র - কবিতার অংশবিশেষ এ পালায় সংযোজিত হয়েছে। এ পালার অসাধারণ সংলাপে দর্শকমন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে —"অহিংসায় দেশোদ্ধার হবে না।" কিংবা কয়াধুরের অসুস্থ সন্তান সব্যসাচী (সব্যসাচী সুভাষচন্দ্রের প্রতীক) যখন বিদেশে চলে যায়, তখন কয়াধুরূপী রাখালরানী বলেছেন —"যদি একটা ছেলের বিনিময়ে সহস্রের জীবন পাওয়া যায়, তাহলে আমি তাকে বুকের উপর রেখে বলি দিতে পারি।" (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) ব্রজেন্দ্রকুমার চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের মায়েরা কয়াধুর মতোই বজ্রকঠোর হোন, দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনে আপন সন্তানকে তারা এগিয়ে দেন। কয়াধুবেশী রাখাল দাস অর্থাৎ রাখালরানী উভয় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে সেই জাগরণের গানই গেয়ে বেড়িয়েছেন। এ পালার অভিনয় সাফল্য সর্বস্রোত।

উজানীর চর (১৯৪৬) — পালাখানি সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কোন পেশাদার যাত্রা সংস্থা নয়, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেই ইছাপুর নর্থল্যাণ্ড হাই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ১৯৪৬ সালেই এই পালাভিনয় করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক পালারচনার ধারায় ব্রজেন্দ্রকুমারের এই যাত্রাপালাটি একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পালা 'উজানীর চর'। এই পালার চরিত্রদ্বয় মহিম এবং জামাল যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তারা পরস্পর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অথচ জমিদার সরগরম সিং আর তাঁর নায়েব দরবরাজ খাঁ যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইল। ভাবতে অবাক লাগে, এরূপ জঘন্য কাজে নিয়োজিত হল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দু'জন শয়তান। কুলাঙ্গার ঢালী ও কুষ্মাণ্ড মণ্ডল নিশীথের অন্ধকারে হিন্দুমন্দিরে গোরুর ঠ্যাং এবং মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে শুয়োরের পা রেখে দিয়ে মন্দির এবং মসজিদ দুই-ই অপবিত্র করলো। সাম্প্রদায়িক কৌশলে তারা মন্দির অপবিত্র করার দায় চাপিয়ে দিল মুসলমান সম্প্রদায়ের কাঁধে এবং মসজিদ অপবিত্র করার দায়িত্ব নিক্ষেপ করল হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর। এই সাম্প্রদায়িকতায় ঘৃতাহুতি দিল নির্বোধ পুরোহিত এবং অবিবেচক ইমাম। শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবহমানকালের ঐক্যে ফাটল ধরে বিভেদের শক্ত দেওয়াল খাঁড়া হল। বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ সংকটকালীন অবস্থায় জামাল ও মহিম বিভ্রান্তির শিকার হল। তবে জামাল ও মহিমের সন্তানেরা জমিদারের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত ধরতে পারল। তাদের 'নিঃশেষে প্রাণদান ক্ষয় না হয়ে' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান ঘটালো। এই ভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনয়নের মধ্য দিয়েই নাটকের সমাপ্তি ঘটে। এ পালার কাহিনী, সংলাপ এবং সঙ্গীত পালাখানিকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

গন্ধর্বের মেয়ে (১৯৪৬) — ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর কর্ণধার শ্রী কানাই লাল শীল এই পালাটি প্রকাশ করেন। ঐ সালেই নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি এই পালাভিনয় করে। ব্রজেন্দ্র কুমারের

এই পালাখানি পৌরাণিক যাত্রাপালা হিসাবে কথিত আছে। কিন্তু এ পালার কাহিনী ও ঘটনাবলীতে সে পরিচয় পাওয়া যায় না।

এ পালার ভিতর দিয়ে পালাকার একটি মহৎ সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। যাত্রাপালাগানের মাধ্যমে মানুষের মনে তিনি একটি মানবিক চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছেন। তিনি কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে মানুষের কুসংস্কার ও ভীতি দূর করতে প্রয়াসী হয়েছেন এ পালায়।

পালার শুরুতেই দেখা যায়, সত্রাজিৎ নামে এক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত চাষী আরোগ্য লাভের কামনায় দেবী চণ্ডীর মন্দিরে এসেছে। তার বিশ্বাস, দেবীর নির্মাল্য লাভ করলে তার অসুখ সেরে যাবে। যাই হোক, তাকে দেখে পুরোহিত বিরক্ত হলো। আর রাজকন্যা অর্চনা ঘৃণায় থু থু ফেলে মন্দির ছেড়ে চলে গেল। মন্দিরের মালিকও রাজার আদেশে বলপ্রয়োগ করে সত্রাজিৎকে মন্দির থেকে প্রহার করে বের করে দিলেন। এমন সময়ে বাসব নামে এক যুবক মন্দিরে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রহৃত, রুগ্ন, রোগাক্রান্ত সত্রাজিৎকে আলিঙ্গন করে সাদরে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাসবের সেবা যত্নে এরপর সত্রাজিৎ রোগ মুক্ত হল।

কুষ্ঠরোগ যে নিরাময়যোগ্য এবং কুষ্ঠরোগীরা যে ঘৃণার পাত্র নয়— এই লোকশিক্ষা পালাকার প্রচার করতে চেয়েছিলেন এই পালার মধ্য দিয়ে। এই ধরণের পালার মাধ্যমে পালাকার অস্পৃশ্যতা এবং ঘৃণার মতো সামাজিক ব্যাধিগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন। এত বছর পরেও এ পালার প্রাসঙ্গিকতা কমে নি। মানুষের মনে এই মানবিক ও বৈজ্ঞানিক চেতনাবোধ জাগ্রত করতে বর্তমান কালেও এই পালাভিনয় বাঞ্ছনীয়।

পরশমণি (১৯৪৬) — কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী থেকে এই সামাজিক যাত্রাপালাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সুবিখ্যাত নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি সর্বপ্রথম এই পালাভিনয় করেছিল।

চারণকবি মুকুন্দদাসের স্বদেশী এবং সামাজিক যাত্রাপালাভিনয়ে গোটা বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, পেশাদার যাত্রায় তখনও পর্যন্ত সামাজিক পালাভিনয় প্রচলিত হয় নি। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচনা করলেন সামাজিক যাত্রাপালা 'আকালের দেশ' (১৯৪৩)। পেশাদার যাত্রায় সেটাই প্রথম সামাজিক যাত্রাপালা প্রযোজনা। এই পালারচনার ধারাতেই এর তিন বছর পরে পালাসম্রাট নট্ট কোম্পানীর জন্য রচনা করলেন 'পরশমণি' যাত্রাপালাখানি। এই নাটকে রাজা, সেনাপতি, যুদ্ধ প্রভৃতি চরিত্র ও অনুষঙ্গ থাকলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করেই এ নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। এ নাটকে রাজবাড়ির নোংরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দরিদ্র পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনী।

আরব্য রজনীর বাদশা শারীয়ারের মতই এ নাটকের রাজা গৌরীশংকর নিজের ভোগবাসনা পূর্ণ করতে রাজ্যের যুবতী নারীদের হরণ করে নিয়ে আসেন। প্রথম দিন ভোগ করার জন্য মেয়েটিকে রাজা বিবাহ করেন বটে, কিন্তু পরের দিনেই তিনি মেয়েটিকে হত্যা করেন। দরিদ্র ঘরের বিদূষী কন্যা মনীষাও এমনি করে একদিন চুরি হয়ে যায়। লম্পট, অত্যাচারী,

মাতাল রাজা কিন্তু মনীষার ব্যক্তিত্বের কাছে পরাভূত হন। রাজ্যের মঙ্গল কামনায় মনীষা রাজা গৌরীশংকরকে বিবাহ করেন এবং রাজদণ্ড নিজের হাতে তুলে নেন। রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রথমেই তিনি দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্মচারীদের অপসারণ করেন এবং বিলাসী রাজার শিক্ষার ভার অর্পণ করেন আপন প্রেমিক, বিদ্বান বসন্তের হাতে। পালার শেষাঙ্কে দেখা যায়, সুশিক্ষা লাভ করে রাজার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং গোটা রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এই পালার ভূমিকায় ব্রজেন্দ্র কুমার বলেছেন, "একজন পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল হইলে একটা সংসারের যত ক্ষতি করিতে পারে, একটিমাত্র নারীরত্ন তার দশগুণ উপকার করিতে পারে।" (ভূমিকা, পরশমণি) এ পালার পাঠপরিচয়ে আমরা দেখতে পাই, মনীষা তাঁর ব্যক্তিত্ব, মানসিক দৃঢ়তা এবং সর্বশক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন এবং উচ্ছৃঙ্খল রাজা গৌরীশংকরকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছেন।

এ নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায়, বন্দী অবস্থায় মনীষা অত্যাচারী লম্পট রাজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে ভাবে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন, তাতে তার তেজস্বিনী নারী মূর্তিটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মনীষা ।। কেন তুমি রাজসিংহাসনে বসেছ মূর্খ? তুমি কি মনে করেছ, প্রজাদের গায়ে গণ্ডারের চামড়া যে তুমি যত খুশি আঘাত করবে, আর তারা কথাটিও কইবে না? .... যখন তারা জাগবে, তখন তোমার এই অহংকারের প্রাসাদ তাসের ঘরের মত ছড়িয়ে পড়বে।

(১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

রাজ্যের কল্যাণে, আপন প্রেমকে বলি দিয়ে, রাজাকে বিবাহ করে, রাজশক্তি করায়ত্ত করে, মনীষা যখন রাজকর্মচারী দেওয়ানজীকে কাজের কৈফিয়ৎ চান, তখন তাঁর মধ্যে প্রতিভাত হয় একজন প্রখর রাজনীতিবিদ্‌ ও সুযোগ্যা প্রশাসিকার ছবি—

মনীষা ।। পঁচিশ হাজার টাকার বাঁধ নিশ্চয়ই অন্ততঃ এক ক্রোশ দীর্ঘ। ....এতবড় বাঁধ রতনপুরে কোন্‌খানে গোপন করে রেখেছেন দেওয়ানজী? বাঁধটি বোধহয় আপনার কল্পনাতেই আছে, না? (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

শুধু তাই নয়, রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সন্ত্রাসবাদ তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছেন। সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, এ নাটকের কাহিনী, সংলাপ, সংগীত এবং মনীষা চরিত্রে রাখালরাণীর অসাধারণ অভিনয় যাত্রানুরাগী দর্শকদের আশা পূরণ করেছিল।

প্রতিশোধ (১৯৪৮) — পালাটি নির্মল সাহিত্য মন্দির ১৯৫৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। নিউ চণ্ডী অপেরা ১৯৫৪ সালে এই পালাটি প্রথম অভিনয় করে। সূর্য দত্তের পরিচালনা এবং নির্দেশনায় ১৯৫৫ সালে নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি এই পালা পুনরাভিনয় করে। এইবার পালাটি সুপারহিট হয়। সত্তরের দশকের শেষভাগে 'অভিনেত্রী' অপেরা আবার প্রতিশোধ পালা প্রযোজনা করে। বিভিন্ন অপেশাদার যাত্রাদলেও এই পালা সগৌরবে অভিনীত হয়েছিল। এ পালার সপ্তাধিক মুদ্রণ পালার জনপ্রিয়তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

প্রতিশোধ পালার কাহিনীর মূল উৎস বৌদ্ধ আখ্যায়িকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মস্তক

বিক্রয়'কবিতার সূত্র ধরেই এই পালা শুরু হয়েছে। এ পালার ভূমিকায় পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে বলেছেন—

> "মহাবস্তবদান'-এর আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'মস্তকবিক্রয়' কবিতা ছাত্রাবস্থা হইতেই আমার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 'প্রতিশোধ' নাটক তারই পরিণতি—। .... এই ধরণের কবিতা মূল নাটকে আর কখনই অভিনীত হয় নাই।" ৫০

'মস্তকবিক্রয়' কবিতায় কাশীরাজ এবং কোশলরাজের সঙ্গে কেবলমাত্র বণিক উপস্থিত ছিল। যাত্রাপালা হিসাবে 'প্রতিশোধ' পালার বিস্তৃতি সাধনের উদ্দেশ্যে পালাকার আরও কয়েকটি চরিত্রের অবতারণা করেছেন এই পালায়। যাত্রার কলেবর বৃদ্ধির জন্য নূতন চরিত্রের সংযোজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল পালাকারের কাছে।

কাশীরাজ অরাতিদমনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজারা পার্শ্ববর্তী রাজ্য কোশলরাজের আশ্রয়ে চলে গেলে কাশীরাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন। তাঁর অসম্মতিতে তাঁরই অনুজ ইন্দ্রদমন কোশলরাজের দৌহিত্রী কবিতাকে বিবাহ করলে তাঁর ক্রোধের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ক্রুদ্ধ কাশীরাজ অতঃপর কোশল আক্রমণ করেন। কবিতার দাদা শক্তিধর, কোশল সেনাপতি বজ্রদত্ত এবং অরাতিদমনের ভাই ইন্দ্রদমন তখন কোশলকে রক্ষা করতে অমিত বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে কাশীরাজের সেনাপতি পর্যুদস্ত হলে শক্তিধর গোপনে অরক্ষিত কাশী আক্রমণে ছুটে যায়। কোশলরাজ শক্তিধরের এইরূপ হীন কার্যে ক্ষুব্ধ হন। এদিকে কবিতা বিবাহের পর কাশীতে গেলে রাজমাতা বিপাশার কাছে অপমানিতা হন। শক্তিধর কাশী আক্রমণ করতে গেলে স্বামীর রাজ্য এবং সম্মান রক্ষার্থে তিনি নিজেকে আহুতি দেন। শক্তিধর তখন মর্মাহত হয়ে ফিরে যান। কবিতার মৃত্যু সংবাদে কোশলরাজ রাজ্যপাট ত্যাগ করে চলে গেলে ইন্দ্রদমন পাগল হয়ে যান। সেই সুযোগে দুষ্ট অরাতিদমন কোশল অধিকার করেন। এদিকে বনের মধ্যে আত্মগোপনকারী কোশলরাজের কাছে উপস্থিত হন, বন্দরে আটক থাকা বাণিজ্য তরীর এক বণিক। শুল্ক মিটিয়ে বাণিজ্যতরী মুক্ত করতে তিনি দয়ালু কোশল রাজের নিকট অর্থ ভিক্ষা করেন। ইতিপূর্বেই কাশীরাজ, কোশলরাজের মাথার মূল্য ঘোষণা করেন বিশ হাজার টাকা। নিঃস্ব কোশলরাজ বণিককে সাহায্য করবেন বলে, নিজের মস্তকের বিনিময়ে বিশ হাজার টাকা আনতে কাশীরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ইতিমধ্যে কাশীরাজের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি কোশলরাজ সত্যসেনকে বন্দী না করে সসম্মানে তাঁর রাজ্য ফেরৎ দেন।— এ পালার কাহিনী এখানেই সমাপ্ত হয়েছে।

এই পালায় দেখা যায়, কাশীরাজ অরাতিদমন কূটকৌশলী, ক্রোধোন্মত্ত এবং যুদ্ধবাজ। পালার শেষাংশে তাঁর মানসিক ভাবান্তরে তিনি দর্শকদের সহানুভূতি লাভ করেছেন। কোশলরাজ সত্যসেন যুদ্ধবিমুখ, মানবদরদী, দয়ালু, তিনি সত্যের পূজারী। মানবিক গুণে সমৃদ্ধ সত্যসেন নিজের মস্তক বিক্রয় করেও বিপদগ্রস্ত বণিককে আর্থিক সংকটের হাত থেকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হয়েছেন। ইন্দ্রদমন ন্যায়বান, সংগ্রামী এবং পত্নীপ্রেমিক। কবিতা রমণী হয়েও দুর্বলা,অসহায়া নন, শ্বশুরের রাজ্য এবং স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি শহীদ হন। এ পালার নায়িকা নির্বাচনে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। যাত্রার ঐতিহ্য অনুযায়ী এ পালার

নায়িকা কবিতা সুন্দরী নন। যাত্রা পালার নায়িকা নির্বাচনে যাত্রার আবহমানকাল ধারার উপরে ব্রজেন্দ্রকুমার একটা চ্যালেঞ্জ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই সফল হয়েছেন।পালাকারের সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আরও বলা যায় যে, যুদ্ধবিরোধিতা ও প্রাদেশিকতার নিন্দা করে তিনি লোকনাট্যকারের ভূমিকা যথার্থরূপে পালন করেছেন। মিলনাত্মক এই পালাভিনয় করে নট্ট কোম্পানী প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিল।

ধরার দেবতা (১৯৪৮) — রূপকাশ্রিত পালাখানি কলকাতা টাউন লাইব্রেরী ১৯৪৮ সালেই প্রকাশ করে। মূলতঃ মহাত্মা গান্ধীর জীবন কাহিনী রূপকাশ্রয়ে এই নাটকে পরিবেশিত হয়েছে। এ নাটকের প্রধান চরিত্র শুকদেবই রূপকাশ্রয়ী মহাত্মা গান্ধী। তাই শুকদেবই ধরার দেবতা। কোন মূল্যেই তিনি তার অহিংস নীতি থেকে কখনও সরে আসেননি। ভেদাভেদহীন শুকদেব শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলকেই সমান ভালোবাসতেন। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও শুকদেব ঘাতককে অভিশাপ দেননি। রবীন্দ্র কবিতার অংশ বিশেষ এবং নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটি এ নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকটিতে আদি, রৌদ্র, বীর, করুণ ও বীভৎস রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

কোহিনূর (১৯৫১) — নাটকটি কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি এই পালা প্রথম প্রযোজনা করে। তালাক প্রথার কুফল সুপ্রসিদ্ধ এই পালাখানিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

এ পালার কাহিনীতে দেখা যায়, রোহিল খণ্ডের নবাব গোলাম কাদেরের স্ত্রী হলেন হামিদা। কিন্তু নীচু বংশের মেয়ে বলে মিথ্যে অপবাদে নবাব তাকে তালাক দেন। তালাকপ্রাপ্তা হামিদাকে অতঃপর নবাবের প্রাসাদেই বাঁদীর কাজ করতে হয়। নবাবের এইরূপ অনৈতিক ব্যবহারে হামিদা অপমানিত বোধ করেন। স্বভাবতই অপমানিত এবং বঞ্চিত হামিদা এরপর হিংস্র হয়ে ওঠেন। অতঃপর হামিদা প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে গোলাম কাদেরকে হত্যা করেন। এ পালার কাহিনী এখানেই শেষ হয়েছে। তালাক প্রথার ন্যায় সামাজিক ব্যাধির সমালোচনা এবং এই অমানবিক প্রথার প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করায় পালাখানি লোকশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে। সমাজে বঞ্চিতা নারীরা এ পালার হামিদার কাছ থেকে প্রতিবাদের ভাষা গ্রহণ করতে পারবেন।

বিচারক (১৯৫৩) — পালাখানি কলিকাতার ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। পঞ্চাঙ্ক এই ঐতিহাসিক পালাটি ১৯৫৩ সালে নবরঞ্জন অপেরা অভিনয় করে। কিন্তু নবরঞ্জন অপেরা এই পালার অভিনয় বিশেষ জমাতে পারে নি, যদিও এই পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র বিক্রমাদিত্যের ভূমিকায় রূপদান করেছিলেন অভিনয় জাদুকর পঞ্চু সেন। যাইহোক অভিনয় সফলতার লক্ষ্যে ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, যিনি বড় ফণীবাবু নামে যাত্রা জগতে সুপরিচিত, পালাটি তাঁর বিশেষ ভালো লাগায়, তিনি স্বয়ং বিক্রমাদিত্য চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে 'সাঁজের আসর' যাত্রাদলে এটি অভিনয় করান। 'সাঁজের আসর' এই পালাভিনয় করে অকুণ্ঠ দর্শক-অভিনন্দন লাভ করেছিল। স্বভাবতঃই এরপরে এই গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণ অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। বিক্রমাদিত্য চরিত্রে অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ পালাকার ব্রজেন্দ্র কুমার দে এই নাটকটি স্বনামধন্য অভিনেতা পঞ্চু সেন কে উৎসর্গ করেন।

উজ্জয়িনীর রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে (৩৮০খ্রীঃ - ৪১৩ খ্রীঃ) আশ্রয় করে এই পালার মূল কাহিনী রচিত হয়েছে। বত্রিশ সিংহাসনের অধিকারী বিক্রমাদিত্য ছিলেন আদর্শ বিচারক। নাটকটিতে রাজার ন্যায় বিচারের পরিচয় প্রদর্শিত হয়েছে বলে এ নাটকের নাম রাখা হয়েছে 'বিচারক'। "নাটকে ঐতিহাসিকতা অপেক্ষা কল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে" (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য) — মন্তব্যটি যথার্থ। তবে একথাও সত্য যে, ইতিহাসের ভিত্তিতে কল্পনার আশ্রয়ে নাটক রচনার স্বাধীনতা আছে নাট্যকারের। রচিত নাটকে ঐতিহাসিক রস ফুটে উঠলেই যথেষ্ট, তখন সেই নাটককে অনৈতিহাসিকতা-দোষে দুষ্ট বলে চিহ্নিত করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যটি সর্বজনগ্রাহ্য। —

> "ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন, মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নাই, কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ্যমাত্র।
>
> "অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।" ৫১

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি ঐতিহাসিক নাটক বা যাত্রা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই পালায় ব্রজেন্দ্রকুমার কল্পনার আশ্রয় নিলেও ঐতিহাসিক রস সঞ্চারে সমর্থ হয়েছেন।

এই পালায় ঐতিহাসিক চরিত্র বিক্রমাদিত্যের মধ্যে সন্তান বাৎসল্য ও রাজকর্তব্যের দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত রাজকর্তব্যের জয় ঘোষিত হয়েছে — "বিচারকের কাছে পুত্র বা দৌহিত্র কেউ নেই। এই মাত্র আমি আমার পুত্রের প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছি" (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)। নাটকের সমাপ্তিতে দেখা গেছে, ধর্ম রক্ষা করে পক্ষপাতহীন বিচারের ফলে বিক্রমাদিত্য বত্রিশ সিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন। এ পালায় বিক্রমাদিত্যের পুত্র সোমনাথ লম্পট ও উচ্ছৃঙ্খল। সোমনাথের বালকপুত্র স্কন্দ পিতৃভক্তি ও আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। পক্ষীরাজ ও তার স্ত্রী ভূতি চরিত্র যুগলের মাধ্যমে এই পালায় হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে।

এ নাটকে গানের সংখ্যা সতেরো। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য পালাটি অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়। সেখানেও এ পালা যাত্রানুরাগী দর্শকদের সমাদর লাভ করে। নাটকটিতে আদি, বীভৎস, বাৎসল্য ও করুণ রসের সঞ্চার হয়েছে।

প্রতিদান (১৯৫৬) — পালাধর্মী এই নাটকটি প্রকাশ করে কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী। কোন পেশাদার যাত্রাদল নয়, ইছাপুর নবাবগঞ্জের একটি অ্যামেচার যাত্রাপার্টি ব্রজেন্দ্রকুমারের এই পালানাটকটি প্রযোজনা করেছিল। ভারতবর্ষের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্তী কাল — এই সন্ধিক্ষণটি এ পালার পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে অসংখ্য মেকী, ছদ্ম দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা আন্দোলনের নাম করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছিলেন। ভেখধারী দেশপ্রেমিকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসন্ন। স্বাধীনতা লাভের পর তাঁরাই অর্থ এবং ক্ষমতার জোরে মন্ত্রী হলেন। শুরু হয়ে গেল স্বজনপোষণ, অর্থ তছরূপ ও দুর্নীতি গ্রহণের পালা। অন্যদিকে যাঁরা প্রকৃত দেশপ্রেমিক তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই বঞ্চিত রয়ে গেলেন। দুনীর্তিপরায়ণ মেকী নেতারা স্বাধীনতার ফসল ভোগ করে দেশের জনগণের দিকে খোসা ছুঁড়ে দিলেন। এ পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র অধীর এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন —

অধীর।। ইংরেজকে তাড়াবার জন্য যারা রক্ত দিয়েছে তোমাদের মতো দিশি শয়তানদের তারাই আজ কান ধরে নামিয়ে দেবে। (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

অধীর আশাবাদী। তাঁর বিশ্বাস, মন্ত্রীদের এইরূপ দুনীর্তির শীঘ্রই অবসান হবে। এ নাটকে সংগ্রামের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সংগ্রাম দেখানো হয় নি কখনোই। ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রতিদান পালা বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

বালির বাঁধ / কাণ্ডারী হুঁসিয়ার (১৯৬০)— রচনার দীর্ঘদিন পরে নির্মল সাহিত্য মন্দির যাত্রা পালাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। ১৯৬০ সালে নিউরয়েল বীণাপাণি অপেরা 'বালির বাঁধ' নাম প্রদান করে নাটকটি অভিনয় করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় — পুলিশের নির্দেশে এই পালাভিনয় বহু স্থানে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর এই পালা 'ধ্বংসের ডাক' নামে অভিনয় করা হলে আর কোন বাধা আসে নি। দীর্ঘদিন এই পালাভিনয় অব্যাহত থাকলেও নাটকটির পুনর্মূদ্রণে কোন প্রকাশক সংস্থাই আগ্রহ দেখান নি। ১৯৭৪ সালে নির্মল সাহিত্য মন্দির 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার' নামে পালাখানি প্রকাশ করে। এটি একটি রূপক নাটক। বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে উপজীব্য করে নাটকটি রচিত হয়েছে।

রাজা দেবিদাস (১৯৬০) —ব্রজেন্দ্রকুমর দে রচিত জনপ্রিয় পালাগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় যাত্রাপালা। কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী থেকে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল। নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি দীর্ঘকাল ধরে এই পালা প্রযোজনা করেছিল। গ্রাম-বাংলার সৌখিন সংস্থাগুলিও এই পালাভিনয় করে দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিল। রাজা দেবিদাস পালার বিপুল জনপ্রিতার কারণে শোতৃবৃন্দের অনুরোধে এই পালাভিনয় বেতারেও সম্প্রচারিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী প্রচার, নারী স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের লোমহর্ষক ঘটনাবলী এ পালায় পরিবেশিত হয়েছে।

লোহার জাল (১৯৬০) - পালাখানি নির্মল সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি ১৯৬০ সালেই যাত্রাপালাখানি প্রযোজনা করেছিল। পল্লীকবি দ্বিজ ঈশান রচিত 'কমলা' গীতিকা থেকে কাহিনী সঞ্চয়ন করে ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর 'লোহার জাল' পালাখানি রচনা করেন। তবে সমকালীন প্রেক্ষাপট এই পালায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

এ পালার কাহিনীতে দেখা যায়, গজপতি কারকুন মানিক চাকলাদারের কন্যা কমলাকে দেখে মুগ্ধ হন। কমলাকে বিবাহ করবেন বলে গজপতি কারকুন চিকন গয়লানীকে দূতী হিসাবে

প্রেরণ করেন। কিন্তু কমলা এবং তার অভিভাবকেরা কারকুনের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দু'জন সাধুর সাত কলসী মোহর মানিক চাকলাদারের কাছে গচ্ছিত ছিল। এই কথা দুষ্ট কারকুন জানতেন। প্রতিশোধ নিতে এই ঘটনা তিনি রাজা দয়ালকে বলে দেন। মানিক সেই মোহর দিতে অস্বীকার করলে রাজা তাকে বন্দী করেন। কারকুনের বলা মোহর সংক্রান্ত কথা রাজবাড়ির লোকেরা অবিশ্বাস করেন। এই সময়ে মানিকের ছেলে সুজন রাজবাড়িতে এসে পিতার বন্দীত্বের প্রতিবাদ জানালে রাজা তাকেও বন্দী করেন এবং প্রাণ দণ্ডাদেশ দেন। এই সুযোগে কারকুন মানিকের বাড়ি আক্রমণ করলে কমলা পালিয়ে যায় বটে, কিন্তু মানিকের ছোট ছেলে বিজন সংঘর্ষে নিহত হয়। পলায়মান কমলাকে কারকুন পথিমধ্যে ধরে ফেলে। স্বভাবতঃই কারকুনের এই অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহ করে। কারাগার থেকে সুজন বেরিয়ে এসে কারকুনকে বন্দী করেন। রাজা কারকুনের বদ্ মতলব জানতে পেরে তাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেন এবং নিজপুত্র প্রদীপের সঙ্গে কমলার বিবাহ দেন। সংক্ষেপে এটাই নাট্যকাহিনী।

এ পালার রাজা হঠকারী, অবিবেচক হলেও নাটকের শেষাংশে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন। দূতী চিকন গয়লানী দুশ্চরিত্রা এবং লোভী। অবশ্য দারিদ্র্য তাকে এরূপ হীন কার্যে নামতে বাধ্য করেছে। উচ্চবর্ণের গজপতি কারকুন নীচ, স্বার্থপর, ভোগী এবং নারীলোলুপ। নাটকের সমাপ্তিতে সে যোগ্য শাস্তি লাভ করেছে। রাজপুত্র প্রদীপ সুজন, নির্ভীক, প্রতিবাদী বিপ্লবী, পুত্রহিসাবে তিনি শ্রদ্ধাশীল। মানিক চাকলাদার সৎ, বিশ্বাসী এবং রাজ অনুগত।

এই পালাভিনয়ে নট্ট কোম্পানী বিপুল জনসমাদর লাভ করেছিল। ১৯৬১ সালে শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রথম যাত্রা উৎসবের সপ্তম দিনে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'লোহার জাল' পালাখানি আসরস্থ হয়েছিল। দর্শক হিসাবে সেদিন পালাকার ব্রজেন্দ্র কুমার দে সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। স্বরচিত 'যাত্রার একাল -সেকাল' গ্রন্থে তিনি সেদিনের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন ——

> " উৎসবের সপ্তম দিনে নট্ট কোম্পানীর 'লোহার জাল' দেখতে গিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম, দর্শক সমাগম এতদিনে শেষ হয়ে গেছে। ৬টায় যাত্রারম্ভের কথা, ৫টায় গিয়ে আসর নিলাম। ১৫ মিনিটের মধ্যে জনস্রোত এসে আসর পূর্ণ করে দিল। তবু লোক আসার বিরাম নেই। হৈ-হুল্লোড় হট্টগোল অনুরোধ —তর্কাতর্কি, ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে যাত্রা ঠিক ৬টায় আরম্ভ হল। কুশীলবেরা এসে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু যারা বসতে পায় নি, তারা অপরকে শুনতে দিল না। কুশীলবেরা এসে ফিরে গেলেন। বুকিং বন্ধ হল, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হল না। টিকিট কেটে বহুলোক যেখানে পা রাখতে পেরেছে, দাঁড়িয়েছে। যাদের পা রাখবার জায়গা নেই, তারাও নাছোড়বান্দা। কর্তৃপক্ষ টিকিটের দাম ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু তাতে যাত্রা দেখা ত হবে না। কুশীলবেরা আবার এলেন, আবার নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। যাত্রা আরম্ভ হতে আধ ঘন্টা দেরী হয়ে গেল।" ৫২

উপরে উদ্ধৃত ব্রজেন্দ্রকুমারের অভিজ্ঞতানুসারে আমরা একথা বলতে পারি যে, গ্রাম-গঞ্জে নয়, কলকাতা শহরের বুকে তাঁর 'লোহার জাল' পালাভিনয় যাত্রাপ্রেমী দর্শকদের ভাসিয়ে নিয়ে

গিয়েছিল। সেই জনস্রোত লক্ষ্য করে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমারের সেদিন সৃষ্টির আনন্দে চোখে জল ভরে এসেছিল। আবেগে সেদিন তিনি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। পালাকার হিসাবে সেদিন তিনি 'সব পেয়েছিল দেশে' পৌঁছে গিয়েছিলেন। গল্পে, গানে, রূপায়ণে এই পালা সুপারহিট হয়েছিল।

কবি চন্দ্রাবতী (১৯৬১) — ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে রচিত এই যাত্রাপালা নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা প্রযোজনা করে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিল। এই পালার কাহিনীর উৎস হিসাবে পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে গ্রহণ করেছেন দুটি পল্লীগীতিকা— (১) চন্দ্রাবতী ও (২) দস্যু কেনারাম।

চন্দ্রাবতী ও দস্যু কেনারাম পল্লীগীতিকা অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত কবি চন্দ্রাবতী পালার সূচনায় দেখা যায়, সকন্যা বংশীদাস, কেনারাম ডাকাতের আস্তানা জালিয়া-হাওড়ে ঔষধের সন্ধানে গেছেন। ঐদিনই মনসার ভাসান শুনতে এসে কাশেম আলির মেয়ে জুলেখা কেনারামের দ্বারা আক্রান্ত হয়। অচৈতন্য জুলেখাকে বংশীদাস মনসার ঔষধ খাইয়ে বাঁচিয়ে তোলেন। বংশীদাস এরপর চন্দ্রাবতীর প্রেমিক জয়চন্দ্রের সঙ্গে জুলেখাকে তাঁর পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেন। দস্যু কেনারাম জুলেখাকে দেখতে না পেয়ে চন্দ্রাবতী ও বংশীদাসকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু চন্দ্রাবতীর গান শুনে তার মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সে তখন বংশীদাস ও চন্দ্রাবতীকে মুক্তি দেয়।

জয়চন্দ্র জুলেখাকে সঙ্গে নিয়ে তার পিতৃগৃহে আসলে জুলেখার পিতা কাশেম আলি জুলেখার ইজ্জৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন এবং জয়চন্দ্রকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে জুলেখাকে বিবাহ করতে বলেন। জয়চন্দ্র এই প্রস্তাবে অসম্মত হলে কাশেম আলি তাকে কারারুদ্ধ করেন। কিছুদিন বাদে জয়চন্দ্রের দাদাকেও ধরে আনা হয়। ধর্মত্যাগ করে জুলেখাকে বিয়ে না করলে জয়চন্দ্রের দাদাকেও হত্যা করা হবে। এরূপ সংকটময় পরিস্থিতিতে নিরুপায় জয়চন্দ্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্মান্তরিত হয়ে জুলেখাকে বিবাহ করেন।

এই দুঃসংবাদে মর্মাহত চন্দ্রাবতী স্থির করেন নিজে সারাজীবন অবিবাহিত থাকবেন এবং সীতার কাহিনী রামায়ণ রচনা করে রেখে যাবেন। পালার শেষাংশে জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে এলে চন্দ্রাবতী তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যাত, অপমানিত জয়চন্দ্র ফুলেশ্বরীর জলে আত্মহত্যা করেন। জয়চন্দ্রের মৃত্যুতে অনুতপ্ত চন্দ্রাবতীও নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেয়।

এ পালায় কাশেম আলি এবং ভূতনাথ দু'জনেই ধর্মীয় মৌলবাদী চরিত্র। কাশেম আলি ক্ষমতালিপ্সু, ধর্মান্ধ, অন্যদিকে ভূতনাথ সম্পদলিপ্সু। চন্দ্রাবতী আদর্শ প্রেমিকা। অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী নারী। জুলেখার মৃত্যুর পরে তাঁর পূর্বপ্রেমিকা জয়চন্দ্র তাঁর কাছে ফিরে এলে তিনি জয়চন্দ্রকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছেন —"স্ত্রীর চিতা নিভতে না নিভতেই যে আর একটা নারীর কৃপা ভিক্ষা করতে ছুটে আসে, তার সঙ্গে কথা বলতে আমি ঘৃণাবোধ করি।" আবার জয়চন্দ্রের আত্মহত্যায় ব্যথিত অনুতপ্ত চন্দ্রাবতী একনিষ্ঠ প্রেমিকার মতো নিজেও আত্মহননের

পথ বেছে নেন। তবে তিনি কবি। তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন। বংশীদাস এ পালার অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র। সাম্প্রদায়িক বিভেদহীন গবেষক তিনি। তিনি হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই মৃত্যুঞ্জয় করতে চান। জয়চন্দ্র সৎ, নির্ভীক ও একনিষ্ঠ প্রেমিক। দাদাকে বাঁচাতে অনিচ্ছায় তিনি জুলেখাকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। কিন্তু মনে প্রাণে তাকে মেনে নিতে পারেন না। —এটাই তাঁর জীবনের ট্রাজেডি। কেনারাম দস্যু হলেও মানুষের ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতাকে তিনি সম্মান জানান। চন্দ্রাবতীর তেজস্বিতা, তার সঙ্গীতপ্রীতি এবং বংশীদাসের নির্ভীকতা তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায়। পরিশেষে বলা যায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনয়নে এ পালা আজও অভিনয়ের দাবি রাখে।

রামরাজ্য (১৯৬১) — ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক যাত্রাপালা রামরাজ্য। কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী থেকে ১৯৬১ সালে নাটকটি 'জীবনযজ্ঞ' নামে প্রকাশিত হয়। ধৃতশ্রী নাট্য শিল্পম্ যাত্রাপালাটি প্রথম আসরে রূপদান করে।

এ পালায় শম্বুক চরিত্রে কিছুটা নূতনত্ব আনয়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শম্বুক এখানে রামভক্ত নয়, তিনি রামচন্দ্র বিরোধী। শম্বুকের পিতা শূদ্রবংশজাত এবং মাতা ব্রাহ্মণ বংশীয়। অসবর্ণ বিবাহের অপরাধে শম্বুকের মাতুল গোষ্ঠী তাঁর পিতামাতাকে হত্যা করেন। বালক শম্বুক কোনক্রমে পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে নিজের প্রচেষ্টায় তিনি সামন্ত রাজ্যের রাজা হন। স্বভাবতঃই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতি তার ক্ষোভের অন্ত থাকে না। রাজ্যে তিনি দেবপূজা নিষিদ্ধ করেন নি সত্য, তবে তিনি পূজাকর্ম থেকে ব্রাহ্মণদের অপসারিত করেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার থেকে নিজের জাতিকে রক্ষা করার জন্য তিনি বার্হস্পত্য যজ্ঞের আয়োজন করেন। পালার শেষাংশে দেখা যায়, রাম শম্বুকের যজ্ঞাগার আক্রমন করেছেন এবং যুদ্ধে অসংখ্য শূদ্রের মৃত্যু হয়েছে। পরিশেষে রামের হাতে শম্বুকেরও মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে রামকে শম্বুক শাসায়—

শম্বুক ॥ যতদিন অভাগা এ অন্তজ সন্তান
ব্রাহ্মণ - ক্ষত্রিয় সনে
একাসনে নাহি পাবে ঠাঁই
ততদিন ক্ষুদ্র আর বৃহতের
সিংহ আর মশকের এ সংগ্রাম
শেষ নাহি হবে। (৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

রামচন্দ্রের প্রতি তার এই চ্যালেঞ্জে তার প্রতিবাদী রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে একথাও ঠিক যে, শম্বুক তার আপন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে পারে নি। শম্বুকের আপন দুহিতা দক্ষিণা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহকে অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে করেছে। তার স্ববর্ণের লোকদের মধ্যেই তার অসংখ্য শত্রু থাকায় রামচন্দ্রের পক্ষে তাকে হত্যা করা সহজ হয়েছে।

পালাকার শম্বুক চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং যতদিন না সমাজে বর্ণগত বৈষম্য দূরীভূত হবে, যুগে যুগে ততদিন এই

প্রতিবাদের ধ্বনি অব্যাহত থাকবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমাজের সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং বর্ণগত বৈষম্যের বিষময় ফল প্রদর্শনের জন্য ব্রজেন্দ্রকুমারের এই পালাখানি পুনরাভিনয় অত্যন্ত জরুরী।

রক্তের নেশা (১৯৬৩) — পঞ্চাঙ্ক দেশাত্মবোধক নাটক। তরুণ অপেরা এই পালাখানি সর্বপ্রথম আসরে রূপদান করেন। এ নাটকে রূপকের আশ্রয় গৃহীত হয়েছে। এই রূপক উন্মোচন করলে দেখা যাবে যে, চৈনিক আক্রমনের পটভূমি এ নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। গণের গান, একানে বালকের গান এবং যাত্রা ব্যালে প্রভৃতি গীতসহ প্রায় পনেরোটি গান এই নাটকে পরিবেশিত হয়েছে।

এ নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়, অলকাপুরী পলাশপুরের সঙ্গে চুক্তিস্থাপনের পরে দেশের প্রতিরক্ষা থেকে দৃষ্টি কিছুটা সরিয়ে নেয়। তারা তখন দেশের উন্নয়নে অধিকতর মনোনিবেশ স্থাপন করে। এই সুযোগে পলাশপুর পীরনগরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অলকাপুরীর প্রতিরক্ষক এবং অমাত্যের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে অলকাপুরী আক্রমন করে এবং অলকাপুরীর কিছু অংশ দখল করে নেয়। কিন্তু অলকাপুরীর সেনাপতি জনগণের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে প্রতিআক্রমন করে বিদেশী হানাদারদের বিতাড়িত করে দেশের জমি পুনরুদ্ধার করেন। এরপর শান্তিকামী অলকাপুরী দেশের প্রতিরক্ষায় বিশেষ যত্নবান হয়ে ওঠে। — এই হল সংক্ষেপে নাট্যকাহিনী। এই নাটকের স্থানগুলির নাম রূপকের অন্তরালে আবৃত আছে। প্রখ্যাত লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেছেন ——

> "ইহাতে ভারত 'অলকাপুরী', পাকিস্তান 'পীরনগর', চীন 'পলাশপুর' এবং কাশ্মীর 'গুলবাগ' রূপে কল্পিত হইয়াছে। . . . নাট্য কাহিনীর অন্তরালে রহিয়াছে চীনের সহিত ভারতের পঞ্চশীল চুক্তি, প্রতিরক্ষায় ভারতের যথেষ্ট মনোযোগের অভাব, পাকিস্তানের কাশ্মীরের প্রতি লক্ষ্য ও চীন পাকিস্তানের যোগস্থাপন, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের চীন কর্তৃক ভারত আক্রমন, ভারতের যুদ্ধ, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অপসারণ এবং প্রতিরক্ষায় ভারতের তৎপর হইবার কাহিনী।" ৫৩

ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কৃত নাটকটির রূপক বিশ্লেষণে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কিছু অধ্যায় স্পষ্টরূপে দেখতে পাই। নাটকটিতে অলকাপুরীর রাষ্ট্রনায়ককে শান্তিকামী, অনাক্রমী মনোভাবাপন্ন যুদ্ধবিরোধী হিসাবে দেখতে পাই। অলকাপুরীর প্রতিরক্ষক সুজন সিং বিশ্বাসঘাতক, অর্থলোভী দেশদ্রোহী। অঙ্কুশ অলকাপুরীর সৈন্যধ্যক্ষ। তিনি কর্তব্যপরায়ণ, নির্লোভ, দেশহিতৈষী। পলাশপুরের শাসক মধুকণ্ঠ চুক্তিভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক, সাম্রাজ্যবাদী, তিনি শান্তি বিনাশকারী। পদ্মিনী দেশদ্রোহী সুজনসিং এর কন্যা হলেও তিনি ভিন্ন ধাতুতে গড়া, প্রকৃত দেশপ্রেমিক তিনি। রসুল এ পালায় একানে বালক। দিলবাহার নাট্যঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন চরিত্র। তাকে দিয়ে পালাকার নাটকে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। আদি, করুণ, বীর, বীভৎস ও হাস্যরসের সমন্বয়ে রচিত পালাখানি সে সময় বিশেষ জনসমাদর লাভ করেছিল।

চাঁদ বিবি (১৯৬৪) — ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত একখানি স্মরণীয় ঐতিহাসিক যাত্রাপালা। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত তালাক প্রথা নিয়ে রচিত এই পালানাটকটি

১৯৬৫ সালে নির্মল সাহিত্য মন্দির থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ সালেই নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি এই পালাভিনয় করে।

এই পালার কাহিনীতে জানা যায়, এ পালার খল চরিত্র পীর মহম্মদের অন্যায় কাজকর্ম ইত্যাদি তার স্ত্রী পাপিয়ার নজরে আসে। পীর মহম্মদ শত্রুপক্ষের সঙ্গে চক্রান্তে যোগ দিলে পাপিয়া তাকে ধরিয়ে দেয়। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু পাপিয়ার অনুরোধে চাঁদবিবি তাকে মুক্তি দেন। এরপরেও তার চরিত্রের সংশোধন হয় না। আমেদনগর আক্রমনকারী মোগলসেনার সঙ্গে সে যোগ দেয়। নন্দন সিংহ তাকে ধরে ফেলে। স্বামীর এইরূপ হীনকর্মের প্রতিবাদ করলে পীরমহম্মদ পাপিয়াকে তালাক দেয়। চাঁদবিবির আদেশে পীরমহম্মদ পুনরায় কারারুদ্ধ হলে পাপিয়াই তাকে মুক্তি পাবার ব্যবস্থা করে দেয়। অথচ মুক্তি পেয়েই পীর মহম্মদ পাপিয়াকে হত্যা করে।

এই পালায় পাপিয়ার মধ্যে দেশপ্রেম, নারীর সত্যনিষ্ঠা, পতিপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে তার স্বামী পীরমহম্মদ বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, নীচপ্রকৃতির, নারীঘাতক। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এই পালাটিতে তালাক প্রথার কুফল, মাতৃভূমি রক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রদর্শিত হয়েছে। চাঁদবিবির ভূমিকায় চপল ভাদুড়ী অর্থাৎ চপল রানীর অভিনয় এবং তাঁর অপরূপ রূপসজ্জার সৌন্দর্যে দর্শককুল মোহিত হয়ে যেতেন।

লৌহপ্রাচীর (১৯৬৭) — এই পালাটি কলকাতার ডায়মণ্ড লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয় এবং সুপ্রসিদ্ধ ভারতী অপেরা সর্বপ্রথম অভিনয় করে। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার এই পালায় একজন কর্তব্য পরায়ণ সৎ পুলিশ অফিসারের ট্র্যাজিক জীবনকাহিনী রচনা করেছেন। সত্যকিঙ্কর হলেন উক্ত পুলিশ অফিসার, তিনি একটি থানার দারোগা। তাঁর নামকরণের মধ্যেই তাঁর কর্মরূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি ন্যায়বান, সত্যের দাস, সত্যের পূজারী।

এই পালার কাহিনীতে দেখা যায়, সত্যকিঙ্করের নিজ পুত্র খুনের দায়ে পড়ে। তাঁর সহকর্মীরা তাঁর ছেলেকে বাঁচাতে তৎপর হয়। কিন্তু সত্যকিঙ্কর দারোগা মনে করেন, স্বাধীন দেশের পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। রক্ষক কখনোই ভক্ষক হতে পারে না। তাঁর মতে, পুলিশ হবে ন্যায়বান, কর্তব্যপরায়ণ এবং সমদৃষ্টি সম্পন্ন। সেই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি ছেলেকে গ্রেপ্তার করেন কিন্তু তার ছেলে লৌহপ্রাচীর অর্থাৎ কারাগার থেকে পালিয়ে যায়। তখন নিজের জীবন বিপন্ন করেই সত্যকিঙ্কর জেলপালানো আসামী ছেলেকে খুঁজতে থাকেন। অধস্তন পুলিশ কর্মীদের ব্যঙ্গোক্তি উপেক্ষা করেই খুনী ছেলেকে তার যোগ্য শাস্তি দিতে তিনি বিশেষ তৎপরতা দেখান। আপন ছেলের প্রতি স্বামীর এইরূপ নিষ্ঠুর কার্যকলাপে স্ত্রী হার্ট ফেল করেন এবং মৃত্যু হয় পুত্রবধূর। তথাপি সত্যকিঙ্কর আপন কর্তব্যে অটল থাকেন। পরিশেষে নিজে ও প্রাণ হারান।

সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যাওয়া পুলিশের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পালাকার এই পালা রচনা করেন। সকল পুলিশ অফিসারই কোরাপ্টেড নন, সকলেই স্বজন পোষক নন, এখনও সত্যকিঙ্কর দারোগাদের মতো সৎ কর্তব্যসচেতন পুলিশ অফিসার পুলিশ

বিভাগে বর্তমান — এ নাটকে তা দেখানো হয়েছে। পুলিশের কার্যধারা সর্বক্ষেত্রেই নিন্দনীয় নয়, অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের দায়িত্ববোধ প্রশংসনীয়, সমাজ সচেতন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী নাট্যকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে সত্যকিংকর দারোগার কর্মরূপের পরিচয়ের মাধ্যমে সে কথাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

ঝড়ের দোলা (১৯৬৮) — শ্রীমা বুক সিন্ডিকেট এই পালাটি প্রকাশ করেছিল। ঐ সালেই নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা সর্বপ্রথম এই পালাভিনয় করেছিল।

উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ লোককাহিনী 'সখিনা' আখ্যায়িকা থেকে কাহিনী সঞ্চয়ন করে ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর 'ঝড়ের দোলা' যাত্রাপালাখানি রচনা করেন। এই পালার কাহিনীতে দেখা যায়, বাদশাহী ফৌজের আক্রমনের মোকাবিলা করতে গিয়ে দেওয়ান ফিরোজ খাঁ বন্দী হন। তখন তাঁর সুযোগ্যা বেগম সখিনা নারীবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বীরাঙ্গনা নারীদের পরাক্রমের কাছে বাদশাহী ফৌজ বারবার পরাভূত হয়ে ফিরে যায়। অবশেষে বাদশাহী ফৌজ একটি হীন কৌশল অবলম্বন করে। ফিরোজ খাঁ-র হস্তাক্ষর জাল করে একটি নকল তালাকনামা লিখে ফিরোজের বেগম সখিনার কাছে পাঠায়। এই তালাকনামা সখিনার পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়। সেই সুযোগে বাদশাহী সেনা সখিনাকে হত্যা করে। পালা এখানেই শেষ হয়।

এ পালায় ফিরোজ খাঁ দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। পতিপ্রেমে ভাস্বর সখিনা ব্যক্তিত্বময়ী বীরাঙ্গনা নারী। মুসলমান সম্প্রদায়ের তালাকপ্রথা একজন তেজোস্বিনী নারীকেও মানসিক দিক কতখানি দুর্বল করে দেয়, এমন কি মৃত্যুর দিকে পর্যন্ত ঠেলে দেয়, সখিনা চরিত্রের মধ্য দিয়ে পালারচয়িতা ব্রজেন্দ্রকুমার তা প্রদর্শন করেছেন।

রামী চণ্ডীদাস (১৯৬৮) — এই পালার কাহিনী কিংবদন্তী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। নির্মল সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত এই যাত্রাপালাটি অম্বিকা নাট্য কোম্পানী প্রথম অভিনয় করে।

এই পালার পটভূমি বীরভূমের নানুর নামে একখানি গ্রাম। তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হীন চক্রান্ত এবং করালী, জনার্দন, বিজয়নারায়ণ, গজকুম্ভ ও বাচস্পতি প্রভৃতি মতলববাজদের অসৎ উদ্দেশ্যে মন্দির ব্যবহারের ছবি যেমন এ পালায় ফুটে উঠেছে, তেমন উদার ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস এবং সহজ সরল নকুলের মতো সৎ মানুষদের কাহিনীও সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

এ পালার অনন্য সাধারণ চরিত্র দুর্মুখ। তিনি জমিদার। ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই। গরীবের অধিকার রক্ষার্থে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বদা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। রামীর প্রেমকে তিনি মর্যাদার দৃষ্টিতেই দেখেছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চণ্ডীদাসের যে বিদ্রোহ সেই বিদ্রোহে তিনি রামী-চণ্ডীদাসের সাথী হয়েছেন।

বস্তুতঃ পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর 'রামী চণ্ডীদাস' পালার মধ্য দিয়ে অন্ধবিশ্বাসী স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত কূপমণ্ডুক বর্ণভেদী সমাজের বিরুদ্ধে চণ্ডীদাসের বিদ্রোহ উপস্থাপিত করেছেন। চণ্ডীদাসের কাছে বর্ণভেদের কোনো স্থান নেই। তিনি বলেছেন —

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

—— এই উক্তি বর্ণভেদের বিরুদ্ধে চণ্ডীদাসের জেহাদ ঘোষণা। মানুষের মর্যাদা এবং স্থান তাঁর কাছে সর্বোচ্চে। পালাকার এই পালার মধ্য দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণভেদের ছবি তুলে ধরেছেন। আজও হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ নির্মূল হয় নি। তাই এই পালা এখনও প্রাসঙ্গিক।

আঁধারের মুসাফির (১৯৭২) — কিংবদন্তী আশ্রিত এই যাত্রাপালাটি অক্ষয় লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি এই পালা প্রথম প্রযোজনা করে।

এই পালার কাহিনী বীরভূমের হেতমপুরকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এই এলাকার আপামর জনসাধারণ তথা রাজারাম, তরলা, বাখর ঢালি, প্রাক্তন অশ্বপাল হাফেস প্রমুখ দেশপ্রেমিকগণ বর্গীর আক্রমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। লড়াইয়ে তারা বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করে শহীদ হয়েছে, তথাপি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করেন নি। এ পালায় ক্ষয়িষ্ণু বাদশাহি বংশের মেয়ে আমিনা এবং দরিদ্র ওসমানের প্রেম স্বীকৃতি লাভ করেছে। স্বনামধন্য যাত্রাভিনেতা অরুণ দাশগুপ্তের নির্দেশনায় এ পালাভিনয় দর্শকমনে বিশেষ স্থান লাভ করেছিল।

বিদ্রোহী নজরুল (১৯৭৪) — এই যাত্রাপালাখানি নির্মল সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়। নব অম্বিকা নট্ট কোম্পানী পালাটি সগৌরবে অভিনয় করে। রবীন্দ্রকানন যাত্রা উৎসবেও এই পালাটি সফলরূপে অভিনীত হয়েছিল। এ পালার বহু সমালোচিত মোহিতলাল মজুমদার চরিত্রটি নিয়ে বির্তকের ঝড় উঠেছিল। পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে কবি মোহিতলালকে বিকৃত করে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন এ পালায়। এই অভিযোগ করে দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন অধ্যাপক এবং সমালোচক ব্রজেন্দ্রকুমারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এই পালাকে কেন্দ্র করে আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। যাত্রার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বিরল। মামলা চলাকালীন অবশ্য পালাকারের মৃত্যু হয়। জানা যায়, মোহিতলাল মজুমদারের পুত্র শ্রী মনসিজ মজুমদার এই পালার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। পরে তিনি ভুল বুঝতে পেরে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং মামলা প্রত্যাহার করে নেন। যাই হোক, নজরুল এবং মোহিতলালকে নিয়ে রচিত পালানাটকটি সমালোচিত হলেও ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালা রচনার ধারায় বিশিষ্টতা লাভ করেছিল।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে বলা যায় যে, ব্রজেন্দ্রকুমার দে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালসীমায় শতাধিক যাত্রাপালা রচনা করেছেন। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পালাসমূহের আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তিনি পল্লীগাথা, রূপকথা ও জীবনীমূলক কাহিনী থেকে শুরু করে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে নানাপ্রকার যাত্রাপালা রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্যে বাংলা যাত্রাপালার ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র ভূমিকা চির অম্লান হয়ে থাকবে। ব্রজেন্দ্রকুমার সম্পর্কে এ কথাও বলা যায় যে, যাত্রাপালা রচয়িতা হিসাবে ব্রজেন্দ্রকুমার দে শুধুমাত্র অনন্য প্রতিভার অধিকারী নন, বাংলা

বাংলার যাত্রা ও ব্রজেন্দ্রকুমার দে

যাত্রাপালার ইতিহাসে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে নিজেই এক ইতিহাস।

বাংলা যাত্রার ইতিহাস পরিক্রমায় দেখা যায় যে, ব্রজেন্দ্রকুমার দে যেমন একাধারে যাত্রাপালা রচনা করেছেন, তেমন অগ্রণী হয়েছেন যাত্রাসম্পর্কিত নানাবিধ বির্তক মূলক আলোচনা ও সমালোচনায়। সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র সৃজনশীল প্রতিভায় বাংলা যাত্রার ইতিহাস হয়ে উঠেছে সমুজ্জ্বল।

সুত্র নির্দেশিকা ঃ

১। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, নীলাবসান।

২। তরুণ কুমার দে — জীবন ও যাত্রাগান, শুভলিপিকা, সংখ্যা-জুন ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-২১

৩। সত্যেন ভদ্র-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার — সাক্ষাৎকার গ্রহণে লেখক, শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, তাং - ২০.০২.৯৮

৪। তরুণ কুমার দে — জীবন ও যাত্রাগান, শুভলিপিকা, জুলাই ১৯৭৮ পৃষ্ঠা-১৮

৫। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, চাঁদের মেয়ে।

৬। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৭৬,পৃষ্ঠা-৪৩

৭। দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — নাট্যলোক, ১০ম বর্ষ, ৮ম-৯ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-১৪

৮। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — বাংলার যাত্রানাটক, সপ্তাহ ১৮ই মার্চ, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা-৩০

৯। দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — নাট্যলোক, ১০ম বর্ষ, সংখ্যাঃ ৮ম-৯ম, পৃষ্ঠা-১৬

১০। তরুণ কুমার দে — ভূমিকা, আকালের দেশ।

১১। তরুণ কুমার দে — সপ্তাহ, ২০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-২৪

১২। তরুণ কুমার দে — শুভলিপিকা, সংখ্যা-মার্চ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-২৩

১৩। সূর্য দত্ত-র সাক্ষাৎকার — তরুণ কুমার দে , অভিনয় পত্রিকা, পৃষ্ঠা-১৬১১

১৪। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র সাক্ষাৎকার, নিজস্ব প্রতিনিধি, নাট্যলোক, ১০ম বর্ষ, ৮-৯ম সংখ্যা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৯

১৫। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৪২, ৪৩

১৬। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — বাংলার যাত্রানাটক রচনার বিবর্তন, সপ্তাহ।

১৭। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র সাক্ষাৎকার — নিজস্ব প্রতিনিধি, নাট্যলোক, ১০ম বর্ষ, ৮-৯ম সংখ্যা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

১৮। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — বাংলার যাত্রানাটক, সপ্তাহ।

১৯। বিধায়ক ভট্টাচার্য — নাট্যলোক, ১০ম বর্ষ, ৮-৯ম সংখ্যা ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

২০। সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়-র সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণে লেখক, তাং-১১.০৪.১৯৯৬ বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

২১। শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্ত-র সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণে লেখক, তাং-১২.০২.১৯৯৮, সল্টলেক সিটি, বিধানগর, কলকাতা।

২২। স্বপন কুমার-র সাক্ষাৎকার, ১৪.০২.১৯৯৯, মেঘমল্লার, গড়িয়াহাট, কল-১৯

২৩। ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য — বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫৬-৪৫৭

২৪। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, গাঁয়ের মেয়ে।

২৫। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, ধর্মের বলি।

২৬। তরুণ কুমার দে — সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ব্রজেন্দ্র কুমার, সাপ্তাহিক পৌণ্ড্রদর্পণ, ১৩শ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা ৭ই এপ্রিল ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১

২৭। তরুণ কুমার দে — জীবন ও যাত্রাগান, শুভলিপিকা, সংখ্যা-অক্টোবর ১৯৮১, পৃষ্ঠা-২২

২৮। ভবতোষ চক্রবর্তী — আমার চোখে যাত্রা, নাট্যলোক, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৬

২৯। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, সোনাই দীঘি।

৩০। প্রবোধবন্ধু অধিকারী — আটশো বছর যাত্রারথে, স্যমীক, জানুয়ারী ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-১

৩১। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, সম্রাট জাহান্দার শাহ।

৩২। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য — বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃষ্ঠা-৪৭২

৩৩। তপন কুমার-র সাক্ষাৎকার — কমলকুমার মিত্র ও মলয় সাহা, আজকাল, ৫ই আগষ্ট ১৯৯৮

৩৪। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, যাদের দেখে না কেউ।

৩৫। ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য — লোকনাট্যের বিবর্তন, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলকাতা 'ক' কেন্দ্র থেকে প্রচারিত, তারিখ -০৪.০৩.১৯৯৮

৩৬। বিনোদিনী দাসী — ভূমিকা, আমার কথা।

৩৭। অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — স্বপন মজুমদার সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৯৮

৩৮। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — বাংলার যাত্রানাটক, সপ্তাহ, পৃষ্ঠা-৩০

৩৯। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, ভরত বিদায়/মহীয়সী কৈকেয়ী।

৪০। ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র সাক্ষাৎকার — প্রবোধবন্ধু অধিকারী,
আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৯৬৮

৪১। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৭৬,পৃষ্ঠা-৩৮

৪২। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৪২

৪৩। তরুণ কুমার দে — ভূমিকা, পরাজিত মেঘনাদ/মেঘনাদ বধ।

৪৪। তরুণ কুমার দে-র সাক্ষাৎকার — সাক্ষাৎকার গ্রহণে লেখক, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, তারিখ - ২১.০৭.১৯৯৭

৪৫। তরুণ কুমার দে — ভূমিকা, পরাজিত মেঘনাদ/মেঘনাদ বধ।

৪৬। তরুণ কুমার দে — জীবন ও যাত্রাগান, শুভলিপিকা, সংখ্যা-অক্টোবর ১৯৮১, পৃষ্ঠা-২১

৪৭। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, রাজর্ষি / দানবীর।

৪৮। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, রাজলক্ষ্মী।

৪৯। ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র সাক্ষাৎকার — নিজস্ব প্রতিনিধ, নাট্যলোক, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৮

৫০। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — ভূমিকা, প্রতিশোধ।

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — 'সাহিত্য', ঐতিহাসিক উপন্যাস শীর্ষক প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ।

৫২। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — একটি পরম প্রাপ্তি : যাত্রার একাল-সেকাল, পৃষ্ঠা : ৮৯-৯০

৫৩। ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য — বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃষ্ঠা-৪৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রজেন্দ্রকুমারের পালাভিনয়

বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পালাসমূহ বিভিন্ন যাত্রাদল কর্তৃক অভিনীত হয়েছে। শুধুমাত্র যাত্রাসাহিত্য হিসাবে নয়, পালাভিনয়ের দিক থেকেও ব্রজেন্দ্রকুমারের রচনাগুলি সার্থক। Performing art বা অভিনয় শিল্প হিসাবে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পালাগুলির সাফল্য বহু ব্যাপক। যাত্রা মূলতঃ Performing art বা অভিনয় শিল্প। নাট্য আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োগপ্রধান শিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন, যা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। নাটকের অভিনয়গত বিশিষ্টতা সম্বন্ধে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন —

> "নাট্যকার নাটক রচনা করেন, কিন্তু যতক্ষণ সেই নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত না হয় ততক্ষণ পূর্ণরূপ বিকশিত হয় না, তার যথার্থ মূল্যও নির্ধারিত হয় না, নাটকের এই মঞ্চে উপস্থাপনাকে বলা হয় প্রয়োগ। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকের প্রথম অঙ্কে বলা হয়েছেঃ 'প্রয়োগপ্রধান হি নাট্যশাস্ত্রম', অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্র প্রয়োগপ্রধান।" ১

নাটকের সাফল্য অভিনয় সাপেক্ষ — এ সম্বন্ধে অলোকপাত করতে গিয়ে প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন —

> "নাটক হল মিশ্র চারুকলা (Composite Arts)। নাট্যগ্রন্থ শুধুই পাঠ্য নয়, অভিনেয়ও বটে। এর অভিনয় সাফল্য নির্ভর করে নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক ও দর্শকের আন্তরিক সহযোগিতার উপর।... কাব্য বা উপন্যাসে কবি ও ঔপন্যাসিক স্বয়ং নিজ বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারেন। নাটকে প্রকাশ্যে নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ নেই। পাত্রপাত্রীদের মুখ দিয়েই সাধারণত তাঁকে বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়।.... নাটকের বিষয় অভিনেতৃগণের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপ্য।" ২

নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব অভিনয়ের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। অভিনয়ের দ্বারাই এর সাফল্য লাভ করতে হয়। নট-নটী, প্রযোজক, নাট্যকার ও দর্শকবৃন্দের সহযোগিতার আসে অভিনয় সাফল্য। নাটককে কেন Performing art বা 'প্রয়োগসাপেক্ষ শিল্প' বলা হয় সে সম্বন্ধে ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার যে কথা বলেছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য —

> "কবিতা, গল্প, উপন্যাস, মানুষের ইচ্ছামতো একাকী বা দু'চার জনে মিলে খুশিমতো পড়তে পারে, উপভোগ করতে পারে, কিন্তু নাটক উপভোগ করতে হয় নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে বসে— সম্মিলিত ভাবে। সেই জন্যে নাটকের শিল্পরীতি বেশ কিছু সর্তক, দৃঢ়বদ্ধ এবং কঠোর, কিংবা যদি একটু শিথিলও হয়, তবু নিয়মতান্ত্রিক। সাধারণভাবে নাটক যে নিয়মানুগ —অভিনয়ের অপেক্ষা রাখে তা মানতেই হয়। নাটককে এ কারণেই বলা হয় 'পারফমিং আর্ট' বা প্রয়োগসাপেক্ষ শিল্প।" ৩

নাটক পাঠে নাট্যরস সম্পূর্ণ আস্বাদন করা যায় না, রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার হলে অভিনয় দর্শনের মধ্য দিয়ে নাটকের রসাস্বাদন সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রূপক - সাংকেতিক নাটককে আরও সার্থক ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য নাটকগুলির অভিনয় উপযোগী রূপদান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলি অভিনয়রূপে দেখতে পেলে বিশেষ খুশি হতেন।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, বিশেষজ্ঞগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকের মঞ্চাভিনয়ের আলোচনায় মগ্ন থেকেছেন। এক্ষণে আমরা বলতে পারি, নাটকের ন্যায় যাত্রাও মূলত অভিনয়ের জন্য রচিত হয়। যাত্রাপালার সাফল্যও অভিনয়ের উপর নির্ভরশীল। অভিনয় সাফল্য যাত্রার সাফল্য, অভিনয় সাফল্য যাত্রাকারের সাফল্য। যাত্রাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ও নাট্যাভিনয়ের রীতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। যাত্রাভিনয়ের স্থান ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে নাট্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন —

"দর্শক বেষ্টিত মধ্যবর্তী গোলাকার স্থানকে আসর বলা হয়। আসর মাটিতে স্থাপিত হয়। .... আসর হয় গোলাকার। চারিদিকে দর্শকরা বেষ্টন করে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই অভিনয়স্থল গোলাকৃতি ধারণ করে। গোলাকৃতি অভিনয়স্থলের সুবিধা এই যে, প্রত্যেক জায়গা থেকে দর্শকদের অভিনয় দেখার সমান সুযোগ ও সুবিধা থাকে। আসরের চারদিক ঘিরেই দর্শকমণ্ডলী থাকত বলে গায়কগায়িকা ও অভিনেতারা সকলেই ঘুরে ঘুরে অভিনয় করত। একই কথা কিংবা গানের একই পংক্তি তারা পুনরাবৃত্তি করত। সাজঘর থেকে বেরোবার পরেই অভিনেতা বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে আসরের কাউকে সম্বোধন করে চিৎকার , সম্বোধন, আস্ফালন করে অভিনয় শুরু করে দিত। আসরের চারদিক ঘিরে বসে থাকত অধিকারী, সহায়ক, বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ। কোনো কোনো সময় দু'একজন অভিনেতা ও তাদের মধ্যে মিশে থাকত, তার সময় এলেই হঠাৎ উঠে অভিনয় শুরু করে দিত।" ৪

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ যাত্রাভিনয়ের স্থান এবং যাত্রাভিনয়ের রীতি সম্বন্ধে উপরোক্ত অনুচ্ছেদে যে কথা বলেছেন, তা বেশ পূর্বকালের যাত্রাভিনয়ের স্থান ও রীতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এখন যাত্রাভিনয়ের পূর্বের রীতির অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের যাত্রাভিনয় মঞ্চাভিনয়ের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। মঞ্চাভিনয়ের অনেক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে যাত্রা তার পূর্বের অভিনয়রীতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ইদানীংকালে যাত্রা আর আসরে অভিনীত হয় না। মাটি থেকে কয়েকফুট উঁচু Stage বা মঞ্চ তৈরী করে সেখানে যাত্রাভিনয় হয়। তাকেই এখন আসর বলা হয়। এই ভাবে তৈরী সাময়িক মঞ্চের চারিদিকে দর্শকেরা ঘিরে বসে থাকেন না। দর্শকেরা বসেন মঞ্চের তিনদিকে। বাকি একদিকে থাকে গ্রীনরুম বা সাজঘর। সেখান থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীগণ মঞ্চে আসেন আগমনের পথ দিয়ে, অভিনয় শেষে মঞ্চ থেকে নির্গমনের পথ দিয়ে গ্রীনরুমে ফিরে আসেন। এখনকার মতো আগে বিদ্যুতের আলো ছিল না, ছিল না মাইক। হ্যাজাকের আলোয় অভিনেতারা উচ্চ গলায় অভিনয় করতেন। যুগের পরিবর্তনের সাথে আজকের যাত্রার আঙ্গিক এবং বিষয় বস্তু — দুয়েরই পরিবর্তন হয়েছে। আজকের যাত্রা তার

লোকনাট্যগত রীতি এবং বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে থিয়েটারের রীতি ও কৌশল অবলম্বন করে বেঁচে থাকার ভ্রান্ত চেষ্টা করছে। এতে যাত্রা তার জাত খোয়াচ্ছে এবং জীবনীশক্তি হারাচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। নিজস্ব অভিনয় রীতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত যাত্রার পশ্চাদগতি লক্ষ্য করে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ যাত্রাভিনয়ের রীতি নির্দেশ করেছেন —

> "যাত্রাভিনয় মঞ্চাভিনয় ও চিত্রাভিনয়ের রীতি আলাদা আলাদা। যাত্রাভিনয়ের গলা গম্ভীর, জোরালো ও সুউচ্চ হওয়া দরকার। গলা চেপে মাইকনির্ভর অভিনয় মোটেই করা উচিত নয়। ভঙ্গি ও পদক্ষেপের গুরুত্ব যাত্রায় অনেক বেশি। কন্ঠসঞ্চালনের বৈচিত্র্য ও উচ্চাবচ রূপ বজায় রাখা দরকার। রূপসজ্জা মোটা দাগের হওয়া উচিত।"৫

বিশেষজ্ঞগণের সাবধান বাণী এবং যাত্রার উপস্থাপন রীতি সম্বন্ধে নির্দেশ সত্ত্বেও থিয়েটারের প্রভাবে এবং থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজকের যাত্রাভিনয়ে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে চলেছে। মঞ্চাভিনয়ের অক্ষম অনুকরণ করে এখনকার যাত্রা তার নিজস্ব শিল্পরূপের গৌরব ও কৌলিন্য হারাতে বসেছে। একালের যাত্রায় নানাপ্রকার যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে যাত্রার বৈশিষ্ট্যচুতি ঘটেছে।

যাত্রা সম্পর্কে এত কথা বলা সত্ত্বেও একথা বলা যায়, যাত্রা সম্বন্ধে যে গেল গেল রব শোনা যায় তা সম্ভবতঃ সবাংশে ঠিক নয়। যাত্রানাটকের গঠনগত এবং যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে কৌশলগত ও উপস্থাপনগত রূপান্তর কিছুটা সূচিত হলেও যাত্রা তার নিজস্ব অভিনয়গত ঢঙ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজায় রেখেই তার দুর্বার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলার যাত্রাভিনয়ের প্রচলিত প্রথানুসারে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালাগুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যাত্রাদল কর্তৃক অভিনীত হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালাগুলি বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অভিনয় করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর পালাসমূহের অভিনয়ের একটি তালিকা নিম্নরূপে প্রণয়ন করা যায় ঃ

যাত্রাপালার নাম	রূপদানকারী যাত্রাদলের নাম
স্বর্ণলঙ্কা	বাণী নাট্য সমাজ
বজ্রনাভ	গণেশ অপেরা পার্টি
প্রবীরার্জুন	গণেশ অপেরা পার্টি
লীলাবসান	গণেশ অপেরা পার্টি
বঙ্গবীর	গণেশ অপেরা পার্টি
চাঁদের মেয়ে	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
মানিকমালা	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
রক্ততিলক	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
রাজনন্দিনী	রঞ্জন অপেরা

যাত্রাপালার নাম	রূপদানকারী যাত্রাদলের নাম
দেবতার গ্রাস	নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টি
আকালের দেশ	নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টি
সমাজের বলি	নট্ট কোম্পানী যাত্রা পার্টি
মায়ের ডাক (নাটক নয়)	নট্ট কোম্পানীর যাত্রা পার্টি ও প্রভাস অপেরা
পরশমণি	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
শেষ নমাজ (বাঙালী)	আর্য অপেরা
ধরার দেবতা	নিউ গণেশ অপেরা
ভারততীর্থ	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
প্রতিশোধ	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
স্বামীর ঘর	প্রভাস অপেরা
শেষ আরতি	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
কোহিনূর	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
ধর্মের বলি	আর্য অপেরা
ধর্মের হাট	রঞ্জন অপেরা প্রভাস অপেরা
সত্যাশ্রয়ী	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
রাহুগ্রাস	নিউ গণেশ অপেরা
ভক্তের ডাক	নিউ গণেশ অপেরা
ভাগ্যের বলি	নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
সোরাব - রুস্তম	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
রাজা দেবিদাস	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
সোনাই দীঘি	সত্যম্বর অপেরা
বালির বাঁধ	নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
বর্গী এলো দেশে	নবরঞ্জন অপেরা
দোষী কে? (নিষিদ্ধ ফল)	ধৃতশ্রী নাট্য শিল্পম্ ও জনতা অপেরা
জীবনযজ্ঞ (রামরাজ্য)	জনতা অপেরা
সতীর ঘাট	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
কবি চন্দ্রাবতী	নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
মহুয়া	সত্যম্বর অপেরা

যাত্রাপালার নাম	রূপদানকারী যাত্রাদলের নাম
যাদের দেখে না কেউ	নবরঞ্জন অপেরা
বীর অভিমন্যু	নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
প্লাবন	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
শয়তানের চর	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
উপেক্ষিতা	নাট্যভারতী
নাস্তিক	নবরঞ্জন অপেরা ও জনতা অপেরা
পতিতের ভগবান	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
চিতোর লক্ষ্মী	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
ধূলার স্বর্গ	সত্যম্বর অপেরা
উদয়ের মা	নবরঞ্জন অপেরা ও জনতা অপেরা
দুর্গাদাস	নবরঞ্জন অপেরা
সোনার ভারত	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
হে অতীত কথা কও	নাট্যভারতী
রাখীভাই	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
চাঁদবিবি	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
রক্তের নেশা	তরুণ অপেরা
বিল্বমঙ্গল	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
ঝাঁসির রানী	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
অশোক বলয় (কলিঙ্গবিজয়)	ধৃতশ্রী নাট্য শিল্পম্ ও তরুণ অপেরা
নেকড়ের থাবা	নবরঞ্জন অপেরা
ময়ূর সিংহাসন	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
ভরত বিদায় / মহীয়সী কৈকেয়ী	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
মেঘে ঢাকা রবি	তরুণ অপেরা
অকূল গাঁঙের মাঝি	ভারতী অপেরা
সুলতানা রিজিয়া	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
মূর্খের পাঁচালী	নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
মাটির কান্না	জনতা অপেরা
দুধ সায়রের দেশে	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
লৌহ প্রাচীর	ভারতী অপেরা
ঝড়ের দোলা	নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা

যাত্রাপালার নাম	রূপদানকারী যাত্রাদলের নাম
সম্রাট কাইকোবাদ	শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানী
পাপের ফসল	ভারতী অপেরা
করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
রামী চণ্ডীদাস	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
পতি ঘাতিনী সতী	বৈকুণ্ঠ যাত্রাসমাজ
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
কালাপাহাড়	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন	ভারতী অপেরা
শের-ই তুঘলক	সাঁঝের আসর যাত্রাপার্টি
সম্রাট দুর্যোধন	অনভিনীত
লৌহমানব /বাংলার বাঘ	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
মগের মুল্লুক	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
আবুল হাসান	ভারতী অপেরা
কাঁটার বাসর	লোকরঞ্জন অপেরা
জনতার মুকুট	অম্বিকা নাট্য কোম্পানী ও শ্রীরাধা নাট্য কোং
রাজদ্রোহী	জনতা অপেরা
নবাব হোসেন শাহ	জনতা অপেরা ও ভোলানাথ অপেরা
কৃষ্ণ-শকুনি	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
মুজিবের ডাক	নিউ শীতলা নাট্য কোম্পানী
কলঙ্কিনী রাই	নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
সতী করুণাময়ী	নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানী
আঁধারের মুসাফির	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
বাগদান / তাসের ঘর/ গৃহলক্ষ্মী	শ্রীমা অপেরা ও নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা
নটী বিনোদিনী	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
কৃষ্ণ-সুদামা	ভারতী অপেরা ও কলিকাতা যাত্রা সমাজ
পাহাড়ের চোখে জল	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
নদে ভেসে যায়	অপ্রকাশিত, অনভিনীত
বিদ্রোহী নজরুল	নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানী

ব্রজেন্দ্রকুমারের পালাভিনয়

যাত্রাপালার নাম	রূপদানকারী যাত্রাদলের নাম
ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	ভারতী অপেরা
ভারতপথিক রামমোহন	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
নন্দকুমারের ফাঁসী	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
সম্রাট জাহান্দার শাহ/কাঁটার মুকুট	নট্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি
	চৌরঙ্গী অপেরা, শিল্পীমহল
সীতার বনবাস	মোহন অপেরা
কাজীর বিচার	ভারতী অপেরা
অনাথ জননী	অনভিনীত
পরাজিত মেঘনাদ/মেঘনাদ বধ	মোহন অপেরা

ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত যাত্রাপালাভিনয়ের ইতিহাস পরিক্রমায় এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র যাত্রাপালাগুলির আবেদন ছিল সর্বব্যাপী। গ্রাম শহর, নির্বিশেষে সর্বপ্রকার জনমণ্ডলীর কাছেই ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রানাটকের ছিল বিপুল আবেদন। পালাভিনয়ের স্থান এবং সেই সূত্রে পালাভিনেতাদের বা পরিচালক অধিকারীবৃন্দের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানা যায় যে, পালাসম্রাটের যাত্রাপালার আবেদন ছিল সুদূরপ্রসারী। শুধু বাংলার শহর বা গ্রামাঞ্চলে নয়, — কয়লাখনি, কলকারখানা অধ্যুষিত স্থানে এবং চা বাগিচাসহ বাংলার বাইরেও ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালা বিশেষ সাড়া জাগাত। বহির্বঙ্গে বিশেষতঃ উড়িষ্যা, আসাম, বিহার, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালাসমূহ বাঙালী অবাঙালী সর্বপ্রকার দর্শকদের কাছে ছিল পরম আদরণীয় বিষয়। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালার বৃহৎ ব্যাপকতার তথ্য এই সূত্রে বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়। বলা যায়, বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে যেমন ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পালাগুলি রচিত হয়েছে, তেমন তা বিভিন্ন দল কর্তৃক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি ব্যাপক অঞ্চলে পরিবেশিত হয়েছে। বাংলার সমস্ত বিখ্যাত যাত্রাদল যেমন ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালাসমূহ পরিবেশন করেছেন, তেমন ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পালাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন — পূর্ণেন্দু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত পাঠক, ফণী গাঙ্গুলী, ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্না চক্রবর্তী, ননী ভট্ট, পঞ্চু সেন, ভোলা পাল, শিব ভট্টাচার্য, রাজকুমার, যাত্রাসূর্য অসীমকুমার, রাখাল সিংহ, নির্মল অধিকারী, মধু ব্যানার্জী, দেবগোপাল ব্যানার্জী, শেখর গাঙ্গুলী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণীবাবু), নট্টসম্রাট স্বপনকুমার, ফণী মতিলাল (ছোট ফণীবাবু), পঞ্চু সেন, পান্না চক্রবর্তী, অরুণ দাশগুপ্ত, অভয় হালদার, অবনী বাগ, বিমল লাহিড়ী, ক্ষিতীশ রায় , অজিত সাহা, জ্যোৎস্না দত্ত, বাবলী রানী, রাখাল রানী, টগর রানী, চপল রানী, ফণী রানী, শতদল রানী, সন্তোষ রানী, ছবি রানী, যতীন রানী, ইন্দিরা দে, জ্যোৎস্না দেবনাথ, শ্যামলী মজুমদার, শর্মিলা পাল, সাহানা বসু, চিত্রা মল্লিক, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, ফিরোজবালা, ছবি

রায়, স্বপ্নাকুমারী, মিতা চ্যাটার্জী, তারারানী পাল, বর্ণালী ব্যানার্জী, বীণা দাশগুপ্তা প্রমুখ বাংলার প্রখ্যাত যাত্রাপালাভিনেতা অভিনেত্রীবৃন্দ। এ ছাড়াও বাংলার বহু পেশাদার অপেশাদার যাত্রাপালাদলের অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ আছেন, যারা ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র রচিত যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালার অভিনয় যেমন যাত্রার আসরের বাইরে বেতারে ও দূরদর্শনে পরিবেশিত ও প্রদর্শিত হয়েছে, তেমন পালাসম্রাটের পালা লং প্লে রেকর্ডের মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সাম্প্রতিক কালে ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র যাত্রা পালা যেমন পেশাদারী - অপেশাদারী দল কর্তৃক অভিনীত হতে দেখা যায়, তেমন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অপেশাদারী অভিনয় স্তর থেকে (১৯২৫) পেশাদার যাত্রাদলের অভিনয় উপস্থাপনার (১৯৩১) মাধ্যমে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালাগুলি যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য ইতিহাস।

সুত্র নির্দেশিকা ঃ

১। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ — নাটকের কথা, সাহিত্যলোক ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৫৮

২। ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় — নাট্যতত্ত্ব বিচার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯১, বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ঃ ১-২

৩। ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার — সাহিত্যের রূপ-রীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১০৪

৪। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ — নাটকের কথা, সাহিত্যলোক ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২২০

৫। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ — যাত্রা ঃ সেকাল ও একাল, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৫-১৭৬

সপ্তম অধ্যায়

ব্রজেন্দ্রকুমারের পালায় সংগীতের ব্যবহার

যাত্রাপালাভিনয়ে সংগীত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। যাত্রাপালায় গানের ব্যবহার বহু ব্যাপ্ত। বর্তমানকালে যাত্রাপালাভিনয় হিসাবে উক্ত হলেও লোকসমাজে তা 'যাত্রাগান' হিসাবেই কথিত হয়। তাই ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালাসমূহের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর যাত্রাপালায় গানের ব্যবহারের দিকটিও বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই দিক থেকে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পালাসমূহে সংগীত ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

যাত্রায় গানের ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য যাত্রায় গানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন —

> " . . . নৃত্য - গীত - বাদ্যই যাত্রার প্রধান উপাদান — বিশেষত গীতই যাত্রার প্রধান মাধ্যম। . . . বিস্তৃত আসরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উপস্থিত শ্রোতৃ-মানসে ভাবাবেগ উদ্রেক করিবার জন্যই যাত্রানাটকে সংগীত সংলাপের অপরিহার্য পরিপূরক। আসরে অভিনেয় নাটকে সংগীত যোজনা কেবল প্রাচীন প্রথার মাত্র অনুবর্তন নয়, রস সঞ্চারের অপরিহার্য উপকরণ বা উপায়।" ১

যাত্রায় সংগীত সন্নিবেশের কারণ সম্বন্ধে যাত্রানাটক বিশেষজ্ঞ ডঃ অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য —

> "যাত্রার মধ্যে অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি , চলাফেরা ইত্যাদির মধ্যে দৃশ্যান্তের আকর্ষণ আছে বটে, কিন্তু সঙ্গীতই সেখানে প্রধান। .... যাত্রার গান তো অসীম ভাব রাজ্যে আকুল শ্রোতাকে ভাসিয়ে নিতে পারে। .... খোলা জায়গায় বহুলোকের মধ্যে অভিনেতাদের কথা সর্বত্র শ্রাব্য হয় না। সেজন্য কথার পরিবর্তে গান ব্যবহার করতে হয়। গানের সব কথা সর্বত্র শোনা না গেলেও ক্ষতি ছিল না,সুরই শ্রোতাদের মন অভিভূত করে ফেলত।" ২

সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, যাত্রায় সংগীত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নাট্য বিশেষজ্ঞ ডঃ অজিত কুমার ঘোষের আলোচনার সূত্রে বিশেষভাবে বলা যায় যে, স্থান কাল, ভাব-অনুভূতি ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে যাত্রাপালাভিনয়ে গান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এবং "শ্রোতাদের মন অভিভূত করে" (সৌজন্য - ডঃ অজিত কুমার ঘোষ) বিশেষতঃ "লোকাভিনয়ের প্রযোজনা-পরিবেশনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্যগত ধারায়" (সৌজন্য -অধ্যাপক ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী) । যাত্রা তথা লোকনাট্যের ঐতিহ্যে সংগীত ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পূর্বাপর বিশেষ প্রথা হিসাবেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

সংলাপ সংযোজনার ন্যায়, সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রেও ব্রজেন্দ্রকুমার দে যাত্রায় নূতনত্ব এনেছেন। অপ্রয়োজনীয় গান বাদ দিয়ে প্রয়োজনে তিনি সংলাপকে লিরিক্যাল করেছেন। গানের বাণী তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতবহ করে সংগীতকে সংলাপের পরিপূরক করেছেন। ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর

যাত্রাপালায় বিবেকের গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। বিবেককে তিনি পালায় চরিত্ররূপে প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রচিত 'সমাজের বলি' পালার পরাশরকে বিবেক চরিত্র হিসাবে দেখা যায়। পরাশর এই পালায় শুধু সংগীত পরিবেশন করে নি বা সংলাপই বলে নি, — সে পালার নাট্যক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছে। ময়মনসিংহ গীতিকার 'ধোপার পাট' আখ্যায়িকা থেকে সংগৃহীত এই পালায় ধোপার মেয়ে কাঞ্চনের সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজকুমার রূপকুমার প্রেমে আবদ্ধ হলে ক্রোধান্বিত রাজা কাঞ্চনকে পদাঘাত করেছেন, তখন পরাশর প্রতিবাদী ধ্বনিতে গেয়ে উঠেছে—

ওরে ভদ্রলোকের দল।
ওর পিঠে হায় কত তোদের
লাথি জমল বল?
হিসাব দেবার দিন এসেছে
চলবে না তার পশুবল। (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

পরাশরের এই গানের মধ্য দিয়ে উচ্চ সমাজের মানুষের প্রতি তার ধিক্কার ও প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। হাজার বক্তৃতা বা সংলাপের চেয়ে পরাশরের উপরোক্ত সঙ্গীত অনেক বেশি তেজস্বী।

প্রথমাঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে রূপকুমারের বিবাহের প্রস্তাবে কাঞ্চন যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন তাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য পরাশর এই গানটি গেয়েছে —

তবে চলে যা উজান টানে
. . . . কণ্টকহার পরলি বলে জগৎ যদি পায়ে দলে,
ছিঁড়িস নে তুই কণ্ঠমালা, তুলো দিয়ে রাখিস কানে। (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)

বিবাহকালে কাঞ্চন এবং রূপকুমার তাদের বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করবে বলে পরাশরকে বললে পরাশর বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানায় — " মন্ত্রের প্রয়োজন নেই। . . . . জাত মানুষের গড়া, . . . সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" পরাশরের এই বাণীময় সংলাপের ভেতর দিয়ে এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় 'শ্রেণীভেদ দূরীকরণ, এবং বর্ণভেদ মোচন দর্শকসমক্ষে প্রতিভাত হয়। অসবর্ণ বিবাহে পৌরহিত্য করার জন্য রাজা পরাশরকে বন্দী করেন কিন্তু সুযোগ পেয়ে পরাশর পালিয়ে এসে কাঞ্চনকে শ্লীলতাহানি থেকে বাঁচায়। প্রত্যাগমনকালে সে কাঞ্চনকে সতর্ক করে বলে —

সমাজ বুড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে,
পেলেই ওরে সোনার ডোরে রাখবে ফাঁদে পুরে. ." (৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' — মানবজয়প্রদ এই বাণী প্রচার করার জন্য এবং রাজার বিরুদ্ধে জনজাগরণ আহ্বানের জন্য পুনর্বার পরাশরকে বন্দী করা হয়। বন্দীকালে আক্ষেপের সুরে সে গায়। —

"চোখের জলে পাষাণ গলে, দেবতা তবু টলে না।
কলিকালে বধির বিধি সাধনায় ফল ফলে না।।

কেবলমাত্র ব্যক্তিনামেই নয়, ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রা পালায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাষী, মাঝি প্রভৃতিরাও বিবেকরূপে এসেছে। 'সমাজের বলি' পালাতেই দরিদ্র ধনাই মাঝি রাজপুত রূপকুমার ও কাঞ্চনকে পলায়নে সহায়তা করে খোয়াই নদী পার করে দেয়। সত্যবদ্ধ মাঝি কিন্তু রাজাকে তাদের সন্ধান বলে দেয় না। ফলে তাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। অন্তিমকালে সে গায় —

বিদায় আমার পানসী রে,
শেষ হোল মোর বাওয়া
মিটলো আজি এই দুনিয়ায়
আমার দাবি - দাওয়া।" (৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

ধনাই মাঝির এই গানের মধ্য দিয়ে কর্মসাধনে তাঁর আত্মতৃপ্তি ফুটে উঠেছে। কাঞ্চনের পালিয়ে যাওয়ার পর তার নিঃসঙ্গ পিতা গদাধরের কন্যাবিচ্ছেদের বিরহ বেদনা পল্লীগীতির সুরে চাষীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে —

ওরে গহীন গাঙের নাইয়া।
কোন্ দ্যাশে তুই আইলি দিয়া
আমার দুধের মাইয়া। (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

কেবলমাত্র বিবেকই যে ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালায় সংগীত পরিবেশন করেছে তাই নয়, পালার অনেক নাট্যচরিত্রও গান গেয়েছে। "সোনাই দীঘি" পালার চরিত্র নিশাচর। লম্পট অত্যাচারী দেওয়ান ভাবনা কাজীর অত্যাচারে সে এবং তার বোন অত্যাচারিত। ভাবনা কাজী তার বোনকে অপহরণ করেছিল। তারপর থেকে সে তার নিখোঁজ বোনকে খুঁজে বেড়ায়। আত্মহননে অগ্রসর মাধবকে সে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত করে এবং অত্যাচারিত মানুষকে জাগ্রত ও সুসংঘবদ্ধ করার জন্য গেয়ে ওঠে —

আয় দেখি সব কোমর বেঁধে
এক সাথে দিই হাঁক,
দেখি কেমন অত্যাচারের হয় না
মাথা ফাঁক। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

অন্যায়ভাবে ভাবনা কাজী মাধবের পিতা প্রতাপরুদ্রকে বন্দী করতে গেলে অত্যাচারী ভাবনা কাজীকে সর্বদ্রষ্টা খোদা ভগবানের বিচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সে এবং যথার্থই বিবেকের ন্যায় সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গায় —

ওরে খোদা ভগবান,
ঘুমিয়ে নেই রাখছে হিসাব,
সামাল কীর্তিমান। (২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

বাঙালী নাটকের ফকির কেবলমাত্র বিবেকই নয়, সে একজন মানবতাবাদী দার্শনিক, যার কাছে হিন্দু-মুসলমানে কোনো প্রভেদ নেই। নবাব দায়ুদ খাঁ-র আপন কন্যা আশমান নবাবের জাতি-বিভেদহীন নীতিতে রুষ্ট হয়ে রাজ্যের ধ্বংস কামনা করলে ফকির একই ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষের বিভিন্ন রূপের কথা গানের মাধ্যমে আশমানকে জানায় —

মিছে কেন ভেদাভেদ, হিন্দু-মুসলমান।
একই মালিক খোদা আর ভগবান।
একই মাটি দিয়ে গড়া দু'জনেরই দেহঘর।
একই মাটিতে লয় দু'জনে মরার পর।
দু'জনেরই দেহতলে,
একই লাল খুন চলে,
ভাই ভাই তোরা দুই বাঙলার সন্তান
হিন্দু-মুসলমান। (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

ধর্মীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নাসির খাঁ জুতো পায়ে হিন্দু পণ্ডিত গণপতি ঠাকুরের মন্দিরে বলপূর্বক প্রবেশ করতে চাইলে ফকির নাসির খাঁ-র সুপ্ত বিবেক জাগ্রত করতে গেয়ে উঠেছে—

শুধুই মুষল, শুধুই মানে,
গড়ে না ভাই মুসলমানে,
মানের গোড়ায় ছাই দে আগে, ভরবে মানে বিশ্বধাম।
(১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

লক্ষ্যভ্রষ্ট সত্যপীরকে সে সঠিক পথের সন্ধ্যান দিতে গায়—

পাগল ছেলে আয়, ডুব দিয়ে যা
বাঙলা মায়ের রূপের দরিয়ায়। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

আলোকপ্রাপ্ত সত্যপীর এরপর নিজেকে দেশের সেবায় নিয়োজিত করে।

'আকালের দেশ' পালার চারণও বাস্তব মানুষ। অন্নাভাবে চাষীরা যখন মৃত্যুমুখী, তখনও ধনীর খাদ্যভাণ্ডারে পর্যাপ্ত পরিমাণ খ্যাদশস্য মজুত রয়েছে। প্রজাদের প্রতি রাজার এই বিমুখীহিনতা ও অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য না করে রাজশক্তির উপর আঘাত হানার জন্য চারণ সংগীতের মাধ্যমে নিপীড়িত জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে—

অনেকদিন ত ঘুমিয়েছিলি,
ঘুমিয়ে সবই ডালি দিলি,
এবার সবাই আঁখি মেলে
আঘাত দে না উষার দোরে। (১ম পর্ব, ২য় দৃশ্য)

রাজশক্তি রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত চাষীদের গৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়। গৃহহারা চাষীরা নিজেদের সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। তখন চারণ চাষীদের আত্মজাগরণের জন্য গায়—

জাগলি যদি ঘুমুস নে আর
সর্বহারার দল।
যা গেছে তোর লাভে - মূলে
আনতে যে চাই বুকের বল।
বাঁচার মত বাঁচতে হবে,
মরে বাঁচায় লাভ কি ভাই?
পরের দয়ায় বাঁচার চেয়ে
হয়ে যা না ভস্ম ছাই। (১ম পর্ব, ৪র্থ দৃশ্য)

আত্মশক্তিতে বলীয়ান চাষীরা এরপর সংঘবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ফলে রাজশক্তির পতন যে অনিবার্য এবং সন্নিকটস্থ চারণের কণ্ঠে ধ্বনিত গানের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে — "সেদিন তো দূরে নয় / আগমনী তার কাছে শোনা যায়,/নাহি ভয়, নাহি ভয়।" (২য় পর্ব, ৫ম দৃশ্য) কৃষকবিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত এই নাটকের গানগুলি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে যাত্রামোদী সংগীতপ্রেমী মানুষের মুখে মুখে ফিরত।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর যাত্রাপালায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে এখানে বালকের কণ্ঠে সংগীত প্রদান করেছেন। তাঁর রচিত 'রাজা দেবিদাস' পালায় দেখা যায়, একদা সিংহল বিজয়ী বাঙালী জাতি গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তারা যুদ্ধবিদ্যায়, অসিচালনায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, পারদর্শিতা প্রদর্শন করে এসেছে, কিন্তু তারা আজ আত্মবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের জাতি গৌরব বিস্মৃত হতে বসেছে। সেই দুর্বলতার সুযোগে ভিন্ন প্রদেশীয় রাজা সোলেমান কররানী বাংলা বিজয়ে তৎপর হয়েছে। রাজা দেবিদাস ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ তথা আগ্রাসনবাদ নির্মূলীকরণের মূর্ত প্রতীক। কালিদাস পিতার সুযোগ্য সন্তান। সে এ পালার একানে বালক। তার প্রতিবাদের ভাষা গীতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আত্মবিস্মৃত বাঙালীজাতিকে পুনর্জাগরণের আহ্বান জানিয়েছে সে এই গান গেয়ে —

জাগো রে বাঙালী ভাই।
কতদিন রবে আর ঘুমঘোরে অচেতন ঘরদোর
পুড়ে হল ছাই।
তোমাদেরি আঙিনায়, দুস্মন দেয় হাঁক,
মা-বোনের শাড়ি টানে, গর্বে করিছে জাঁক,
শিহরি জাগিছে শব,
তোরা কি পাথর সব?
একসুরে হুংকারি বাহু তোল, ভয় নাই।
যমও ডরাবে যদি তোরা হস এক ঠাঁই।

রাজা শিখিধ্বজ বিদেশী নবাবকে প্রতিরোধ না করে তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। সেই দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে রাজা দেবিদাসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে বিদেশী নবাবের আগ্রাসনের

বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এ পালার বিবেক বাউল লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজা শিখিধ্বজকে শোনায় এই তেজোদৃপ্ত সংগীত —

চোখ মেলে চা ও বাঙালী, সামনে গভীর খাদ।
এগুসনে আর লোভের ডাকে ঘটবে পরমাদ।
কোথাকার কে বাদশা নবাব?
কোন্ গুণে চায় তাদের জবাব,
চারশো লক্ষ আছিস তোরা কসে কোমর বাঁধ।
হাঁক দিয়ে বল্, বাংলাদেশের
প্রতিকণা বাঙালীদের,
মাটির তরে জান কবুল, বাঙলামায়ী জিন্দাবাদ। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

বিচ্ছিন্নতাবাদের কারণে বাঙালীরা বাঙলার মাটিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র একতার অভাবে অন্য প্রদেশী শক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় বাঙালীরা এঁটে উঠতে পারছে না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের কারণে বাঙালীরা দুর্বল হয়ে গেছে। রাজা দেবিদাসের সেনাপতি ইসলাম খাঁর স্ত্রী সোফিয়া সেই ব্যক্তিস্বার্থ ও চরিত্রগত দুর্বলতার জন্যই হিন্দু রাজাদের দ্বারা অপহৃত হয়ে যায়। বেদনাহত পালাকারই বাউলের জবানীতে গেয়ে ওঠেন —

পশুপাখী উঠল জেগে, দেশের মানুষ জাগল না,
মরণ এসে দিচ্ছে কামড়, ঘুম ত তবু ভাঙল না।
মেয়ের শাড়ি নিচ্ছে কাড়ি,
ধর্ম গেল, শরম গেল ইমান কিছু রাখল না।
কোথায় মানুষ কোথায় মানুষ?
বাঙালী কি ফাঁপা - মানুষ?
এত চাবুক বিঁধল গায়ে মরমে কি লাগল না। (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

এ পালায় উগ্র প্রাদেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। বাউলের কণ্ঠে তারই স্পষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছে। তরবারি দ্বারা নয়, প্রেম দিয়ে বাঙালীর হৃদয় জয় করতে সোলেমানকে পরামর্শ দিয়েছে বাউল —

ও বিজয়ী বীর।
তুমি জয় করেছ শুধুই মাটি
প্রাণে গেলে না বাঙালীর।
কত রতন লুকিয়ে আছে বাঙালীর এই মনের মাঝে
আঘাতে তার যায় না পাওয়া, ঢেলে দে প্রেমাশ্রুনীর। (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

এই পালার মধ্য দিয়ে পালাকার সমস্ত প্রাদেশিকতার দেওয়াল ভেঙে ফেলে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। বাউল সোলেমানের বিবেকবোধ জাগ্রত করতে প্রয়াসী হলেও সোলেমান দেবিদাস রায়ের ছাতক আক্রমন করে। বাঙালী তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা মিলে সেই আক্রমন প্রতিহত করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সোফিয়ার নেতৃত্বে নারীবাহিনীর

আক্রমন ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের নেতৃত্বে ঝাঁসী বাহিনীর আক্রমনের প্রতিরূপ। বিদেশী মুসলমান নবাবের আক্রমনের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নারী সমাজকে জাগ্রত করার জন্য এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে অগ্রণী হবার জন্য বাউলের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে নিম্নের গানে —

বাংলার জননীরা ওঠ জেগে ওঠ
পুরুষের পাশে পাশে ছোট্ তবে ছোট্।
দোরে এল শত্রু, দূর কর শঙ্কা,
পুরুষেরা আসেনিকো, তোরা বাজা ডঙ্কা । (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

এপালার জাগরণের গানগুলি একদা বাংলার হাটে - মাঠে - ঘাটে চাষী মজুর শ্রমিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালায় সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বিশেষত্ব হল, সংগীতের মধ্যবর্তী স্থানে গায়কের সংলাপ সংযোজন, যা সার্থক এবং অভিনব। গানের কিছুটা অংশ গাওয়ার পরে গায়ক খানিকটা সংলাপ বলে, তারপর পূর্ব গীতাংশটি সম্পূর্ণ করে। তাঁর 'চাঁদের মেয়ে' পালায় ঈশা খাঁ-র ভগ্নী পুরুষবেশী আলেয়া কেদার রায়ের পুত্র কাঞ্চনকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে যখন শ্রীপুরে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন, তখন নদীরঘাটে জনৈক মাঝি নিম্নের গানটি গাইছে —

মাঝি ।। হাঁদে করতা ? লৌকা চাই ?

কাঞ্চন।। নৌকা আছে তোমার ? বেশ - বেশ, তাই বল। কি গাইছিলে মাঝি, গাও তো।

মাঝি।। (একটু হাসিয়া আবার গান ধরিল)

পূর্ব গীতাংশ

কলকলিয়ে উঠছে পানি, কাঁপছে আমার পরাণখানি,
চাঁদ ডুবেছে, তারাগুলো মিটির মিটির চায়।'
না যাওয়া পথ অনেক বাকি এনেছি যা কেবল ফাঁকি,
পাতাল থেকে ডাকছে যে যম, আয় রে চলে আয়।

গীত শেষে মাঝি বলছে —

মাঝি।। আহেন করতা, আহেন। (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য)

ব্রজেন্দ্রকুমারের পালায় দেখা যায়, দৃশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গান বিশেষ সহায়ক হয়েছে। গনশুনে নাট্যঘটনা সম্বন্ধে পাত্রপাত্রী এবং দর্শকশ্রোতা উভয়েই কিছুটা অনুমান করতে পারেন। ফলে নাটকের উথান পতন তথা চরিত্র পাত্রদের গতি প্রকৃতি দর্শনের জন্য দর্শক বিশেষ কৌতূহল হন। নাটকের গতিবেগ এর ফলে বৃদ্ধি পায়। যেমন তার 'ভরত বিদায়' বা মহীয়সী কৈকেয়ী' পালায় দেখা যায়, কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় কৌশল্যার বুকে আঘাত নেমে আসছে, জীবনের সমস্ত স্বপ্ন একটু পরেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, সুদেবের গানে তার পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে —

ওমা বুকটারে তুই বাঁধ।
মাথায় ভেঙে আসছে নেমে নীল আকাশের ছাদ।
কত সুখের দেখলি স্বপন, বাঁধলি আশার নীড়,
বাজের ঘায়ে চূর্ণ হলো সোনার সৌধ-শির,
রবি শশী গ্রহ তারা
কেঁদে কেঁদে হলো সারা,
যবনিকার অন্তরালে ঘটেছে পরমাদ। (২য় পর্ব, ১ম দৃশ্য)

ভরত গিরিপুরে মামাবাড়িতে অবস্থানকালে রামচন্দ্রের বনগমন এবং পিতা দশরথের মৃত্যুতে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে অকাল অন্ধকার নেমে আসে। জীবনের সমস্ত ছন্দ পতন হয়ে অযোধ্যাপুরী শোকপুরীতে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় ভরত অযোধ্যার কুশলাদি সম্বন্ধে জানতে চাইলে সুদেব গানের বাণীতে যে ভাব ব্যক্ত করেছে, সংলাপে তা অবর্ণনীয় —

ছিঁড়িয়া গিয়াছে বীণার তন্ত্রী, থামিয়া গিয়াছে গান,
মন্দির ছাড়ি কাঁদিয়া কাঁদিয়া পলায়েছে ভগবান।
নিভিয়াছে রবি, ক্ষুব্ধ সমীর, দুঃখের নাহি শেষ,
স্বপনের পুরী দুঃসহ শোকে ধরিয়াছে দীণাবেশ,
আকাশ ভাঙিয়া নেমেছে বাদল
ধুয়েছে ধরার নয়ন-কাজল,
নয়নের বারি রুধিতে না পারি, ব্যথার বিদরে প্রাণ।
(২য় পর্ব, ২য় দৃশ্য)

ব্রজেন্দ্রকুমারের অনেক যাত্রাপালায় রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি এমন কি, বৈষ্ণব পদাবলীও ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর 'বাঙালী' পালায় দেখা যায়, গণপতি ঠাকুর তার বিধবা ভগিনী ছবিকে খুঁজে না পেয়ে মুসলমান আধিপত্যের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে নিজেকে হতভাগ্য মনে করেছেন। সেই সময় এ পালার একানে বালক কিশোরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে / সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে" গানখানি (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)। ৪র্থ অঙ্কের ৩য় দৃশ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল/বাঙলার হাওয়া, বাঙলার ফল'' গানখানি বুলবুল এবং প্রতাপের দ্বৈতকণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছে। এ নাটকে নবাবকন্যা আশমান মোবারকের শৌর্যবীর্য-বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবাসেন কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে শাহাজাদীর অহঙ্কারে বাধে। নবাবের পুত্র বুলবুল আশমানের হৃদয়ের কথা বুঝতে পারে। আশমানকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে বুলবুল রাধার জবানীতে চণ্ডীদাস বিরচিত পূর্বরাগের এই বিখ্যাত পদটি গায় —

সখি, কেবা শোনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ। (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

ভারাক্রান্ত দর্শকদের ক্ষণিক ড্রামাটিক রিলিফ বা মেন্টাল রিলিফ দেবার পক্ষে এই বৈষ্ণবপদটি সুপ্রযোজ্য হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর যাত্রাপালায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিরিয়াস গান ব্যবহার করলেও ক্ষেত্র বিশেষে তিনি হাসির গানও পরিবেশন করেছেন। 'লীলাবসান'-র মতো পৌরাণিক পালাতেও বিয়েপাগলা দুর্লভচাঁদকে ঘিরে বালকগণ নিম্নের কৌতুক গীতিটি পরিবেশন করেছে —

বালকগণ ।। ওরে কপাল পোড়া বর।
কপালে তোর ঘুন ধরেছে, জুটলো না তাই বাসরঘর।
দুর্লভ।। যত সব ডেঁপো ছোঁড়া - দূর হ।
বালকগণ।। বিদ্যের চোটে পেট ফেটেছে কনে বুঝি ভড়কে গেছে
হোঁচট খেয়ে পড়লো জলে ডুবুরি দে তুলে ধর।
দুর্লভ।। মারখাবি বলছি —
বালকগণ।। ভয় কি, আছে আরও কনে,
গদার পিসি, পদার মাসী, বিদ্যেধরী গুণে-জ্ঞানে
ফেল কড়ি, মাখ তেল, মোরাই ডাকব প্রাণেশ্বর। (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

ভক্তিরসের সংগীত পরিবেশনেও ব্রজেন্দ্রকুমার দে যে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন তা জানা যায়, ভক্তিরসাশ্রিত জীবনীমূলক যাত্রাপালা 'নটী বিনোদিনী'র বিনোদিনী পরিবেশিত নিম্নে প্রদত্ত গানটির উল্লেখে, যেখানে কৃষ্ণগতপ্রাণা নিমাইরূপী বিনোদিনীর সঙ্গে দর্শককুলও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে গেছেন—

হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণ সখা, রাখ পায়।(২য় পর্ব,৩য় দৃশ্য)

এই বিনোদিনীই থিয়েটারকে ভালোবেসে থিয়েটারের মধ্যে থেকেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন মনে করে থিয়েটারের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেও থিয়েটার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্তা হয়ে সংগীতে গৃহদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করেছেন—

বাস্তুদেবী, প্রণাম নাও
নবজীবন যাত্রাপথের পথিক আমি,
বিদায় দাও। (৩য় পর্ব , ৩য় দৃশ্য)

অভিশপ্ত জীবনযাত্রা থেকে নারীত্বের স্বাভাবিক সংসার জীবনে অনুপ্রবেশের সুনিবিড় আর্তি, জীবনদ্বন্দ্ব ও মানসদ্বন্দ্বের পটভূমিকায় নারীজীবনের সার্থকতার শাশ্বত রূপ,—যা সংলাপে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব, তাই সংগীতের সুর ও বাণীতে ভাবব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে।

প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা স্বপনকুমারের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানা যায়, স্বপনকুমার নিজে গান গাইতে পারতেন। তিনি ব্রজেন্দ্রকুমারের একাধিক যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন।

ব্রজেন্দ্রকুমারের 'ধর্মের হাট' পালায় তিনি দেবানীকের চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। এই পালার পরিচালক ছিলেন প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা পঞ্চু সেন। স্বপনকুমার পঞ্চু সেনকে অনুরোধ করেছিলেন, ব্রজেনবাবুকে বলে এ পালার বিশেষ বিশেষ স্থানে স্যাটায়ার জাতীয় গানের দু'চার লাইন লিখিয়ে নিতে। পঞ্চু সেন স্বপনকুমারের এই প্রস্তাব শুনে অবাক হয়ে যান। ক্ষুব্ধ স্বরে তিনি স্বপনকুমার কে বলেন —

> "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ব্রজেন্দ্রকুমারকে বলব, এখানে একটা গান দিন, ও খানে একটা গান লিখে দিন? ব্রজেনবাবুকে তুমি চেনো না। উনি এক্ষুনি পালা তুলে নিয়ে যাবেন। স্বপন, তোমাকেও বলছি, তুমিও ব্রজেনবাবুর কাছে এই অনুরোধ নিয়ে যাবে না। উনি খুব অসন্তুষ্ট হবেন এবং রেগে যাবেন।" ৩

নটসম্রাট স্বপনকুমারের সাক্ষাৎকারে আরও জানা যায় যে, ব্রজেন্দ্র-পূর্ব এবং ব্রজেন্দ্র-সমকালীন যুগে যাত্রার পরিচালক এবং প্রযোজকেরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো যাত্রাপালার সংলাপ বা সংগীতাদি কাটাকুটি করে পরিবর্তন বা সংযোজন বিয়োজন করতেন কিন্তু ব্রজেনবাবুর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ছিল। ব্রজেনবাবুর যাত্রাপালায় কেউই কলম চালানোর দুঃসাহস দেখাতে পারতেন না। এমন কি, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গম্ভীর মানুষটির কাছে কোনো প্রস্তাব নিয়ে যেতে সকলেই ভয় পেতেন। যাই হোক, স্বপনকুমার নিজে উক্ত পালায় সংগীত সংযোজনের অনুরোধ নিয়ে গেলে ব্রজেনবাবু তাঁর সেই অনুরোধ রেখেছিলেন। সেই সূত্রেই 'দেবানীক' পালায় সংযোজিত হয়েছিল এই গানখানি—

ঠেলায় পড়ে ডাকছে হরি
মনে কিছু পড়ছে না হে।

স্বপনকুমার স্বকণ্ঠে এই গীত পরিবেশন করে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দান করেছিলেন।

প্রখ্যাত যাত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্ত ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালায় সংগীত সংযোজন সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বলেন—

> "ধানবাদ, ঝরিয়া, আসানসোল প্রভৃতি কোলিয়ারী অঞ্চলে পালাভিনয় করতে গেলে দর্শকদের পরিতুষ্টির জন্য পালাভিনয় কালে পালার সংগীত সহ হিন্দী ছবির নাচ গানের ব্যবস্থা করতে হোত। কিন্তু ব্রজেনবাবুর যাত্রাপালার অভিনয়ের ক্ষেত্রে পালাভিনয়কালে এইরূপ যথেচ্ছ নৃত্য-গীত পরিবেশন করতে কোনো যাত্রাদলই সাহস পেত না।" ৪

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পালাভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর নাটকই যে শেষ কথা তা জ্যোৎস্না দত্তের উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়। তাঁর যাত্রাপালার ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন, সংযোজন ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালায় সংগীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতে, সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূরীকরণে, শ্রেণীবৈষম্য দূর

করতে, সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করে, অত্যাচার-নিপীড়ন রোধ করতে, ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় প্রদর্শন করতে, সমাজে সর্বপ্রকার সম্প্রীতি আনয়নের লক্ষ্যে এবং হাস্যরস পরিবেশনে ও দর্শকদের সাময়িক ড্রামাটিক রিলিফ দানের উদ্দেশ্যে বিবেক, চাষী, মাঝি, বাউল, ফকির, চারণ, বালক, কিশোর, বাঈজী প্রভৃতি গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে নানাপ্রকার সংগীত প্রদান করেছেন। সংগীতের সফলতা কেবলমাত্র গানের বাণীর উপরে নির্ভর করে না,—সুরকার ও গায়ক-গায়িকার কণ্ঠের মাধুর্যের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। পঞ্চানন মিত্র, অমিয় ভট্টাচার্য, প্রশান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের ন্যায় প্রথিতযশা সুরকারদের সুমধুর সুরে, বিনোদ ধাড়া, গুরুদাস ধাড়া, খোকন বিশ্বাস, বলাই হালদার, তিনকড়ি ভট্টাচার্যের ন্যায় উদাত্ত ও সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী গায়কদের কণ্ঠ আশ্রয় করে এবং পঞ্চুপাল, পঞ্চানন মিত্রের ন্যায় আবহ স্রষ্টাদের সাহচর্যে ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালায় ব্যবহৃত গানগুলি অকুণ্ঠ দর্শক সমাদর লাভ করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, সুরকার, প্রয়োগশিল্পী, যন্ত্রী—সকলের সমবেত ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালায় ব্যবহৃত গানগুলি সাফল্য লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে সংলাপ রচনায়, কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে, বিষয় ভাবনায় এবং সংগীত পরিবেশনায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে -র যাত্রাপালাগুলি বাংলা যাত্রার ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে একটি নূতন যুগ। নাট্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ অজিত কুমার ঘোষের ভাষায় বলা যায় —"আধুনিক কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার হলেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে"(লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ)।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, ব্রজেন্দ্র কুমার দে যেমন যাত্রপালা রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছেন, তেমন যুগোপযোগীরূপে যাত্রাপালার সংগীত রচনার ক্ষেত্রে প্রদর্শন করেছেন বিশেষ কৃতিত্ব এবং এই ভাবেই বাংলা যাত্রা পালাভিনয়ের ইতিহাসে হয়ে উঠেছেন পালাসম্রাট।

অষ্টম অধ্যায়

যাত্রার পালাবদল ও ব্রজেন্দ্রকুমার

বাংলা যাত্রার ইতিহাসে পালাকার হিসাবে ব্রজেন্দ্রকুমার দে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, সেকথা যাত্রা-গবেষকগণমাত্রই জানেন। কিন্তু কোন্ বৈশিষ্ট্যে যাত্রাপালার ইতিহাসে তিনি 'পালাসম্রাট' এবং কী বৈশিষ্ট্যে তিনি যাত্রাপালা রচয়িতার ইতিহাসে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন, তা বিশেষভাবে বিচার্য।

যাত্রাপালার কাহিনীর ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-ই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম সর্বব্যাপকভাবে যাত্রাকে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত করেন। তাঁর হাতেই যাত্রাপালা বাংলা লোকনাট্যের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নবরূপে সমৃদ্ধ হয় ও তাঁর প্রভাবেই যাত্রার ক্ষেত্রে নানাবিধ রূপান্তর সাধিত হয় এবং বাংলার যাত্রা বহুলাংশে নাট্যশিল্পের সামীপ্য লাভ করেও লৌকিক ঐতিহ্যের সার্থক প্রতিভূ হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে বিশেষত 'রাহুমুক্ত' পালার ধারানুসারী উৎপল দত্ত, শম্ভু বাগ প্রভৃতির গণনাট্যমুখী যাত্রাপালার 'মার্জিত রূপটি' বিকশিত হয় (সৌজন্য—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত)। গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাতে 'নবান্ন' লোকনাট্যের যে বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করেছিল, ব্রজেন্দ্রকুমার পরবর্তীকালে বীরু মুখোপাধ্যায়, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত প্রভৃতির যাত্রাপালায় তারই ভিন্নতর রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালার পটভূমিকা বাদ দিয়ে সম্ভবতঃ গণমুখী যাত্রাপালার ইতিহাস অনুশীলন করা কঠিন। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-ই সম্ভবতঃ তাঁর শিল্প-সাহিত্য রুচি ও লৌকিক ঐতিহ্যবোধের সচেতনতায় যাত্রাকে আধুনিক মঞ্চাশ্রয়ী নাট্যাভিনয় এবং চলচ্চিত্রের অভিনয় রীতি থেকে স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করেন এবং যাত্রা যে উচ্চ নাট্যকলার বিকৃত সংস্করণমাত্র নয়, তা প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রজেন্দ্র কুমার সমকালীন যাত্রার ব্যাপক প্রসার এবং নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যাত্রায় যোগদান এবং উচ্চ নাট্যশিল্প সাহিত্যের স্রষ্টা ও পরিচালকদের যাত্রার জগতে অনুপ্রবেশকে বহুলাংশে অনির্বায করে তোলে, — এ সত্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যাত্রাজগতের প্রচলিত দুর্বলতা থেকে যাত্রাপালাগানকে যুগোপযোগীরূপে স্বকীয় ঐতিহ্যে সুদৃঢ় করে তোলাই ছিল ব্রজেন্দ্রকুমারের প্রত্যয়। বলাবাহুল্য, এই প্রত্যয়ের পথে প্রতিভাকে ন্যস্ত করে ব্রজেন্দ্রকুমার দে বাংলার যাত্রার ব্যাপক পালাবদল ঘটিয়েছেন এবং বাংলা যাত্রাপালার ইতিহাসে হয়ে উঠেছেন " পালাসম্রাট"।

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে অপ্রত্যাশিতভাবেই যাত্রাজগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কেননা, নাট্যচর্চার কোনো ঐতিহ্য তাঁদের পরিবারে ছিল না। তাঁদের পরিবারে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি যাত্রাপালা রচনায় মনোনিবেশ করেন। যাত্রাপালা রচনা এবং 'পালাসম্রাট 'রূপে তাঁর হয়ে ওঠার পেছনে এক দুর্নিবার তাগিদ তিনি অনুভব করতেন। ছেলেবেলায় গ্রামে যাত্রাগানের আসর বসত। সেই যাত্রাগান প্রত্যক্ষ করে তাঁর কিশোর-মনে একাধিক প্রশ্ন ভিড় করত। ব্রজেন্দ্র কুমার স্বয়ং পুত্র তরুণ কুমারকে তাঁর ছেলেবেলাকার অনুভবের কথা জানিয়েছেন। যাত্রা সম্পর্কিত এরূপ একাধিক প্রশ্ন তাঁকে বিচলিত করে তুলত —

"(১) যাত্রার পালা এত দীর্ঘ কেন? (২) পালাতে এত গান কেন? যার অর্ধেক অপ্রয়োজনীয়। (৩) রাজা-রাণী আর ঝাড়ুদার-ঝাড়ুদারনী একই ভাষায় কথা বলে কেন? (৪) পালার ভাষা এত গুরুগম্ভীর ও শক্ত কেন? (৫) কমিক চরিত্রেরা পালার ঘটনার সঙ্গে আদৌ যুক্ত নয় কেন? ইত্যাদি।" ১

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো ব্রজেন্দ্রকুমারকে অস্থির করে ছাড়ত। যাত্রানাটকের এইসব প্রচলিত দুর্বলতা দূর করতে তিনি নিজেই পালাকার হিসেবে কলম ধরেছেন। যাত্রাপালা রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি যাত্রাপালার ত্রুটিগুলি মোচনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ফলস্বরূপ যাত্রার সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং তাঁর হাতেই ঘটেছে যাত্রার পালাবদল।

ব্রজেন্দ্রকুমারের আগে যিনি যাত্রার সংস্কার সাধনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি প্রখ্যাত পালাকার ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী। কিন্তু যাত্রার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়।তাঁর অকাল প্রয়াণে যাত্রা জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তাঁর হাতে যাত্রার শৈশব দশা ঘুঁচলেও কৈশোর উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সেই অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে অগ্রসর হন পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীকে পূর্বসুরী হিসাবে বরণ করে শৈশবে অনুভূত যাত্রার অসঙ্গতিগুলো দূর করতে তিনি যাত্রা জগতে প্রবেশ করেন। এই মহান ব্রতে সহযোগী হিসেবে পাশে পান বন্ধুবর শ্রী সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় এবং ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের ন্যায় প্রগতিশীল আধুনিক চেতনাসম্পন্ন যাত্রাপালাকারবৃন্দকে।

যাত্রার পালাবদলে ব্রজেন্দ্রকুমারের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রখ্যাত যাত্রাকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন —

"ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী যাত্রায় যেমন একটি মাইলস্টোন, ব্রজেনবাবুও তেমনই একটি মাইলস্টোন। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী যাত্রার প্রচলিত ধারার পরিবর্তনের যে সূচনা করেন, ব্রজেনবাবু সেই পরিবর্তনের সূত্র ধরে যাত্রাকে মার্জিত ও সুসংস্কৃত করে যাত্রার পালাবদল ঘটিয়ে যাত্রাকে ভদ্রলোকের উপযোগী করে তুলেছেন।" ২

ব্রজেন্দ্রকুমার যখন যাত্রায় আবির্ভূত হন তখন যাত্রাজগতে মূলত পৌরাণিক পালাভিনয়ের প্রচলন ছিল। পেশাদার যাত্রাদলের সংস্পর্শে এসে তিনিও পৌরাণিক পালা রচনায় অবতীর্ণ হন। তবে গতানুগতিক পথে অগ্রসর না হয়ে তিনি স্বকীয় পথে পৌরাণিক চরিত্রগুলো নবরূপে বিশ্লেষণ করেন এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাখ্যা করেন। নবব্যাখ্যাত চরিত্রগুলি এর ফলে একটি ভিন্নতর মাত্রা লাভ করে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ব্রজেন্দ্রকুমার রচনা করলেন পৌরাণিক পালা 'লীলাবসান' (১৯৩৩)। —এ পালা প্রতিবাদের পালা। যাত্রার আবহমানকালের নিয়মানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি'-র অংশ বিশেষ যদিও এ পালায় উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু শূদ্র জরা চরিত্রের পরিকল্পনায় নিঃসন্দেহে নতুনত্বের আভাস মেলে। জরা বসুদেবেরই সন্তান, তবে তার অদৃষ্ট সে শূদ্রানী গর্ভজাত। একই পিতা বসুদেবের সন্তান বলে বলরাম আর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাসনে বসার দাবি ছিল তার। কিন্তু বসুদেব সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেন। তাই জরা বিদ্রোহ করে। তার অধিকার সে ছিনিয়ে নিতে

চায়। শূদ্র চন্দন যখন বলেন — "গীতা বলেছে, কর্মে তোমার অধিকার — ফল চাইবার অধিকার নেই" তখন বিদ্রোহী জরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে — "কর্ম কর, ফল চাসনে, তোরা শুধু খেটে মরতেই জন্মেছিস, ফল ভোগ করবে আর্য্যেরা।" উল্লেখ্য, বৈষ্ণব মন্দির প্রাঙ্গণে 'লীলাবসান' পালার অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তি ও এই পালায় রাজদ্রোহের গন্ধ পায় এবং এই পালার অভিনয় বন্ধ করতে তৎপর হয়। জরার সোচ্চার দাবি — "আমাদের মানুষের মত বাঁচতে দাও। এই পদদলিত সঙ্কুচিত জীবনের বোঝা আমরা আর বইব না।" ইংরেজরা জরার দাবিকে রূপকাকারে বঞ্চিত পরাধীন ভারতবাসীর দাবি বলে মনে করে ভীত হয়েছিল। জরা বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে, প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে তার জাতির জন্য অর্থনৈতিক সমানাধিকার দাবি করে। এ কথা বলা যায় যে, ব্রজেন্দ্রকুমারের 'লীলাবসান' পালার জরা চরিত্রটি যাত্রা জগতের সবচেয়ে ডেমোক্রাটিক এবং ডায়নামিক চরিত্র। এই পালা অত্যন্ত অভিনয় সফল হয়েছিল। তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রাদল গণেশ অপেরা পার্টি এ পালা আসরস্থ করে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছিল। সাম্প্রতিককালে ১৯৭৮ সালে নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা পুনরায় এ পালাভিনয় করে। ব্রজেন্দ্রকুমারের পূর্বে যদিও দু'চারটি যাত্রাপালায় প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হতে দেখা গেছে, যেমন বেদউদ্ধার, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি কিন্তু কোন পালাতেই আর্থ-সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে এমন সোচ্চার প্রতিবাদ শোনা যায় নি। প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য তরুণ কুমার দে-র উক্তিটি —

> "বস্তুত মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রার পূর্ণতা এসেছে এই লীলাবসানে। পেশাদার যাত্রার ট্রাডিশন না ভেঙে ব্রজেন্দ্রকুমার লীলাবসানে এক নতুন পদক্ষেপ ফেলেছিলেন, যা পরবর্তীকালের যাত্রাপালাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। জরা সে কারণেই স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি।" ৩

চরিত্রের নব মূল্যায়ন করে ব্রজেন্দ্রকুমার আরও একাধিক যাত্রাপালা রচনা করেছেন। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'ভরতবিদায় বা মহীয়সী কৈকেয়ী' যাত্রাপালাখানি। ব্রজেন্দ্রকুমারের ভাবনায়, তাঁর রচিত পালাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রাপালা। এই পালায় কৈকেয়ী চরিত্রের নবমূল্যায়ন সাধিত হয়েছে। এই পালায় নিন্দিত কৈকেয়ীকে ব্রজেন্দ্রকুমার মহীয়সীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পালাখানি তাঁর বিচারে কেন শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার বলেছেন —

> " এই নাটকে কৈকেয়ী চরিত্রের নব মূল্যায়ন করা হয়েছে। কৈকেয়ীর দ্বৈত-চরিত্র এই নাটকটিকে দর্শকের চোখে দীর্ঘকাল আকর্ষণীয় করে রেখেছিল। এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, কৈকেয়ী নির্মম ছিলেন না। রামকে তিনি চিরকালই স্নেহ করতেন। তাকে তিনি বনবাসে পাঠান নি, পাঠিয়েছিলেন পাঠশালায় — আগুনে পুড়িয়ে, জলে ভিজিয়ে খাঁটি মানুষ তৈরী করবার জন্য। 'সি ইজ দি সিম্বল অব কনসাস উইল অ্যান্ড সোস্যাল নেসেসিটি। একাধারে কৈকেয়ী রামের কল্যাণের নিমিত্ত এবং অপর পক্ষে দেশ ও মানুষের মঙ্গলের সংকল্পে অটল।" ৪

রামায়ণে কৈকেয়ীকে নিষ্ঠুর, নির্মম, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর এবং লোভীরূপে অঙ্কন করা হয়েছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রকুমারের 'ভরত বিদায়' পালার কৈকেয়ী প্রথমে নির্মম ছিলেন না,— সামাজিক প্রয়োজনে, অনার্যশক্তির করাল গ্রাস থেকে আর্য - সংস্কৃতিকে বাঁচাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা পূর্ণ করতে সকলের চোখে তাঁকে নিষ্ঠুর হতে হল, নিজেকে কালিমালিপ্ত করতে হল। আত্মগ্লানিতে জর্জরিত ভরত জননী কৈকেয়ী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে কেঁদে কেঁদে নিবেদন করছেন —

কৈকেয়ী।। এমন ছেলে কার ছিল? আমার জন্য যে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারত। আর আমি তাঁকে —

বিশ্বামিত্র।। তুমি তাকে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছ মা।

কৈকেয়ী।। বিদ্যালয়। সিংহ বাঘে রাক্ষসে ঘেরা সে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সে ফিরে আসবে, এই কি আপনি আশা করেন?

বিশ্বামিত্র।। শুধু আশা করছি না মা। সে শুভদিন আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে কৈকেয়ীর অন্তরের আকৃতি, বেদনার্ত হৃদয়ের হাহাকার এখানে প্রকাশিত হয়েছে। রামের বনগমনে পিতা দশরথ এবং মাতা কৌশল্যার কান্নাটাই সকলে দেখতে পেয়েছে, সকলে জেনেছে কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, কিন্তু বিশ্বামিত্র ব্যতীত জগতের কেউই জানলো না কৈকেয়ীর ত্যাগের কথা, আত্মগ্লানির কথা, অন্তর্জ্বালার কথা। পালাকার এখানেই কৈকেয়ী চরিত্রে একটি 'নোবেল ইন্টারপ্রেটেশন' দিয়েছেন। পালাকার হিসাবে এখানেই তাঁর দক্ষতা। এক্ষণে নাট্যকার মন্মথ রায়ের উক্তিটি উদ্ধৃতিযোগ্য —

> "নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত ব্রজেন্দ্রকুমারের 'ভরত বিদায়' বা 'মহীয়সী কৈকেয়ী' নাটকটি পড়ে মনে হয়, রামায়ণী কাহিনীর মূল কাঠামোটি ঠিক রেখে কৈকেয়ীর এই চরিত্র চিত্রণের কল্পনা কুশলতা সত্যিই অভিনব।"৫

যাত্রার পালাবদলের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকুমারের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাত্রায় সংক্ষিপ্ত সংলাপ প্রয়োগ করে তিনি এই কাজ তরান্বিত করেন। তাঁর রচিত 'চাঁদের মেয়ে' (১৯৩৬) যাত্রাপালা থেকেই তিনি সংক্ষিপ্ত সংলাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের উক্তিটি এস্থলে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য —

> "যুদ্ধোত্তরকালে যাত্রায় হ্রস্ব সংলাপ সংযোজনকারীদের পুরোধায় রহিয়াছেন ব্রজেন্দ্র কুমার দে। তিনি পূর্ববর্তী নাট্যকারদের সংলাপ অপেক্ষা অধিকতর হ্রস্ব সংলাপ সংযোজনার পক্ষপাতিত্ব করিয়া যাত্রাপালা রচনা করেন। তাহার এই নীতি অন্যান্য নাট্যকার কর্তৃক অনুসৃত হইতেছে।" ৬

ব্রজেন্দ্রকুমারের পূর্বে আদ্য ও মধ্যযুগে যাত্রাপালায় চরিত্রগুলির মুখে থাকত দেড় পৃষ্ঠা, দু'পৃষ্ঠার একক সংলাপ। চরিত্রগুলি একবার ডায়লগ বলা শুরু করলে থামতেই চাইত না। ফলে ডায়ালগগুলি মনে হত লেকচার। যাত্রা সমালোচক প্রভাত কুমার দাস বলেছেন—

> "Brojendra Kumar in his long period as a Palakar (Script writer of the Yatra) brought about certain radical changes in the selection of plot, in dialogue in the arrangement of the scence etc." ৭

ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রায় সংক্ষিপ্ত সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবিগানের 'চাপান - উতোর' টেকনিক গ্রহণ করেছিলেন। ছোট ছোট, সংক্ষিপ্ত সংলাপ নাটকীয় করে চরিত্রপাত্রদের মুখে স্থাপন করতেন ব্রজেন্দ্রকুমার । এ বিষয়ে যাত্রা সমালোচক সনাতন গোস্বামীর মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য —

> "ব্রজেন্দ্র কুমার দে যাত্রার সংলাপকে ছোট করে তাকে নাটকীয় তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলতেন।" ৮

ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর 'চাঁদের মেয়ে' পালানাটক থেকে যাত্রায় সংক্ষিপ্ত সংলাপ ব্যবহার শুরু করেন, সেকথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'চাঁদের মেয়ে' যাত্রাপালা থেকে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হোল —

জগদম্বা।। কি বলছো?

কেশরী।। আমি কি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবো?

দেবল।। না - না , তামাক খাও।

জগদম্বা।। বসো

কেশরী।। আরে শিগগির বাড়ি চল।

উপরের উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাই, ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালায় ব্যবহৃত সংলাপ কত সংক্ষিপ্ত, স্বাভাবিক, কত সাবলীল এবং একান্ত আন্তরিক হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত নাট্যকার মন্মথ রায়ের উক্তিটি স্মর্তব্য —

> "মুকুন্দদাসের সময় থেকে যাত্রাপালাকারদের এই লক্ষ্যে উপনীত হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু ব্রজেন্দ্রকুমার সেই লক্ষ্য ভেদ করেছেন।" ৯

এখানে একটা ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ব্রজেন্দ্রকুমারের 'চাঁদের মেয়ে' -র ন্যায় বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক যাত্রাপালা তৎকালে বেশিরভাগ যাত্রাদলই অভিনয় করতে সম্মত হয় নি। সংক্ষিপ্ত সংলাপের আশ্রয়ে রচিত এই যাত্রাপালা শ্রোতারা হয়ত গ্রহণ করবে না — এই সংশয়ে গণেশ অপেরা, আর্য্য অপেরা, জয়ন্তী অপেরা, ভোলানাথ অপেরা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যাত্রাদল পালাখানি অভিনয় না করে ফেরৎ দিয়েছিল। বহু সমালোচিত এই পালাখানি প্রযোজনা করতে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন নট্ট কোম্পানির নির্ভীক প্রযোজক সূর্যকুমার দত্ত । তিনি নিজে ব্রজেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন পালাখানি। তাঁর সহযোগিতাতেই 'চাঁদের মেয়ে' দর্শক শ্রোতাদের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিল। একটি সাক্ষাৎকারে সূর্যকুমার দত্ত এ বিষয়ে বলেছিলেন —

> "আমি দেখলাম এ এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে যাত্রায়, সবার আপত্তি ছিল। তবু বই নিলাম। প্রথম তিন রাত ঝড়ের জন্য বই খুলতে পারলাম না। চার রাত পরে ত্র্যহস্পর্শের দিন বই খুললাম। সেদিনই যাত্রা যথার্থ আধুনিকতার দিকে পা বাড়াল। আজও কেউ এ পালাকে ভোলে নি।" ১০

ব্রজেন্দ্রকুমার আধুনিক থিয়েটারে প্রচলিত সংলাপে প্রভাবিত হয়ে যাত্রায় সংক্ষিপ্ত সংলাপের ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা - নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। বলাবাহুল্য, প্রথমেই সে পরীক্ষায় তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর গৃহীত কতকগুলি টেকনিক তাঁর সহায়ক হয়েছিল। তিনি যাত্রার শুরুতেই একটা 'ড্রামাটিক অ্যাকসন্' তৈরী করে শ্রোতাদের মনোযোগ পালার প্রতি নিবদ্ধ রাখতেন। ফলে শ্রোতারা অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার অবসরই পেত না। ড্রামাটিক সাস্‌পেন্সের কারণে পরবর্তী ঘটনা দেখার অপেক্ষায় শ্রোতারা উৎগ্রীব হয়ে থাকতেন। প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় ব্রজেন্দ্রকুমারের সাফল্য সম্বন্ধে বলেছেন —

> "ব্রজেন্দ্রকুমার কর্তৃক যাত্রাগানে বহুল ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত সংলাপরীতি ব্যর্থ হয় নি এই জন্য যে, তিনি যাত্রাগানে ঘটনা সংস্থাপনে প্রথম থেকেই নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করে শ্রোতাদের মনোযোগ দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে যান, যাতে সংক্ষিপ্ত সংলাপও শ্রোতা অবহেলা করার সুযোগ পান না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, থিয়েটারের সংলাপরীতি যাত্রাগানেও জয়যুক্ত হতে পারে এবং ব্রজেন্দ্রকুমারের সংলাপ তার নিদর্শন।" ১১

যাত্রার পালাবদলের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকুমার কর্তৃক ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত সংলাপ কতখানি সহায়ক হয়েছে প্রশ্ন করা হলে ব্রজেন্দ্র সমসাময়িক পালাকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

> "ব্রজেন্দ্রবাবুর সংলাপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর নাটক পড়া শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। যাত্রার পালাবদলে তাঁর যাত্রাপালায় ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত সংলাপ বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।" ১২

প্রখ্যাত যাত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্তা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন —

> "ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র সংলাপ অসাধারণ। তাঁর লেখনী মানুষের মনকে নাড়া দেয়। বুক দুরু দুরু করে। চোখ ছলছল হয়ে ওঠে।" ১৩

ব্রজেন্দ্রকুমার কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত সংলাপ প্রয়োগ করেই যে যাত্রাপালা রচনায় সাফল্য লাভ করেছেন তাই নয় , তিনি সফলতা পেয়েছেন চরিত্রানুগ সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে। যাত্রায় পূর্বে সকল চরিত্রই প্রায় একই ভাষায় কথা বলত — কিবা রাজরানী কিবা মেথরানী। চরিত্র সৃষ্টিতেও থাকত না কোন বৈচিত্র্য। ছেলেবেলায় তিনি নিজেই দেখেছেন রাজা ও নফর একই ভাষায় কথা বলছে। বাস্তবে আলিবর্দীর ভাষা এবং আক্রাম খাঁর ভাষা এক হতে পারে না — এই সচেতনতা পালারচনার প্রথম থেকেই তাঁর সক্রিয় থাকত। তাঁর ভাষা ছিল সহজ, সরল ও সাবলীল। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো ঐতিহাসিক হলে ইতিহাসের পাতা থেকে, সামাজিক হলে সমাজজীবন থেকে উঠে আসত। কখনোই তাদের কৃত্রিম বলে মনে হোত না। ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালাগুলো শ্রোতারা সহজেই গ্রহণ করতে পারতেন, কেন না চরিত্রগুলোর ভেতরে শ্রোতা নিজেকে খুঁজে পেতেন। এই প্রসঙ্গে তরুণ কুমার দে-র মন্তব্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য —

> "তাঁর ভাষা ছিল সহজ - সরল। ফলে তা গ্রামের নিরক্ষর মানুষের হৃদয়ে সহজে পৌঁছে যেত। একে ত তারা ব্রজেন্দ্রকুমারের পালায় মাঝি কানা চৈতা, জেলে

কাঙ্গালিয়াদের দেখতে পেল, তারপরে তাদের মুখে শুনতে পেল নিজেদের বলা কথাবার্তা। রোজকার, ঘরে-ঘাটে-হাটে ব্যবহার করা ভাষা। ফলে ব্রজেন্দ্রকুমারের পালার চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের একাত্ম হতে বেশি সময় লাগত না।" ১৪

পূর্বে যাত্রায় যে ভাষা ব্যবহৃত হোত সে ভাষা সাধারণ শ্রোতাদের সহজবোধ্য ছিল না। চরিত্রানুযায়ী ভাষা-প্রয়োগে যাত্রাকারগণ বিশেষ যত্নবান হতেন না। ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রোতাদের অসুবিধা উপলব্ধি করে সাধারণের বোধগম্য এবং চরিত্রানুগ ভাষা প্রয়োগ করেন। ব্রজেন্দ্র-পরবর্তী পালাকার আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন —

"ব্রজেন্দ্রবাবু ও ভোলানাথবাবুর আগে যাত্রাপালায় শুধু ভাষার কচকচি ছিল। সে ভাষা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। চরিত্রের উপযুক্ত ভাষা ছিল না। সোজা কথায় মানুষের মনের দুয়ার খুলে বুঝিয়ে দিতে ব্রজেনবাবুর মতো পালাকার ইতিপূর্বে আর আসেন নাই।" ১৫

ব্রজেন্দ্রকুমারের পালারচনার অন্যতম বিশেষত্ব হোল মার্জিত হাস্যরসের ব্যবহার। তাঁর পূর্বে এমনকি, পরবর্তীকালেও অনেকের মধ্যে কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর নিস্ফল প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। ব্রজেন্দ্রকুমার পেশাদার যাত্রাজগতে প্রবেশের দশ বছরের মধ্যেই যাত্রায় হাস্যরসের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করলেন তাঁর 'দেবতার গ্রাস' (১৯৪৪) পালায়। এই পালার অন্যতম চরিত্র চন্দ্রচূড়ের মাধ্যমেই তিনি মার্জিত হাস্যরস পরিবেশন করলেন। ফলে তাঁর যাত্রাপালা থেকে ভাঁড়ামি উঠে গেল। সেক্ষেত্রে প্রদর্শিত হোল স্যাটায়ার, উইট এবং হিউমার। তাঁর পূর্বে হাস্যরসের চরিত্রগুলোকে জোর করে পালায় ঢুকিয়ে দেওয়া হোত, নাটকের প্রযোজনে তাদের নিয়ে আসা হোত না। ফলে চরিত্রগুলি শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অবান্তর হয়ে পড়ত। পালা যখন জমে উঠত তখন এই চরিত্রসকলের ভাঁড়ামি দর্শকদের মূল গল্পের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত। এ স্থলে দর্শকেরা সঙ্গত কারণেই বিরক্তি বোধ করতেন। এ সম্বন্ধে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে নিজেই মন্তব্য করেছেন —

"হাস্যরসকে অনেকে বলেন relief, সম্ভবত, এই ভাবনাটা থাকার জন্যই যাত্রাপালায় হাস্যরসের চরিত্রগুলো জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হোত। কিছুক্ষণ মূলনাটক চলার পরে হঠাৎ একটা হাস্যরসের দৃশ্য আমদানি করা হোত। ফলতঃ মূল গল্পের সঙ্গে শ্রোতার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হোঁত। হাস্যরসের চরিত্রও ছিল নিম্ন স্তরের।" ১৬

ব্রজেন্দ্রকুমার হাস্যরস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত ত্রুটিগুলো দূর করতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর যাত্রাপালায় হাস্যরসের চরিত্রগুলি বিনা প্রয়োজনে আর রিলিফ দিতে এল না। পাগলের মতো হাত পা ছুঁড়ে শ্রোতাদের জোর করে হাসাবার ব্যর্থ প্রয়াস তাদের বন্ধ হল। শুধু কমিক চরিত্র নয়, ব্রজেন্দ্রকুমার অনেক ক্ষেত্রে পালার প্রধান চরিত্রের মধ্যেও হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'বিদ্যাসাগর' পালার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে শ্রীমন্ত কলকাতা থেকে এসে সত্যি মিথ্যে জড়িয়ে একাধিক গল্প ফেঁদে তা শুনিয়ে যাচ্ছে। সুরমা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছে —"মনুমেন্ট দেখেছ? কি দিয়ে গড়া বল তো?" —শ্রীমন্তের অন্তরাত্মা তখনই কেঁপে উঠেছে। উত্তরে সে বলেছে —'পাটনাই বাঁশ দিয়ে' (২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) —

শ্রীমন্তের এই জবাব শুনে শ্রোতারা হো হো করে হেসে উঠেছে। এখানে যে হাস্যরস ফুটে উঠেছে তা নির্মল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত। 'সম্রাট জাহান্দার শাহ' পালায় দেখা যায়, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে সম্রাট জাহান্দার শাহ স্বয়ং সারাদিন ভিক্ষুকের বেশে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সিপাহশালার জুলফিকার তাঁর সেই ছদ্মবেশ ধরতে পেরে নতজানু হয়ে সম্রাটের কাছে প্রার্থনা জানায়, তাঁর ঐ ভিখারীবেশ এবং ঐরূপ অসঙ্গত, অনুচিত ও অশোভনীয় আচরণ পরিত্যাগ করার জন্য।

জুলফিকার।। আপনি যদি এমনিভাবে চলতে চান, তাহলে আমাকে ত্যাগ করুন জাঁহাপনা।

> এ আমার অনুরোধ, এ আমার ভিক্ষা। (নতজানু হইয়া অঞ্জলি পাতিল, জাহান্দার তাহার অঙ্গুলির মধ্যে কিছু চানাচুর ঢালিয়া দিলেন, অবশিষ্ট নিজের মুখে দিলেন) এ কি?
>
> (৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

এই দৃশ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার হাস্যরস পরিবেশনের সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তঃসারশূন্যতাকে শ্রোতাদের সামনে অনাবৃত করে দিয়েছেন। প্রখ্যাত যাত্রাকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রকুমারের পালায় হাস্যরস পরিবেশন সম্বন্ধে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন —

> "যাত্রাগানে ব্রজেন্দ্রবাবুর পূর্বে কৌতুক অভিনেতাদের অভিনয়ে অশ্লীলতা প্রকাশ পেত। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবুর পালায় পরিবেশিত কৌতুকরসের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। তাঁর পালায় পরিবেশিত হাস্যরস মার্জিত এবং তাঁর সংলাপ অতি মধুর। যাত্রায় মার্জিত হাস্যরস ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। যাত্রা জগতে হাস্যরসের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রবাবু অদ্বিতীয়।" ১৭

ব্রজেন্দ্রকুমারের কৃতিত্ব এইখানে যে, তাঁর পালায় সৃষ্ট কমিক চরিত্রগুলি পালার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকত। নাটকের প্রয়োজনেই তাদের অবতারণা করা হোত। চরিত্রগুলি মূল নাটকের চরিত্রপাত্রদের একজন হয়ে উঠত। পালাকার এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপিত করতেন। নাট্যকার মন্মথ রায়ের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হল —

> "হাস্যরসকে পালার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দেওয়া এবং আদিরসের প্রাবল্য হ্রাস ব্রজেন্দ্রকুমারের আর দুটি বৈশিষ্ট্য।" ১৮

যাত্রাকে পূর্বে সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়া হোত না। সাহিত্যের দরবারে যাত্রাকে অত্যন্ত সস্তা শিল্পকর্ম ভাবা হোত। এরকম ভাবনার পশ্চাতে কিছু কারণ দর্শানো হয়ে থাকে। যাত্রায় যে কমিক চরিত্রগুলি আনা হোত প্রায়শই সেগুলি নাট্যকাহিনীর অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠত না। যাত্রায় পরিবেশিত দৈতসঙ্গীতের সঙ্গে মূল আখ্যানভাগের কোন সম্পর্কই থাকত না। হাস্যরস অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ভাঁড়ামিতে পরিণত হোত। সখির গান ছিল বিরক্তিকর। জুড়িদের দৌরাত্মে পালার নায়ক নায়িকাও বিরক্ত হয়ে পড়তেন। শ্রোতারা হয়ে উঠতেন অস্থির। অভিনেতা -অভিনেত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠত অমার্জিতের ছাপ। ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রায় প্রচলিত এই সকল ত্রুটি দূর করে যাত্রাকে ভদ্র শিষ্টজনের উপযোগীরূপে গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। প্রখ্যাত যাত্রাপালা অভিনেতা অমর কৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয়কে তিনি একদা বলেছিলেন — 'যাত্রানাটক

কে ভদ্রলোকের পাতে দিয়ে যাব'। (সৌজন্য — অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী) এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করার পক্ষে তাঁর সাধ্য এবং সাধনা দুই-ই ছিল। উচ্চ-শিক্ষার অধিকারী মার্জিত রুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান ব্রজেন্দ্রকুমারের পালাগুলি সাধারণ মানুষের জন্য হলেও সাহিত্যমূল্যের বিচারে সেগুলি অসাধারণ। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য —

"স্বাধীনতা উত্তর যাত্রাপালার যে মার্জিত রূপটি (আগের পালার তুলনায়) বিকশিত হয়ে ওঠে তার অন্যতম পুরোধা স্রষ্টা হলেন ব্রজেন্দ্রবাবু।" ১৯

যাত্রাজগতে ত্রিশের দশকের আগেই অসংখ্য পৌরাণিক যাত্রাপালা রচিত হয়। একই কাহিনী নিয়ে পালাকারেরা একাধিক পৌরাণিক পালা রচনা করেছেন এবং তদ্‌সত্ত্বেও তারপরে সে রচনাকার্য অব্যাহত থাকে। এরপরে আসে ঐতিহাসিক পালা রচনার জোয়ার। অতঃপর শুরু হয় কাল্পনিক যাত্রাপালা রচনা। ব্রজেন্দ্রকুমার কিন্তু গতানুগতিক পথে যাত্রাপালা রচনায় অগ্রসর হন নি। বহুশ্রুত পৌরাণিক কাহিনী বিভিন্ন পুরাণ থেকে সংগ্রহ করলেও তিনি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে পালা গুলিতে নূতনত্ব আনলেন। ফলে বহুশ্রুত, অতি পরিচিত চরিত্রও তাঁর রচিত পালাগুলিতে একটি অভিনব মাত্রা লাভ করত। উদাহরণ হিসাবে 'কৃষ্ণ - শুকনি' পালার রাবণ-মেঘনাদ, 'সীতার বনবাস' পালার বাল্মীকি এবং 'পুরুষোত্তম' যাত্রাপালার রাবণ চরিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রজেন্দ্রকুমারের এই কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রথিতযশা নাট্যকার মন্মথ রায় বলেছেন —

"বহু বিখ্যাত চরিত্রের নব মূল্যায়নের কৃতিত্বও অর্জন করেছেন তিনি। (যেমন কৈকেয়ী, শুকুনি, দুর্যোধন, জাহান্দার শাহ, কায়কোবাদ, রিজিয়া। প্রায় দেড় শত পালানাটক রচয়িতা ব্রজেন্দ্রকুমার ইতিমধ্যেই পালাসম্রাটরূপে কীর্তিত হয়েছেন। যোগ্য পাত্রেই এই সম্মান অর্পিত হয়েছে সন্দেহ নেই।" ২০

নব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে 'কৃষ্ণ-শকুনি' পালার শকুনি চরিত্রের প্রতি আলোকপাত করা যাক্। এই নাটকে দেখা যায়, শকুনি কৌরব বংশের ধ্বংসে কামনা করছেন নিজের পিতৃহত্যা বা ভাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য নয়, মূলতঃ দুর্যোধনের দুর্বৃত্তায়ন রোধ করতেই তিনি কূটনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, দুর্যোধনের জন্যই গোটা দেশে অত্যাচার, নারীধর্ষণ, গুপ্তহত্যা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। এই রূপ অরাজকতায় দেশে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তাই কৌশলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণা করে দুর্যোধনকে ধ্বংস করতে তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত রাজশক্তিকে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে এনেছিলেন। 'পুরুষোত্তম' পালার রাবণ সর্বগুণান্বিত। তার জাতি জগতে মর্যাদা পায় না বলে তিনি আর্যজাতির উপর ক্রুদ্ধ হন। 'পরাজিত মেঘনাদ' পালায় মেঘনাদ তার মানসিকতার উন্নয়ন সাধন করে লঙ্কার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন আন্তর্জাতিকতাবাদে। সে কারণে তিনি কখনোই রাম-রাবণের তথা আর্য - অনার্যের যুদ্ধকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেন না। তিনি একান্ত ভাবেই আর্য-অনার্যের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন —

মেঘনাদ ॥ নাগপাশে বেঁধে রেখে এলাম যাদের, তাদের বুকে দুটো তীর নিক্ষেপ করে আসতে কি

> আমি অক্ষম ছিলাম। . . . . অসংখ্য সর্প যেমন তোমাদের ঘিরে ধরেছিল, তেমনি ঘনমেঘ আচ্ছন্ন করেছিল। সেই মেঘের আকর্ষণেই এসেছিল অসংখ্য ময়ূর। . . . কারও মৃত্যু আমি চাই নি, আমি চেয়েছিলাম আর্য-অনার্যের মিলন সেতু গড়ে তুলতে। (পার্শ্বপট, ২য় পর্ব, ৬ষ্ঠ দৃশ্য)

'সীতার বনবাস' পালার বাল্মীকি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। ভবিষ্যৎ মানুষের কল্যাণার্থে এবং তাদের পথের দিশা দেখাতে তিনি রামায়ণের উত্তরপর্ব রচনায় হাত দেন। 'পরাজিত মেঘনাদে'র রাবণ বাল্মীকি রামায়ণের আদলে আদৌ নির্মিত হয় নি। রাবণকে এখানে একজন মহান প্রজাদরদী রাজারূপে অঙ্কন করা হয়েছে। নিরন্ন প্রজাদের মুখে অন্ন তুলে দিতেই রাবণ কৃষিলক্ষ্মী সীতাকে লঙ্কায় স্থাপন করেন, কামতাড়িত হয়ে নয় — নিষ্কাম পূজারী বেশে। সীতা যখন তাঁকে হরণের জন্য রাবণকে তিরস্কার বাণে জর্জরিত করেন, তখন তিনি হাসিমুখে সীতাদেবীকে বলেন — "আমি আমার সোনার দেশে সবুজ শস্যের প্লাবন আনতে চেয়েছিলাম। সন্ন্যাসীই তোমাকে অশোকবনে প্রতিষ্ঠা করেছে, রাজা তোমাকে স্পর্শ করেনি, প্রাসাদেও নিয়ে আসে নি।" (২য় পর্ব ৫ম দৃশ্য)
রাবণ চরিত্রের এই নতুন ব্যাখ্যায় প্রচলিত রাবণের দুর্বৃত্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসের ছবিটি দর্শকদের মনে পড়ে না, দর্শকের সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে ওঠে শান্ত, পেলব, পিতৃতুল্য প্রজাদরদী রাজার মুখাবয়ব। যাত্রা সমালোচক তরুণ কুমার দে মহাশয়ের মন্তব্যটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —

> "এই প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ অবদান ঐ পরাজিত মেঘনাদের রাবণ, সে সন্ন্যাসীবেশে নিষ্কাম হয়ে সীতা অর্থাৎ কৃষিলক্ষ্মীকে চুরি করে আনে— নিজের জন্য নয়, নিরন্ন প্রজাদের মুখে আহার দেবার জন্য। কারণ রাবণ বিশ্বাস করে প্রজাদের খাদ্য - বস্ত্র- বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই রাজার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। পরিচিত চরিত্রের নবরূপ দর্শকের রসবোধকে নন্দিত করে।" ২১

অতি পরিচিত পৌরাণিক চরিত্রগুলির নব মূল্যায়নে দর্শকের কৌতূহল অধিকতর মাত্রায় জাগ্রত থাকত এবং স্বভাবতই পালাবসান না হওয়া পর্যন্ত শ্রোতারা একাগ্রচিত্তে যাত্রাপালা দর্শনে মগ্ন থাকতেন।

আধুনিক কালের মঞ্চাভিনয়, চলচ্চিত্র, বেতার, নাটক ইত্যাদির প্রভাবে এবং বৈদ্যুতিক আলোক সম্পাত, মাইক্রোফোনের ব্যবহার, যাত্রার আসরে নাট্যমঞ্চের আনুগত্য, ঝুলন্ত পর্দায় আলোছায়ার প্রতিফলন ইত্যাদির প্রভাবে যাত্রার রূপ ক্রমশঃ 'অযাত্রিক' হয়ে উঠেছে বলে অধ্যাপক নাট্যবিশেষজ্ঞ ডঃ অজিত কুমার ঘোষ যাত্রার রূপান্তরের মূল্যবান বিশ্লেষণ করেন, যা যাত্রা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রকুমারের অভিমতকে দৃঢ়তা প্রদান করে। ডঃ অজিত কুমার ঘোষের বিশ্লেষণের সূত্র ধরে অধ্যাপক ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী আধুনিক লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লোক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে যুগ পরিবর্তনের ধারায় লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহে দ্বন্দ্বসমন্বয় জাত রূপান্তর সাধিত হয় বলে ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে যুগ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে লোকজীবন সম্ভূত লোকসংস্কৃতির স্বাভাবিক পরিবর্তন ও কৃত্রিম রূপান্তরের তত্ত্বও ব্যাখ্যা করেন এবং যাত্রার পরম্পরাগত ঐতিহ্যের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিবর্তন - রূপান্তরগত বৈচিত্র্যের কথাও বলেন এবং

ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রার পালাবদল নতুন যুগের আলোকে সেই প্রক্রিয়াতেই সাধিত হয় ও ব্রজেন্দ্রকুমারকে আধুনিক যাত্রার পথিকৎ বলে মন্তব্য করেন। যাত্রাগানে ব্রজেন্দ্রকুমারের অবদান সম্বন্ধে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন —

> "রবীন্দ্রনাথ যেমন একা বাংলাভাষাকে , বাংলা সাহিত্যকে পাঁচশত বছর এগিয়ে দিয়েছেন, তেমন ব্রজেনবাবু বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম ধারা যাত্রাসাহিত্যকে পাঁচশত বছর এগিয়ে নিয়ে গেছেন, যা ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী বা সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পারেন নি।" ২২

ব্রজেন্দ্রকুমার সম্বন্ধে অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর অভিমত যথার্থ , তবে যাত্রার অগ্রগতি সাধনে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী বা সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। যাই হোক, ব্রজেন্দ্রকুমারের অনুজ প্রতিম যাত্রাপালাকার আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রকুমারের তিরোধানে স্মৃতিচারণ করার সময় যাত্রাপালাগানে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেন —

> "ব্রজেন্দ্রবাবু যাত্রাপালায় একটি নতুন যুগ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পূর্বে ভোলানাথ কাব্য শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকখানা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পালা রচনা করে অল্প বয়সে মারা গেছেন — শাস্ত্রী মহাশয়ের অসম্পূর্ণ কাজ ব্রজেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণ করিলেন।" ২৩

যাত্রা সমালোচক সনাতন গোস্বামী যাত্রায় ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র স্থান সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন —

> "ব্রজেন্দ্রকুমারের পালায় ভক্তিরসের উদ্বোধন, মানবতার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এবং স্বদেশ প্রেমের ঘোষণা করা হয়েছে। আধুনিক যাত্রাপালায় তিনি অগ্রদূত।" ২৪

ব্রজেন্দ্রকুমার দে যাত্রার ফর্ম এবং কন্‌টেন্ট পরিবর্তনের সাথে সাথে যাত্রার সুসংস্কৃত ও মার্জিত রূপ প্রদান করেছেন। যাত্রাপালা রচনার ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রকুমার দে যে নবতম স্কুলের পত্তন করেন সে প্রসঙ্গে১৯৬১ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত প্রথম যাত্রা উৎসবে সম্বর্ধনা ভাষণে ব্রজেন্দ্রকুমার সমসাময়িক পালাকার ও যাত্রাভিনেতা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ বলেন —

> "যাত্রা শিল্পকে, যাত্রাসাহিত্যকে কেউ যদি শিক্ষিত মহলের গ্রহণযোগ্য করে থাকেন তিনি ব্রজেন্দ্রবাবু।" ২৫

যাত্রা আজ আর কেবলমাত্র গ্রাম-গঞ্জের অশিক্ষিত খেটে খাওয়া কৃষক মজুর সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, শহর শহরতলির শিক্ষিত বিদগ্ধজনদের ও সামিল করেছে যাত্রার আঙিনায়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক দুলেন্দু ভৌমিক বলেছেন —

> "যাত্রা অতীতে ছিল গ্রাম - গঞ্জের মানুষের মনোরঞ্জনের বিষয়। কিন্তু এখন তার জনপ্রিয়তা শুধু গ্রাম - গঞ্জেই সীমাবদ্ধ নয়, শহরের মধ্যস্থল থেকে শহরের আনাচে কানাচে সর্বত্র তার ডাক, তার আদর।" ২৬

একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, ব্রজেন্দ্রকুমারের ন্যায় শিক্ষিত রুচিশীল পালাকারদের হাতে যাত্রা তার পরিমার্জিত রূপ লাভ করে শহরের শিক্ষিত মানুষের সমাদর লাভে সমর্থ হয়েছে। ১৯৬১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর কলকাতায় যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। থিয়েটারের অনুরূপ যাত্রামঞ্চ তৈরী হচ্ছে শহর কলকাতায়।

১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত যাত্রা উৎসবের সপ্তম দিনে ব্রজেন্দ্রকুমারের 'লোহার জাল' পালাভিনয়ে কলকাতার দর্শকেরাই হাউস ফুল করে দিয়েছিল। সেদিন আসরের বাইরে ছিল অগণিত শ্রোতা, যাদের যাত্রা শোনার ব্যবস্থা সেদিন কর্তৃপক্ষ করে উঠতে পারেন নি। ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালার জনপ্রিয়তা গ্রামাঞ্চল শহরাঞ্চল নির্বিশেষে সর্বত্র সমান, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সামগ্রিক আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যাত্রায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র আর্বিভাব ছাড়া যাত্রাপালার ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা অভিনবত্ব আনা সম্ভব ছিল না। ব্রজেন্দ্রকুমার যদি সচেতনভাবে যাত্রার লোক ঐতিহ্যকে নতুন যুগের আলোকে উদ্ভাসিত না করতেন তা হলে পরবর্তী পর্যায়ে যাত্রার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী রূপান্তর সাধিত হোত না এবং নাট্যাভিনয়, উচ্চ মঞ্চাভিনয় ও চলচ্চিত্রাভিনয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারত না। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' যে অর্থে গণনাট্য আন্দোলনের ও জনমুখী গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের পথকে প্রশস্ত করেছে, অনুরূপ অর্থে যাত্রাপালার ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'সোনাই' দীঘি, বাঙালী, নটী বিনোদিনী, মহীয়সী - কৈকেয়ী, পরাজিত মেঘনাদ প্রভৃতি যাত্রাপালাগান ও তার সার্থক পরিবেশনা বাংলা যাত্রার ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে নতুন যুগ। বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোষের যে স্থান, বাংলার এ কালের যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্র কুমার দে সেই স্থানের অধিকারী।

সূত্র নির্দেশিকা ঃ

১। তরুণ কুমার দে — যাত্রা ঃ ব্রজেন্দ্র কুমার দে ঃ পরিচিতি, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৪০১, পৃষ্ঠা - ৩১১

২। সাক্ষাৎকার, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় - বারুইপুর , দঃ ২৪ পরগণা তাং -১১.৪.৯৬

৩। তরুণ কুমার দে — লীলাবসানের জরা, কাটোয়া দর্পণ, পৃষ্ঠা -২

৪। ব্রজেন্দ্র কুমার দে, সাক্ষাৎকার - প্রবোধ বন্ধু অধিকারী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৬৮

৫। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০, পৃষ্ঠা - ৩৮

৬। ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বাঙ্গালা লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃষ্ঠা - ৬৮।

৭। Pravat Das - ON OPEN AIR SHOW, Bankim Chandra Chatterjee, Essays in Respective, Page 532.

৮। সনাতন গোস্বামী — বিষয় ঃ প্রবন্ধ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, যাত্রার পালাবাদল, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৬৮৫

৯। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৪২

১০। তরুণ কুমার দে — সাক্ষাৎকার, সূর্য কুমার দত্ত, যাত্রাচিন্তা, অভিনয় - পৃষ্ঠা ১৬১১

১১। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৪২

১২। সাক্ষাৎকার, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা,

তাং - ১১.৪. ৯৬.

১৩। সাক্ষাৎকার, শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্তা, সাক্ষাৎকার গ্রহণে লেখক, সল্টলেক সিটি, কলকাতা, তাং - ১২.১২.৯৮.

১৪। তরুণ কুমার দে — যাত্রা: ব্রজেন্দ্র কুমার দে : পরিচিতি, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪০১ পৃষ্ঠা - ৩১৬

১৫। আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যলোক, ব্রজেন্দ্র কুমার স্মৃতি সংখ্যা, ১০ম বর্ষ, ৮ম-৯ম সংখ্যা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

১৬। ব্রজেন্দ্র কুমার দে — মার্জিত হাস্যরস, বাংলার যাত্রানাটক, সপ্তাহ ১৮.৩.৮৮

১৭। সাক্ষাৎকার — সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার গ্রহণে লেখক,বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণা তাং -১১.৪.৯৬

১৮। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০ পৃষ্ঠা - ৪৩

১৯। ক্ষেত্র গুপ্ত — যাত্রাঃ পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে, 'বাঙালী' লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ৭ম বর্ষ ৩ য় সংখ্যা, ১৪০১, পৃষ্ঠা - ৩০৬

২০। মন্মথ রায় — লোকনাট্য যাত্রাগান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০, পৃষ্ঠা - ৪৩

২১। তরুণ কুমার দে — নতুন আলোয় অতি পরিচিত চরিত্র, সপ্তাহ তাং-২৯.১১.৯৭

২২। সাক্ষাৎকার — অমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, সাক্ষাৎকার গ্রহণে লেখক, সাউথ রামনগর, বারুইপুর, ১০ম বর্ষ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

২৩। আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যলোক, ব্রজেন্দ্রকুমার স্মৃতিসংখ্যা, ১০ম বর্ষ, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

২৪। সনাতম গোস্বামী, বিষয়ঃ প্রবন্ধ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, যাত্রার পালাবদল, ১৯৯৬ পৃষ্ঠা - ৬৮৬

২৫। প্রবোধবন্ধু অধিকারী, আটশো বছর যাত্রারথে, স্যমীক, জানুয়ারী ১৯৭৪ পৃষ্ঠা -১০

২৬। দুলেন্দ্র ভৌমিক, আগ্রাসী যাত্রা, স্যমীক ১ সংখ্যা, ১৯৭৪ পৃষ্ঠা - ৩৮

ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত যাত্রাপালার তালিকা ঃ

১৯২৫	—	স্বর্ণলঙ্কা
১৯২৬	—	ভক্তাধীন
১৯২৭	—	মায়া
১৯২৮	—	সমাজ
১৯২৯	—	মানুষ
১৯৩১	—	বজ্রনাভ
১৯৩২	—	প্রবীরার্জুন
	—	ভক্তের ভগবান
১৯৩৩	—	অম্বরীষ
১৯৩৪	—	লীলাবসান
১৯৩৫	—	ধর্মমঙ্গল
১৯৩৬	—	চাঁদের মেয়ে
	—	যত্র জীব তত্র শিব
	—	বঙ্গবীর
১৯৩৭	—	চাঁদমুকুল
	—	রাজর্ষি/দানবীর
	—	রাজলক্ষ্মী
১৯৩৮	—	গীতগোবিন্দ/ভক্তকবি/ভক্তকবি জয়দেব
	—	মনিকমালা/চাষার ছেলে
১৯৩৯	—	মণিকুণ্ডল
১৯৪০	—	বাঁশের বাঁশি
১৯৪১	—	যমে-মানুষে
	—	রক্ততিলক
১৯৪২	—	রাজনন্দিনী
	—	দেবতার গ্রাস
১৯৪৩	—	আকালের দেশ
১৯৪৪	—	সমাজের বলি
১৯৪৫	—	মায়ের ডাক/নাটক নয়
	—	পরশমণি
১৯৪৬	—	বাঙালী/শেষ নমাজ
	—	গন্ধর্বের মেয়ে
১৯৪৭	—	রাজসন্ন্যাসী
১৯৪৮	—	ভারততীর্থ
	—	ধরার দেবতা
১৯৪৮	—	প্রতিশোধ